লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

বুক ট্রাস্ট
৩০/১বি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ / ১৯৯৯

বুক ট্রাস্ট ৩০/১বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং এটিএস গ্রাফো লেসার
(প্রাঃ) লিঃ কলকাতা ৭০০ ০২৯ থেকে অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়
কর্তৃক মুদ্রিত॥

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রিত, ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুরাগী,

দক্ষ প্রশাসক এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব বর্মন

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থরাজি :

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস (৩য় সং)
বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র (৩য় সং)
লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (৩য় সং)
প্রগল্প (২য় সং)
প্রসঙ্গ : লোকপুরাণ
লোকসংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ (২য় সং)
গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়
টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত
লোক উৎসব ও লোক দেবতা প্রসঙ্গ
সাহিত্য সমীক্ষা
নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ
চৈতন্য পরিক্রমা (সম্পাদিত)
বাংলার লোকসংস্কৃতি (সম্পাদিত)
উইলিয়াম মর্টনের দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ (সম্পাদিত)
বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ (সম্পাদিত)
সবিনয় নিবেদন
বিশ্বসেরা গল্পগাথা
বেতাল পঞ্চবিংশতি (অনুবাদ)
নীল আকাশের তারা
সাহিত্য অন্বেষা

নিবেদন

মূলত : ক্ষেত্রসন্ধানলব্ধ লোকসংস্কৃতিব কিছু উপাদান নির্ভর আলোচনা ও সংগ্রহ নিয়েই 'লোকসংস্কৃতিব সুলুক সন্ধানে' পবিকল্পিত। লৌকিক প্রবাদ, ধাঁধা ও ছড়া নিয়ে আলোচনা ও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কযেকটি, বর্তমান গ্রন্থে আমবা এইসব উপাদান সৃষ্টিতে লোক স্রষ্টাবা অবচেতন ভাবে হলেও যে একটি নির্দিষ্ট বীতিব অনুসাবী এবং সেই সূত্রেই প্রকাশিত বয়েছে তাঁদেব আকর্ষণীয শিল্প নৈপুণ্য, সেই বিষয়েই বিশেষভাবে পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণেব চেষ্টা কবা হযেছে। "কিংবদন্তী' নিযে বাংলাদেশে স্বতন্ত্র গ্রন্থেব প্রকাশ ঘটলেও এপাব বাংলায 'কিংবদন্তী' তাব প্রাপ্য গুরুত্ব লাভে বঞ্চিত থেকে গেছে। তাই কিংবদন্তীকেও সংকলিত কবে দেওয়া হয়েছে। আশা কবা যায় অদূব ভবিষ্যতে এই বিষয়টি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। লোকক্রীড়া এবং মুসলিম বিবাহের গান নিয়েও দুটি স্বতন্ত্র অধ্যাযে আলোচনা কব' হযেছে, সন্নিবিষ্ট কবা হয়ে সংগৃহীত উপাদান। আমাদেব মেয়েলী ব্রত ও সংশ্লিষ্ট কথাগুলি নিযে একটু ভিন্ন ধরনের আলোচনা করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায ব্রতগুলিকে দেখানো হযেছে মহিলাদেব প্রতিবাদী আচবণ রূপে। এই সংক্রান্ত আলোচনাতেই কেবল কোন ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ উপকবণ সন্নিবিষ্ট হযনি। উত্তববঙ্গে অনেকগুলি লোকনাট্য প্রচলিত। তন্মধ্যে 'চোব চুবণী' অন্যতম। 'চোব চুরণী' লোকনাট্যটিব বিশেষত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে একটি পালাও উদ্ধাব কবে দেওয়া হল।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায সহায়তা কবেছে আমাব কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ সুজয়কুমাব মণ্ডল। এছাড়া শ্রীমান্ মনোজ কুমার মণ্ডল, শ্রীমান্ বুলবুল উদ্দিন আহমেদ, বিদ্যেন্দু বিশ্বাস, কল্যাণীয়া তানিয়া মজুমদাব এবং শ্রীমান্ আনোযাব হোসেন নানা ভাবে সহায়তা করেছে। এদেব সকলকেই আমাব স্নেহাশীর্বাদ। ছাত্রপ্রতিম ড. দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়েব সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আলোচনা কবে উপকৃত হযেছি।

—লেখক

লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয,
পৌষ সংক্রান্তি, ১৩০৫

সূচী

অধ্যায়/এক

প্রবাদ : অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দীর্ঘলালিত ভাণ্ডার :

ইংরাজীতে যে Proverb শব্দটি আছে, বাংলায় আমরা তাকেই বলি প্রবাদ। Proverb শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'প্রবাদ' শব্দের প্রথম ব্যবহার পাই জেমস লঙের মাধ্যমে। তদবধি আমরা Proverb বলতে প্রবাদ শব্দটিকেই বুঝে থাকি। আমরা জানি প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকসাহিত্যে প্রবাদ আছে। বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ্ প্রবাদকে বিভিন্নভাবে দেখেছেন এবং প্রবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞাও তাঁরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিটি সংজ্ঞাই একদিকে যেমন সংজ্ঞা-দানকারীর মননশীলতার স্বাক্ষরবাহী, অপরদিকে প্রতিটি সংজ্ঞাই প্রবাদের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। একটি স্পেনীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'A proverb is a short sentence, based on long experience,'—অর্থাৎ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে যখন মানুষ স্বল্পতম বাক্যে প্রকাশ করে তখন তাই হয়ে ওঠে প্রবাদ।

আরেকটি সংজ্ঞায় দেখি বলা হয়েছে, 'Proverbs are the wisdom of the ages.' এটি একটি জার্মানী প্রবাদ। বলা হয়েছে প্রবাদের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা পরিবেশিত হয় তা দীর্ঘদিনের। অর্থাৎ বহুজনের বহুদিনের লব্ধ অভিজ্ঞতার কথাই প্রবাদে বলা হয়ে থাকে।

একটি Hebrew প্রবাদে প্রবাদ সম্পর্কিত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'A man's life is often built on Proverb'—প্রবাদের উপর নির্ভর করেই মানবজীবন গড়ে ওঠে : বক্তব্যটির অর্থ হল—এই মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই যা নাকি প্রবাদের বিষয় হয়ে ওঠেনি। অন্যভাবে বক্তব্যটিকে আমরা প্রকাশ করে বলতে পারি, প্রবাদের বিষয় মূলত মানবজীবন কেন্দ্রিক। কেননা প্রবাদের রচয়িতা মানুষ, প্রবাদ রচিত হয় মানুষেরই জন্য, অতএব প্রবাদের বিষয় যদি মূলতঃ মানুষ না হয় তবে তাতে অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের

মধ্যে প্রবাদের যেমন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যোগ, প্রবাদের যে পরিমাণ ব্যবহারিক উপযোগিতা, তেমনটি লোকসাহিত্যের অন্য কোন উপাদানের নেই। প্রবাদের মধ্য দিয়ে সংহত সমাজের মানুষ, মানুষকে একই সঙ্গে জীবনের পথচলার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাগুলির সম্মুখীন হওয়া সম্ভব সেগুলির হদিস দিয়ে পূর্ব থেকেই যেমন সাবধান করে দেয়, তেমনি বাঞ্ছিত লোকে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশও দান করে থাকে। এই ভাবে কখনও সতর্কীকরণ, কখনও উপদেশবাণী কখনও বা পরামর্শ অথবা কর্তব্যের কথা বলে যথার্থ মানব সমাজের হিতৈষীর ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রবাদের অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ পথ চলার রসদ সংগ্রহ করে। একটি আরবীয় প্রবাদে বলা হয়েছে, 'Here is something wise in every proverb'—অর্থাৎ প্রতিটি প্রবাদ বাক্যেই কিছু না কিছু জ্ঞানের কথা থাকে।

আমরা ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের তুলনা করতে পারি। মানুষকে সংশয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে, বক্তব্য বিষয়কে জটিল করার অভিপ্রায়ে ধাঁধায় অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, পংক্তি বা বক্তব্যকে সংযোজিত করা হয়। কিন্তু প্রবাদে তার কোন অবকাশ নেই। সেখানে বক্তব্য পরিষ্কার এবং যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই মাত্র বলা হয়। অহেতুক বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করার পথ প্রবাদকারেরা নেননি। ছড়াতেও আমরা দেখি এমন অনেক পংক্তির সংযোজন, এমন অনেক চিত্রকল্পের উপস্থাপন, এমন অনেক শব্দের ব্যবহার যা বাস্তবতা রহিত কিংবা প্রসঙ্গ বহির্ভূত। ছড়ার অবয়বকে বৃদ্ধি করার জন্যই, শিশুমনে চমক সৃষ্টির জন্য এইসব প্রয়াস। কিন্তু প্রবাদ হল স্বতন্ত্র। বক্তব্য প্রকাশের জন্য যে কটি পদের প্রয়োজন সেই কটি মাত্রই প্রবাদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

প্রবাদ যেহেতু লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই প্রথমাবধি তা লিখিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। মৌখিক ঐতিহ্যের সূত্রেই প্রবাদ বাক্যগুলি প্রজন্ম পরম্পরায় চলে এসেছে। এগুলির নির্দিষ্ট রচয়িতার সন্ধান মেলে না। ব্যবহারকারীর সেই পরিচিতি লাভের প্রয়োজনও হয় না। অবশ্যই প্রবাদ ব্যষ্টি কর্তৃক রচিত হয় কিন্তু সংহত সমাজের মানুষের দ্বারা গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত তা একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। আমরা বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রবাদের সাহায্য নিয়ে থাকি। বর্তমানে মূলত প্রবাদের চর্চা ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পাঠকক্ষে হলেও এখনও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা পরিপ্রেক্ষিতে, নানা প্রসঙ্গে, নানা অভিব্যক্তির প্রকাশের প্রয়োজনে আমরা প্রবাদের ব্যবহার করে থাকি। একথা ঠিকই অতীতে, বিশেষত নারী সমাজ তাদের ব্যবহৃত বাক্যে যেমন কথায় কথায় প্রবাদের ব্যবহার করতেন এখন তার চল অনেকখানি কম। তবু প্রবাদের ব্যবহার যে নারী অথবা পুরুষ সমাজে এখনও একেবারেই হয়

না তা নয়, সীমিত ক্ষেত্রে হলেও নিরক্ষর এবং সাক্ষর মানুষ এমনও নিজের বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য প্রবাদের সাহায্য নিয়ে থাকে।

আমরা প্রবাদের সঙ্গে প্রায় এক নিঃশ্বাসে প্রবচন শব্দটি উচ্চারণ করে থাকি। প্রবাদ এবং প্রবচন এই দুই উপসর্গ যুক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ একই তা হল প্রকৃষ্ট বাক্য বা প্রকৃষ্ট বচন। কেউ কেউ অবশ্য প্রবচন বলতে ব্যক্তি বিশেষের সাহিত্যিক প্রয়োগকেই বুঝিয়ে থাকেন। যেমন রামনিধি গুপ্তের কথিত, 'বিনা স্বদেশী ভাষা মেটেকি আশা।' কিংবা ভারতচন্দ্রের বহুল প্রচলিত উক্তি—'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ?'

যে কোন ভাষার সমৃদ্ধির মূলে তার শব্দভাণ্ডারের ভূমিকা অনেকখানি। তেমনি বলা যায় ভাষার সমৃদ্ধিতে প্রবাদ কিংবা প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কথা বলেও শেষ পর্যন্ত যেকথা ঠিকমত বলা হয়ে ওঠে না কিংবা যে অভিজ্ঞতার কিংবা মনের ভাব ভাষার পর ভাষার মালা গেঁথেও আমরা পূর্ণভাবে প্রকাশের আনন্দ পাই না, সেক্ষেত্রে প্রবাদের সহায়তায় আমাদের বক্তব্য প্রকাশের দীনতা যেমন ঘোচে, তেমনি অপরদিকে বিশেষ বক্তব্যকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হই, আর তাই বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতেও প্রবাদ হল এক সার্থক হাতিয়ার। প্রতিটি দেশের ভাষার সম্পদ বলেই বিবেচনা করা হয় সেই ভাষার প্রবাদ গুলিকে। একাধিক প্রবাদ সম্পর্কিত সংজ্ঞায় এই দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন একটি আরবীয় প্রবাদে বলা হয়েছে, 'A proverb is to speech what salt is to life.'—অর্থাৎ জীবনে লবণের যে স্থান তেমনি ভাষা বা বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রবাদের ভূমিকার একই গুরুত্ব। একটি পার্শী প্রবাদে বলা হয়েছে, 'A Proverb is an ornament to Language'. অর্থাৎ প্রবাদ হল ভাষার অলংকারের মত। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধকরি বলা উচিত প্রবাদের ব্যবহারিক উপযোগিতা অলংকারের তুলনায় অনেক বেশি। অলংকারের ব্যবহার কালেভদ্রে উৎসবে উপলক্ষে, কিন্তু প্রবাদের ব্যবহার প্রতিদিনের জীবনে। অর্থাৎ ব্যবহারের নিরিখে অলংকার ও প্রবাদ সমগোত্রীয় নয়। অলংকারের ব্যবহারিক উপযোগিতা তেমন কিছু নেই নিছক দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা ছাড়া, কিন্তু প্রবাদ তেমন নয়, তার উপযোগিতা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত Archer Taylor বলেছেন, 'A proverb is a saying current among the folk'—এই বক্তব্যে টেলর সাহেব প্রবাদের উপযোগিতা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যেমন, তেমনি তিনি এগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছেন। যে প্রবাদগুলির প্রচলন বর্তমান সংহত সমাজে রয়েছে অর্থাৎ যে প্রবাদগুলি এখনও চালু, আমরা সেগুলির কথাই জানি, সেগুলির বিষয়ে

আলোচনা করি, ব্যবহার করি। কিন্তু এমনত অনেক প্রবাদ অতীতে রচিত হয়েছিল যেগুলির বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাওয়ায় অথবা পরিবর্তিত পরিবেশের উপযোগী না থাকায় সেগুলি মানুষের দ্বারা আর ব্যবহৃত হয় না। অতীত স্মৃতির সাক্ষ্যবাহী হয়ে তারা কিছু মুদ্রিত সংকলনে অথবা কতিপয় বয়ঃপ্রবীণ মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেছে মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়—জীবন্তমানুষ চলাফেরা করে, তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। অপরপক্ষে মৃত মানুষ স্থান পায় ছবিতে। বাতিল হওয়া অথবা অব্যবহৃত প্রবাদগুলির তাই বলে যে কোন গুরুত্ব নেই তা নয়, অতীত দিনের ফেলে আসা সমাজ জীবন কিংবা প্রচলিত রীতি-নীতি আচার আচরণ সম্পর্কে এইসব প্রবাদ নানা তথ্য সরবরাহ করে। বলা যায় সংরক্ষণশালার ভূমিকা পালন করে। দু-একটিদৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট করতে পারি—'উল্টে চোরা মশান গায়'—এই প্রবাদটি এখন আর চালু নেই। কেননা চোরকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার শাস্তি দানের প্রথা লুপ্ত হয়ে গেছে। আগেকার দিনে যখন চোরকে শাস্তি দেওয়া হত শূলে চড়িয়ে, তখন পথ দিয়ে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময় জনগণকে চোরের শাস্তি লাভের কারণগুলি আনুপূর্বিক জানিয়ে দেওয়া হত। চোরের দণ্ড দানের প্রবাদ কথিত প্রথাটি লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু অতীতের প্রচলিত রীতিটির কথা এই অপ্রচলিত প্রবাদটি ধরে রেখেছে। কিংবা আরেকটি প্রবাদের উল্লেখ করা যায়—'ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বালা'। বর্তমানে লালবাতি জ্বালা অর্থে বোঝানো হয় ব্যবসায়ে ভরাডুবি হওয়াকে। আগেকার দিনে যখন ব্যবসায়ীরা ছিলেন আজকের দিনের তুলনায় অনেক বেশী সৎ ও দায়িত্বশীল, তখন তারা ব্যবসার অবস্থা সঙ্গীন বুঝলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামনে একটি লাল আলো ঝুলিয়ে রাখতেন, সতর্কীকরণ হিসাবে, যাতে খরিদদাররা সাবধান হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা নিজেদের থেকেই নিজেদের সঙ্গীন অবস্থা জানিয়ে দিতেন ক্রেতাসাধারণকে। বলাবাহুল্য এই প্রথা আর চালু নেই। কিন্তু সেই পূর্ব দিনের প্রচলিত প্রথাটি জানার জন্য এই প্রবাদটির বিশেষ প্রয়োজন।

প্রবাদ বাক্যগুলির মূল লক্ষ্য মানবচরিত্র। আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বললে বলা যায় মানব চরিত্রের সমালোচনা। এই সমালোচনার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—বিশেষ বিশেষ চরিত্রের মানুষের অসঙ্গতিগুলিকে লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করা। একদিকে এই শ্রেণীর মানুষেরা যেমন সমালোচনার ফলে সাবধান হতে পারে, নিজেদের ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করে, অন্যদিকে যারা এরূপ চরিত্রের অধিকারী নয় তারা দূষণীয় চরিত্রের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরামর্শ লাভ করে এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও

এইরূপ ত্রুটির যাতে অধিকারী না হয় সেজন্য সচেষ্ট হওয়ার শিক্ষা পায়। আমাদের বক্তব্যকে পরিস্ফুট কর্‌বার জন্য নির্দিষ্ট প্রবাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 'কারোর পৌষমাস, কারোর সর্বনাশ'—এই প্রবাদে বলা হয়েছে একজনের যখন বিপদ অন্যের তখন সুখ সমৃদ্ধি। এর মাধ্যমে যে বক্তব্যটিকে প্রকাশ করা হল তা হল এই যে যার পৌষমাস অর্থাৎ শুভ সময় তার পক্ষে অন্যের সর্বনাশে খুশী হওয়া উচিত নয়, কেননা সৌভাগ্য সুখ পরিবর্তিত হয়। আজ যে সুখ ভোগের গর্বে গর্বিত, আগামী দিনে তাকেই হয়তো দুঃখে ক্লিষ্ট হতে হবে। এছাড়াও সংসারে মানুষদের স্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদল যেখানে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী পৌষমাস ভোগের সুযোগ পায় অন্যদিকে তখন কিছু মানুষ আবার সর্বনাশের সম্মুখীন। পৌষ মাষ এখানে প্রতীক রূপে ব্যবহৃত। আমাদের কৃষি ভিত্তিক সমাজে পৌষ মাসেই মানুষ ফসল উৎপন্ন হওয়ার সুবাদে কিছু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখার সুযোগ পায়, তাই সৌভাগ্য সুখের সঙ্গে পৌষ মাসকে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই প্রবাদের মধ্য দিয়ে গৌরী সেনের মত বদান্য ব্যক্তিদের উদার হস্তে অকৃপণভাবে অন্যের কারণে অর্থব্যয়ের কথাই শুধু বলা হয়নি, প্রকারান্তরে যারা নাকি গৌরী সেনদের উদারতার সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ অর্থ ব্যয়, অপচয় করে তাদেরও সমালোচনা করা হয়েছে। কিংবা যখন বলা হয়, 'আপনার মাংসই হরিণের বৈরী', তখন বলা হয় এই কথাই যে, যে সম্পদ বা গুণের জন্য ব্যক্তি বিশেষের গৌরবান্বিত বোধ করা উচিত ছিল, খুশী হওয়ার কারণ ছিল সেই সম্পদই তার শত্রুরূপে বিনাশের বা দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ প্রবাদের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষা দানের প্রয়াস যথেষ্টই।

নানা বিষয়কে অবলম্বন করে প্রবাদ রচিত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ের মধ্যে মানুষ থাকতে পারে, দেবদেবী, ইতরশ্রেণীর প্রাণী, প্রকৃতি, জড় জগতের নানাবিধ উপাদান থাকতে পারে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা গেল বক্তব্যকে স্পষ্টতর করতে।

ক. দেবতা কেন্দ্রিক : দুর্গাপুজোয় শাঁখ বাজে না ষষ্ঠী পুজোয় ঢোল।

খ. ফলমূল কেন্দ্রিক : আম না থাকলে আমড়া চোষে।

গ. পাখপাখালী কেন্দ্রিক : খায় দায় পাখীটি বনের পানে আঁখিটি।

ঘ. মাছ কেন্দ্রিক : মাছের মধ্যে রুই, মানুষের মধ্যে মুই।

ঙ. ফুল কেন্দ্রিক : চাঁপা ফুলের গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে।

চ সবজি কেন্দ্রিক : ঝালে ঝোলে অম্বলে, বেগুন সব ঠাঁই চলে।

ছ. বৃক্ষ কেন্দ্রিক : বড় গাছে ঝড় লাগে।

জ. জীবজন্তু কেন্দ্রিক : বাঘ পালাল, বেড়াল এল ধরতে এবার হাতী।

ঝ. বাদ্য কেন্দ্রিক : ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত।

ঞ. বিলাসোপকরণ কেন্দ্রিক ঃ হাতের কঙ্কণ দর্পণে দেখা ।

ট. মাস কেন্দ্রিক ঃ আষাঢ় মাস চাষার আশ ।

ঠ. স্থান কেন্দ্রিক ঃ ময়রা মুদি কলাকার, তিন নিয়ে বাগবাজার ।

ড. কৃষি কেন্দ্রিক ঃ ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে ।

ঢ. পৌরাণিক চরিত্র কেন্দ্রিক ঃ অজগরের দাতা রামাচন্দ্র ।

ণ. ঐতিহাসিক চরিত্র কেন্দ্রিক ঃ ধান ভানতে মহীপালের গীত ।

ত. সামাজিক চরিত্র কেন্দ্রিক ঃ বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান ।

থ. পারিবারিক চরিত্র কেন্দ্রিক ঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা ।

দ. সামাজিক রীতি নীতি কেন্দ্রিক ঃ কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে ।

স্বাস্থ্য, কৃষি, জলহাওয়া, শিক্ষা ইত্যাদির মত কয়েকটি বিষয়কে বাদ দিলে মূলত প্রবাদবাক্যে দুটি অর্থ সমান্তরালভাবে প্রকাশ পায় । একটি সাহিত্যের ভাষায় বাচ্যার্থ অপরটি ব্যঙ্গার্থ । বলাবাহুল্য ব্যঙ্গার্থ প্রবাদের প্রকৃত অর্থ বা এই ব্যঙ্গার্থ প্রকাশের জন্যই প্রবাদের প্রকৃত গুরুত্ব । এক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি —যেমন 'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না' অর্থাৎ পাত্র থেকে ঘি সংগ্রহের জন্য আঙুল সোজা না রেখে কিছুটা বক্র করতে হয় । কিন্তু এই বাচ্যার্থের মধ্যেই যদি প্রবাদটি নিঃশেষিত হত তাহলে প্রবাদ হিসাবে এর কার্যকারিতা হ্রাস পেত । এর ব্যঙ্গার্থ হল এই যে সহজে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, দুষ্ট বুদ্ধি যার, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা ঘায়েল করতে প্রয়োজন কূট বুদ্ধির । আঙুলের বক্রতা প্রবাদে অনুল্লিখিত থাকলেও স্পষ্ট বোঝা যায় কূট কৌশলকেই প্রতীক করা হয়েছে প্রবাদে, এই প্রসঙ্গের উল্লেখ না করেও এখন এমন কতকগুলি প্রবাদ বাক্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যেগুলিতে বাচ্যার্থেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রয়েছে । যেমন—

"নিম নিশিন্দা যেথা
রোগ থাকে না সেথা"—অর্থাৎ নিম এবং নিশিন্দার নিয়মিত সেবনে অথবা এই দুটি গাছের উপস্থিতি পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিংবা "কফ, পিত্ত, বাই তিন নাশে পটল ভাই"—এখানে পটলের গুণাবলী ব্যাখ্যাত হয়েছে । তবে স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলহাওয়া, কৃষিসংক্রান্ত প্রবাদগুলির ক্ষেত্রেই আমরা মূলতঃ এইরূপ বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করে থাকি ।

বেশ কিছু প্রবাদ বিশেষ কোন ঘটনা, চরিত্র, বা গল্প অবলম্বনে সৃষ্টি হয়েছে । এই উৎপত্তি সূচক গল্পগুলি অধিকাংশই বিলীন হয়ে গেছে । কিন্তু রয়ে গেছে প্রবাদগুলি । উৎপত্তি সূচক ঘটনা বা গল্পগুলি যদি সংগৃহীত হয়, আমরা যদি সেগুলি ঠিকমতো জানতে পারি তাহলে ঐসব গল্পগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

প্রবাদগুলির মর্মার্থ অনুধাবন সহজতর হবে। যেমন 'দশ চক্রে ভগবান ভূত'—এই প্রবাদটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাহিনীটি হল যে, এক রাজার ভগবান নামে এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল, এই মন্ত্রীর কারণে রাজার পদস্থ কর্মচারীরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। তাই তারা চক্রান্ত করে ভগবানকে মৃত বলে রটনা করলো এবং রাজসভায় তার আসা বন্ধ করা হল। একদা রাজা যখন মন্ত্রীর বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ভগবান তার গৃহ সংলগ্ন বৃক্ষের শাখায় উঠে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট হল। এতে রাজার সন্দেহ আরোও দৃঢ় হল। ভগবান শুধু মারা যায়নি। মরে ভূতও হয়েছে। অতএব রাজা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিলেন। 'গোড়ায় গলদ' বলতে আমরা 'বিসমিল্লায় গলদ' বলে থাকি। এর পিছনেও একটি চমৎকার উপভোগ্য কাহিনী রয়েছে। এক মুসলমান ফকির তার বুদ্ধিমান চেলাদের পরামর্শে নবাবের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য খোদাতালার নির্দেশ একটি গভীর অরণ্য মধ্যস্থিত বৃক্ষে লিখিত রূপে রেখে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বনমধ্যে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী লক্ষ্য করলেন বৃক্ষে নির্দেশের প্রথমে 'বিসমিল্লা' লেখা রয়েছে। এই দেখেই তার আর বুঝতে বাকি রইল না, সমস্ত ব্যাপারটি একটি চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত। দেবতা তাঁর নির্দেশ লিখিতভাবে দিতে গিয়ে কখনই নিজেকে স্মরণ করবেন না। এইসব ঘটনা বা কাহিনী জানা থাকলে প্রবাদের গভীরতর সত্য অনুধাবন সহজতর এবং যথার্থ হয়।

আমরা এইবার প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করে নেব।

আমরা অনেকেই প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশকে এককরে দেখে থাকি। কিন্তু সঠিক বিচারে দুই সমজাতীয় নয়। প্রবাদ বক্তব্য প্রকাশে এবং আকৃতিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ। যেমন - যখন বলা হয়, 'কারোর পৌষমাস কারোর সর্বনাশ', তখন সম্পূর্ণ ভাবটি এখানে প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে যদিও ক্রিয়াপদ উল্লিখিত হয়নি তবু বক্তব্যটি স্বয়ং সম্পূর্ণ। পুরোপুরি বক্তব্যটিকে ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায়, কারোর যখন পৌষমাস (হয়), তখন অন্যের সর্বনাশ। কিন্তু প্রবাদমূলক বাক্যাংশ, ইংরাজীতে যাকে আমরা Idiom বলি, বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তা অসম্পূর্ণ, অবয়বের দিক থেকে অসম্পূর্ণতো বটেই। যেমন, অকাল কুষ্মাণ্ড কিংবা অগস্ত্য যাত্রা, অন্ধের যষ্টি, নয়ছয়, সাতসতের, গোবরে পদ্মফুল, ব্যাঙের আধুলি ইত্যাদি। আমরা এগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ করলে তবে এই সব প্রবাদমূলক বাক্যাংশের অর্থ সম্পূর্ণতা লাভ করে। যেমন— 'পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পেয়ে বেহিসেবী জীবন যাত্রা নির্বাহ করে রমেন সেই সম্পত্তি নয়ছয় করে ফেললো'। আমরা বুঝতে পারি নয়ছয় বলতে বেহিসেবী খরচ করে উড়িয়ে দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রবাদ যেহেতু নিজেই

স্বয়ং সম্পূর্ণ তাই কোন বক্তব্যের প্রসঙ্গে তা ব্যবহৃত হয়। তাতে প্রবাদের অর্থদ্যোতনা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। অতএব প্রবাদমূলক বাক্যাংশ যেখানে আংশিকতায় সীমাবদ্ধ, প্রবাদ সেখানে স্বয়ং সম্পূর্ণ এই সুস্পষ্ট পার্থক্যটি আমাদের মনে রাখা দরকার।

আমরা জানি পরিশীলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে অথবা মৌলিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্রের ব্যবধান সত্ত্বেও বক্তব্যে, চিন্তায়, ভাবে সাযুজ্য লক্ষিত হয়। একে বলা হয় 'Great men think a like' যেমন P. B. Shelley-র 'The west wind' কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতার ভাবগত সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন দুই কবিই স্বাধীনভাবে তাঁদের চিন্তা ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। আবার কারোর মতে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। শেলী রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি এবং যেহেতু 'The west wind' 'বর্ষশেষ' কবিতার পূর্ববর্তী রচনা, তাই রবীন্দ্রনাথ শেলীর রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা বলা হয়। প্রবাদের জগতে যখন প্রতিবেশী রাজ্য বা রাষ্ট্রের ভাষাভাষী মানুষের প্রবাদের সঙ্গে আমাদের প্রবাদের গভীর সাদৃশ্যের সন্ধান পাই তখন স্বভাবতই একের দ্বারা অন্যের, একভাষায় রচিত প্রবাদের দ্বারা অন্য ভাষায় রচিত প্রবাদের প্রভাবিত হওয়ার কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে জাগে। আমরা একে Translation loan বলেও অভিহিত করি। বাংলায় বেশ কিছু হিন্দী এবং সংস্কৃত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন—শতং বদ মা লিখ, সর্বম অত্যন্তং গর্হিতং, ধর্মস্য সুক্ষ্মাঃ গতি কিংবা নরাণাং মাতুল ক্রমঃ। আমরা এই প্রবাদ বা নীতি বাক্যগুলিকে অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি। ক্ষেত্র বিশেষে আবার আমাদের পূর্ব কথিত Translation loan-এর পরিচয়ও মেলে। যেমন—বাংলায় বলা হয় একচাঁদে জগৎ আলো। এটির মূল সংস্কৃত প্রবাদটি হল 'একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি' অনুরূপ বেশ কিছু হিন্দী প্রবাদ আমরা বাংলায় দিব্যি ব্যবহার করে থাকি। যেমন—বাপ কা বেটা সিপাই কা ঘোড়া, কুছ নেহিতো থোড়া থোড়া। ডালমে কুছ কালা হায় ইত্যাদি। ইংরাজী ভাষায় রচিত কিছু প্রবাদ আমরা বাংলায় অনুবাদ করে নিয়েছি বললে অত্যুক্তি হয় না। যেমন—'A friend in need, is a friend indeed'. 'বিপদকালের বন্ধুই যথার্থ বন্ধু'। কিংবা 'A little learning is a dangerous thing'—অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী। কিন্তু সংস্কৃত বা হিন্দীর ক্ষেত্রে যেমন ওদের প্রবাদ বাক্যগুলিকে বা উপদেশগুলিকে আমরা অবিকৃতভাবে কিংবা ভাষান্তরিত করে গ্রহণ করেছি, বিদেশীয় ভাষায় রচিত প্রবাদের সঙ্গে আমাদের প্রবাদের বক্তব্য বা দৃষ্টিভঙ্গীগত সাযুজ্যের ক্ষেত্রে একের দ্বারা অন্যের প্রভাবিত হওয়ার ঘটনার তুলনায় অনেকক্ষেত্রে বরং চিন্তা ভাবনায় সাযুজ্য-

গত বৈশিষ্ট্যটি প্রধান হয়ে উঠেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। যেমন—আমরা বাংলায় বলি, 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। আমেরিকায় এই একই বক্তব্য সম্পর্কিত প্রবাদটি হল 'Birds of same feather flock together'. 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' আমাদের এই সুপরিচিত প্রবাদটির অনুরূপ ইংরাজী প্রবাদ হল—'To Carry Coal to New castle' 'Tit for tat' এই পরিচিত প্রবাদটির সঙ্গে আমাদের 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুরে'র ভাবগত সাযুজ্য বর্তমান। 'চাড় পড়লেই ফিকির বেরোয়', এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, 'Necessity is the mother of invention' প্রবাদটির। 'ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো ধরেও বাঁচতে চায়', এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, 'A drowning man catches at the straw' প্রবাদটির। 'ক্ষিদের চেয়ে টাকনা নেই', এই প্রবাদটির সঙ্গে যে ইংরাজী প্রবাদটি তুলনীয় তা'হল —Hungers the best sauce.

বাংলা প্রবাদের অনুরূপ কয়েকটি বিদেশীয় প্রবাদের উল্লেখে দেখা যাবে অভিজ্ঞতা এবং তার প্রকাশে কতই না সাযুজ্য—

ক যার প্রতি যার মজে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম
Fair is not fair
But that which pleaseth

খ. ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়
A burnt child dreads the fire

গ. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ
While there is life, there is hope.

ঘ. যাকে রাখ সেই রাখে।
Keep thy shop and thy shop will keep thee

ঙ. এক ক্ষুরে মাথা মুড়ান।
All tarred with same brush

চ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।
Tit for tat.

ছ পিছন দিয়ে হাতী যায়, সামনে দিয়ে ছুঁচ গলে না।
Penny wise pound foolish.

জ. প্রদীপের তলায় অন্ধকার।
Darkness under the lamp

ঝ. চোখের দোষে সব হলদে।
All appear yellow to the jaundiced eye.

ঞ. চোখের আড়াল হলেই মনের আড়লে হয়।
Out of sight out of mind.

ট. তিলকে তাল করা।
Making a mountain of a mole hill.

ঠ. বিনা মেঘে বজ্রপাত।
A bolt from the blue.

ড. চকচক করলেই সোনা হয় না।
All that glitters is not gold.

ঢ. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।
A little learning is a dangerous thing

একথা ঠিকই যে প্রবাদ আকৃতিতে সংক্ষিপ্ততম হবার সুবাদে সহজেই দেশ থেকে দেশান্তরে প্রচার লাভ করে। কিন্তু যে সব প্রবাদে বক্তব্যগত সাযুজ্যের সন্ধান মেলে সে সবই এইভাবে প্রচার লাভ করেছে বলা যাবে না। মনে রাখতে হবে একইরূপ পরিবেশ একই রূপ সংস্কৃতির যেমন উদগাতা তেমনি এমন কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় আছে, যেগুলি দেশকাল ভেদে অভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এ পর্যন্ত একাধিক বাংলা প্রবাদের নির্ভরযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে বাংলা প্রবাদের সাহিত্যিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকি অর্থনৈতিক দিক ; কিন্তু বাংলা প্রবাদের গঠনশৈলী, তথা অবয়ব গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তেমন হয়নি। আমরা জানি লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে একটি গৃহীত পদ্ধতি হ'ল গঠনশৈলী তথা আঙ্গিকগত পদ্ধতি। ডঃ. পবিত্র সরকার, ডঃ. দুলাল চৌধুরীর মত দু'একজন এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি বিস্তারিত ক্ষেত্রে বাংলা প্রবাদের আঙ্গিক পদ্ধতির নিরিখে আলোচনার অবকাশ আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে, পূর্ববর্তী আলোচনাগুলিকে সামনে রেখে আমরা বর্তমান আলোচনায় ব্রতী হব। বাংলা প্রবাদের Content বা বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা ইতিমধ্যে গড়ে উঠলেও আমাদের সংহত সমাজের অপরিশীলিত মানুষগুলি প্রবাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবচেতন ভাবে যে শিল্প নৈপুণ্য তথা নির্মিতি কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন পাঠক সেই বিষয়ে অবহিত হবার সুযোগ পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা বর্তমান আলোচনাকে ছ'টি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি।

ক ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonology)

খ. রূপতাত্ত্বিক গত (Morphology)

গ. শব্দভাণ্ডার কেন্দ্রিক (Philological)
ঘ. তাৎপর্যতত্ত্বগত (Semantics)
ঙ. বাক্য বিন্যাসগত (Syntax)
চ সন্দর্ভকেন্দ্রিক (Discourse)

ক. ধ্বনিতত্ত্বগত

(i) অপিনিহিতির ব্যবহার ঃ বাংলা প্রবাদে

কিছু প্রবাদে অপিনিহিতি প্রযুক্ত হয়েছে দেখা যায়। কয়েকটি নির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রমাণ করব।

(১) মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেউশ্যা।

এখানে 'মাইয়া' ও 'বেউশ্যা' দুটি শব্দেই অপিনিহিত হয়েছে। কেননা 'মাইয়া'তে 'ই' এবং 'বেউশ্যা'তে উ পূর্ব থেকেই উচ্চারিত হয়েছে।

(২) মাইগ্যা যাচ্যা খাই, বার দুয়ারে না যাই।

এখানে 'মাইগ্যা' শব্দটি অপিনিহিত, কেননা 'ই' পূর্ব থেকেই উচ্চারিত হয়।

(৩) মাউগের অধীন ছোয়ার নেতর।
তায়নি বসিবা সভার ভিতর।।

'মাউগ' শব্দটিও অপিনিহিত।

(৪) আমি কি নাচন জানিনা?
জাইন্যা নাচন করি না।

'জাইন্যা' শব্দে 'ই' পূর্বে থেকে উচ্চারিত হওয়ায় শব্দটি অপিনিহিতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

(৫) গাছে যদি মানুষ পড়ে
একটা বনও টাইন্যা ধরে।

'টাইন্যা' শব্দটিও অপিনিহিতির নিদর্শন।

(৬) দশদিন চোরের একদিন সাউধের।

'সাউধে' 'উ' পূর্ব থেকে উচ্চারিত হবার গুণে শব্দটি অপিনিহিত।

(৭) বিশ বছরে গুণবিদ্যা চল্লিশে হবে ধন।
পঞ্চাশ ষাইট বছর হইলে
আগুরিয়া হবে বাড়ীর কন।
ষাট্ > ষাইট্।

(ii) অলংকারের ব্যবহার ঃ

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন ঃ

'প্রবাদে রূপক অলঙ্কারের ব্যাপক প্রয়োগ হয়, সহজভাবে (directly) কোন কথাই বলা হয় না।......এই রূপকের ব্যবহারই অনেক সময় প্রবাদের মত বাস্তব জীবনধর্মী বিষয়কে সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়া থাকে'।

কিন্তু আমরা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করব বাংলা প্রবাদে নিছক রূপক অলংকারই ব্যবহৃত হয়নি ; অন্যান্য অলংকার প্রয়োগের পরিমাণও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখে আমরা আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পাব। অন্যান্য অলংকারের কথা আপাতত বাদ দিয়ে অনুপ্রাস অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তই এখন গ্রহণ করা যেতে পারে—

১. উড়ে নেড়ে গলায় দড়ে, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে।

এখানে 'ড়' বর্ণটি বাক্যটিতে চারবার ব্যবহৃত হয়ে বাক্য সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে।

২. কাজের নামে নেই কাজী, অকাজ পেলেই রাজি।

৩. এখানে 'জ' বর্ণটি চারবার প্রযুক্ত হয়ে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করায় অনুপ্রাস হয়েছে।

(iii) স্বরভক্তির দৃষ্টান্ত ঃ

১. একলা মায়ের ঝি, গরব করব না ত কি।
 গর্ব > গরব।

২. বললে যে ধরম যায়, বলবেই বা কি।
 ধর্ম > ধরম।

৩. কাজীর কাছে হিঁদুর পরব।
 পর্ব > পরব।

৪. রূপের গরব করো না, পেছন দিকে ধরো না।
 গর্ব > গরব।

৫. লাজে বউ হাঁ না করে, চালতা হেন গেরাস ধরে।
 গ্রাস > গেরাস।

খ রূপতাত্ত্বিক আলোচনা ঃ

(i) অনুকার শব্দের প্রয়োগ ঃ

মূল শব্দের পুনরাবৃত্তিতে হয় শব্দদ্বৈত, কিন্তু মূল শব্দের অনুকরণে সৃষ্ট যে শব্দের নিজস্ব কোন অর্থ নেই, মূল শব্দের অব্যবহিত পরে ব্যবহৃত হয়ে মূল শব্দের অর্থকেই প্রাধান্য দান করে তা হল অনুকার শব্দ। বাংলা প্রবাদে যেমন শব্দদ্বৈতের ব্যবহার লক্ষিত হয়, তেমনি অনুকার শব্দের প্রাচুর্যও লক্ষ্য করা যায়।

১ আজ থাকব গল্পে-সল্পে কাল থাকব শুয়ে।
পরশু করব নাওয়া-খোওয়া, পরদিন যাব খেয়ে।

'সল্পে'র পৃথক কোন অর্থ নেই, গল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্পের অর্থকেই বিস্তারিত করেছে।

২. আন সতীনে নাড়ে চাড়ে
বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।

'নাড়া' অর্থই প্রসারিত হয়েছে 'চাড়া শব্দটির প্রয়োগে।

৩. আমি কি নেড়ী ভেড়ী,
আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ী।

এখানে ভেড়ার স্ত্রীলিঙ্গে 'ভেড়ী' শব্দটি প্রযুক্ত হয়নি, নেড়ীর অনুকরণে শব্দটি সৃষ্ট এবং নেড়ীর অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত।

৪. এক বিয়ের মাগ নাড়ে চাড়ে,
দোজবরের মাগ পুড়িয়ে মারে।

চাড়ে—অনুকার শব্দ।

৫. ঠুকরে ঠাকরে আনাবে
তেমাথায় হাঁড়ি জ্বালাবে।

'ঠুকরে'র সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 'ঠাকরে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, 'ঠাকরে' অনুকার শব্দ।

৬. সবার সাধ রাঁধতে গিয়ে হাঁড়ি কুঁড়িই নাই।

'হাঁড়ির' অনুকরণে সৃষ্ট হয়েছে কুঁড়ি, অর্থ হাঁড়ির অনুরূপ বস্তু।

৭. আপনার বেলা চাপন চোপন
পরের বেলা ঝরঝরে মাপন।

'চোপন' অনুকার শব্দ

৮ বিদ্যে-সিদ্যে সব হল দেশ করলে জয়।
এখন একটা লেজ বেরুলেই হয়।

'সিদ্যে' শব্দটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, তবে বিদ্যের সঙ্গে বসেছে বলে বিদ্যের অনুরূপ অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে।

(ii) ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ ঃ

বেশ কিছু বাংলা প্রবাদে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার চোখে পড়ে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি হয় তার দ্বারা বিশেষ ক্রিয়াটি যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। কোন বিশেষ ক্রিয়াকে বিশেষ কোন শব্দ প্রয়োগে জীবন্ত করে তোলা সম্ভব সে বিষয়ে শব্দ প্রয়োগকারীর সচেতনতা আবশ্যক। অর্থাৎ একদিকে শব্দ প্রয়োগে রূপদক্ষ শিল্পীর নৈপুণ্য, অপরদিকে

ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টিতে সজাগ কানের অধিকারী হতে হয় প্রয়োগ কর্তাকে। এইবার আমরা নির্বাচিত কয়েকটি প্রবাদের উল্লেখ করব, যেগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ সার্থক ভাবে প্রযুক্ত—

১. টিপ্‌টিপ্ জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে।

জল পড়ার রকম ফেরের সঙ্গে শব্দগত বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে যুক্ত। টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ার অর্থ হল আস্তে আস্তে বৃষ্টি হওয়া। টিপ্‌টিপ্ শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির এই বিশেষ ছন্দে পড়ার শব্দ আমাদের কানে জীবন্ত হয়ে ধরা পড়ে।

২. অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।

এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দটি হল 'চড়চড়'। অনভ্যস্ত ব্যক্তির প্রাপ্ত ক্লেশের গভীরতা এই শব্দে প্রাণ পেয়েছে।

৩. অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ্‌কচ্ করে তাতে,
পড়ল বীচি বুড়োর পাতে।
কচ্‌কচ্ ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

৪. অমাবস্যার পিদ্দিম টিপ্‌টিপ্ করে।

প্রদীপ যদি স্তিমিত ভাবে জ্বলে, তবে তাকে 'টিপটিপ' এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

৫. এঁটে ধরলে চিঁচিঁ করে, ছেড়ে দিলে লঙ্কা মারে।
'চিঁচিঁ' ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

(iii) শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ঃ

একই শব্দ যখন একাধিকবার অবিকৃতভাবে একেবারে পরপর ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলে শব্দদ্বৈত। বাংলা প্রবাদে আমরা শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ সহজেই লক্ষ্য করতে পারি

১. আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি পরের দোষে দিই তুড়ি।

ব্যাপকতা অর্থে এখানে 'ঝুড়ি ঝুড়ি' শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয়েছে।

২. আঁকুড়া বাঁকুড়া বাসী, মুড়ি খায় রাশি রাশি।

প্রাচুর্য অর্থে 'রাশি রাশি' শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ হয়েছে।

৩ এক সাথে এলাম পাঁচ ভাই,
শেষে দেখি ঠাঁই ঠাঁই।

পৃথক অবস্থান বোঝাতে 'ঠাঁই ঠাঁই' শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ঘটেছে।

৪. আটে পিটে নোয়া,
নিত্যি নিত্যি খোয়া।

প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হয় বোঝাতে 'নিত্যি নিত্যি' ব্যবহৃত।

৫. আগে খায়না বাগে বাগে, পরে খায় সবার আগে।

(iv) ব্যতিহার বহুব্রীহির প্রয়োগ ঃ

বেশ কিছু প্রবাদেই ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

১. রাজার আখবাড়ি,
শেয়ালের কামড়া-কামড়ি।

২. লাউ কুটতে নারে বুড়ী কুমড়া কাটতে দৌড়াদৌড়ি।

৩ সকল পথ লড়ালড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

৪ কানাকানির পর জানাজানি।

৫. আঁটাআঁটি হলেই লাঠালাঠি।

৬. ঠেলাঠেলির ঘর খোদায় রক্ষা কর।

কামড়া-কামড়ি, দৌড়াদৌড়ি; লড়ালড়ি, গড়াগড়ি, কানাকানি, জানাজানি, আঁটাআঁটি, লাঠালাঠি, ঠেলাঠেলি—এ সবই ব্যতিহার বহুব্রীহির নিদর্শন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে কেবল বহুব্রীহি সমাসের ব্যবহারেই লক্ষিত হয় না আমাদের প্রবাদে। অন্যান্য সমাসের ব্যবহারও লক্ষণীয়।

(v) সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার ঃ

বেশ কিছু বাংলা প্রবাদেই সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে দেখা যায়। নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার উল্লেখ মানে বিশেষ করে সেই সংখ্যাটির অর্থই একেবারে আক্ষরিকভাবে উপস্থাপিত, তা কিন্তু নয়। মূলতঃ ব্যাপকতা এবং প্রাচুর্য অর্থেই সংখ্যা শব্দের ব্যবহার।

১. এয়ো স্ত্রী, শতেক স্ত্রী।

২. ওরে আমার ষোল কড়া, ঘরে ভাত নেই বেগুন পোড়া।

৩. কড়িও ছয় বুড়ি, দইও চাপু চাপু।

৪. কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে।
বরের বাপ বসে আছে পাঁচশ টাকার আশে।

৫. কপালে দীর্ঘ ফোঁটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা।

৬. কানা খোঁড়ার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অন্ত,
একশো বিয়াল্লিশ দোষ উঁচু যার দন্ত।

৭. কানা কালা কুঁজো খোঁড়া গোদের অন্ত নাই।
তিনশো বিরাশি বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই।

এখানে উল্লিখিত সব ক'টি প্রবাদেই সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কোনটিতেই অর্থ নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যে দীর্ঘ ফোঁটা ধারীর দর্শনী চোদ্দ টাকা বলা হয়েছে, বাস্তবিকই তার দর্শনী ঠিক চোদ্দ টাকাই নয়। একশো বিয়াল্লিশ দোষ কিংবা তিনশো বিরাশি বুদ্ধি

বলতে আসলে বহু দোষ এবং নানা বিষয়ে বুদ্ধির কথাই উল্লিখিত হয়েছে। একজন এয়ো স্ত্রী শতেক অর্থাৎ বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্ত্রীর সমান বলে বলা হয়েছে '১' সংখ্যক প্রবাদটিতে। অনুরূপভাবে '৩' সংখ্যক প্রবাদের ছয় বুড়ি কড়িকেও রূপকার্থেই গ্রহণ করতে হয়।

(vi) Classifier-এর প্রয়োগ ঃ

১. তুচ্ছার্থে 'টা' এবং গৌরবার্থে 'টি'র প্রয়োগ ঃ
আমার ছেলে ছেলেটি খায় শুধু এতটি,
বেড়ায় যেন গোপালটি।
ওদের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।

এখানে নিজের ছেলের গৌরব রক্ষার্থে 'টি' এবং অন্যের ছেলেকে তুচ্ছ করতে 'টা' প্রযুক্ত হয়েছে।

২. 'খাউ' ও 'যাউ' এই ক্রিয়াপদ দুটির স্বার্থে 'ক' বিভক্তি হীন প্রয়োগ ঃ
আহ্লাদি লো ঝি, তোকে ঝোড়া ঢাকা দি।
তোকে উদ্ বেরালে খাউ, মোর মনের দুঃখ যাউ।

(vii) নামধাতুর ব্যবহার ঃ

১. আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি।
পরকে দিতে জ্বরে গা, পরের নিতে সরে গা।

'জ্বরে' হল নামধাতু।

২. যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।

'ধ্যায়' নামধাতুর দৃষ্টান্ত।

৩ যেমন হাতী যেমন খাবে, তেমন হাতী তেমন নাদবে।

'নাদবে'ও নামধাতুর নিদর্শন।

গ. শব্দ ভাণ্ডার কেন্দ্রিক ঃ

হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের সংযোজন ঃ বাংলা প্রবাদে

আমাদের প্রবাদে অনেক সময়েই হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের সংযোজন ঘটেছে, কিন্তু বিস্ময়করভাবে আমাদের প্রবাদে ইংরেজি শব্দের সরাসরি প্রবেশ ঘটে নি।

১ আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।
২. আসা আর যাওয়া, কুচ্ নেহি পাওয়া।
৩. লাউ ডিঙনা কুমড়া ইস্‌কা ভোজন জুমড়া।
মাছ মছলি কপোতের বাচ্চা।

ইস্‌কা ভোজন কিছু কিছু আচ্ছা।
দুধ দহি সহি ইস্‌কা ভোজন সহি ॥

উপরের তিনটি উদাহরণে হিন্দী শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য চোখে পড়ার মত, কেবল ব্যতিক্রম দ্বিতীয় প্রবাদটি। তবে হিন্দী ভাষার প্রভাব জাত এটি যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেশ কিছু প্রবাদে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—

১ লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি নিতি।
সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি ॥

'বিনশ্যতি' সংস্কৃতের দৃষ্টান্ত।

২ মালা জপোং টপর টপর
কানে আইল দই চূড়োর খপর।

সংস্কৃতের অনুসরণে 'জপোং' ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. হাতের কড়ি বিনশ্যতি।

'বিনশ্যতি' সংস্কৃতের নিদর্শন।

৪ নমো নমো নমো
ঠাকুর চালকলা খেয়ে ঘুমো।

'নমো' সংস্কৃতের নিদর্শন।

৫. উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।
'নমঃ' সংস্কৃত শব্দ।

৬ কপালে লিখিতং ধাতা, খণ্ডাবে কোন গুখেকোর ব্যাটা।

৭ কত রম্ভা ভবিষ্যতি, আরো কিবা আছে গতি।

৮ আপ্তছিদ্র ন জানাতি পরছিদ্র পদে পদে।

সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে কিছুটা সংস্কৃতকে ব্যঙ্গ করতে, কিছুটা সংস্কৃতে অজ্ঞতার কারণে। আর সর্বোপরি লিখিত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে অনেক সময়ে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করতে দেখেছে সাধারণ লোক সমাজ, তাই সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি না থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের প্রয়াস আসলে বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতাকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে।

ঘ. তাৎপর্যতত্ত্বগত :

(i) বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ :

বেশ কিছু বাংলা প্রবাদে আমরা বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করি। বিপরীতার্থক শব্দের সাহায্যে প্রবাদ-দেহ নির্মাণ, প্রবাদের অন্যতম গঠনশৈলী

বলে বিবেচিত হতে পারে। মূলতঃ অর্থ পার্থক্য নির্দেশের জন্য, তুলনার জন্য কিংবা কর্তব্য পালনে বৈপরীত্য রক্ষার ক্ষেত্রেই বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

১. অতি চালাকের গলায় দাড়ি, অতি বোকার পায়ে বেড়ি।

এই প্রবাদটিতে 'চালাক' ও 'বোকা'—এই দুটি বিপরীত অর্থের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবাদটিতে চালাক ও বোকার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

২. অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।

'পিরীত' ও 'বিচ্ছেদ'—এই দুটি বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ এখানে লক্ষণীয়। অতিশয় পিরীত যে ভাল নয় পরিণামে তা বিচ্ছেদকেই অনিবার্য করে তোলে, এই সতর্কীকরণ এখানে সোচ্চার। বাক্যটিতে দুটি বিশেষণ অপরিবর্তিত থাকলেও বিশেষ্যের ব্যবহারে বৈপরীত্য রক্ষা করা হয়েছে।

৩ ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মার লাথি।

এখানে যে দুটি বিপরীতার্থক শব্দ প্রযুক্ত তারা হল যথাক্রমে ধনী ও নির্ধন। ধনী ও নির্ধনের প্রতি কিরূপ আতিথ্য করা কর্তব্য, তার পথ নির্দেশ রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় সমাজে ধনী ও নির্ধনের স্থান কিরূপ, এদের সম্পর্কে সমাজ-মানসিকতা কি, সেই সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে প্রবাদটিতে।

৪. অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে।

এখানে 'অজ্ঞান' শব্দটির বিপরীতে 'জ্ঞানবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুইয়ের আচরণগত পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে প্রবাদটিতে।

৫. অন্ন কাঙালী যায় নগরে নগরে,
বস্ত্র কাঙালী যায় বনে বনে।

এখানে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগটি লক্ষ্য করার বাক্যের শেষাংশে একই শব্দের দু'বার করে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম বাক্যটির শেষে যে দুটি শব্দ ব্যবহৃত (নগরে নগরে), দ্বিতীয় পংক্তির শেষে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় (বনে বনে) তাদেরই বিপরীতার্থক।

৬. আগে সঞ্চয় পরে ব্যয়।

এই বাক্যে এক জোড়া করে বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত—'আগে' এবং 'পরে', 'সঞ্চয়' ও 'ব্যয়'।

৭ আগে যায় পরে পায়।

এখানে 'আগে' ও 'পরে' শব্দদ্বয় বিপরীতার্থক।

৮. অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে
ভাগ্যবন্তের বাপ মরে পৌষ মাসে।

'অভাগা'র বিপরীতার্থক শব্দটি হ'ল 'ভাগ্যবন্ত'।

৯. আদি অন্ত পাওয়া ভার।

এখানে 'আদি'র বিপরীতার্থক শব্দটি হ'ল অন্ত, আরও উল্লেখযোগ্য যে দুটি বিপরীতার্থক শব্দ পাশাপাশি বসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রের মত ব্যবধানে বসেনি।

১০. আজ আমীর, কাল ফকির।

এখানেও এক জোড়া করে বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহৃত। 'আজ' শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দটি হল 'কাল' এবং 'আমীরে'র বিপরীতার্থক শব্দটি হল 'ফকির'।

১১ এগুলে রাম, পেছুলে রাবণ।

এখানেও এক জোড়া করে বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়। ক্রিয়াপদ 'এগুলে'র বিপরীতার্থক হল 'পেছুলে'। অপরপক্ষে 'রাম' এই বিশেষ্য পদটির বিপরীতার্থক শব্দটি হল 'রাবণ'।

(ii) প্রহেলিকা ধর্মী ঃ

আমাদের প্রবাদ সংকলনগুলিতে প্রায়শই প্রবাদ বলে ধাঁধাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে বা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য প্রবাদ ও ধাঁধা এক নয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের কিছু কিছু প্রবাদ প্রকৃতিতে প্রহেলিকা ধর্মী। অন্ততঃ গঠন শৈলীর কারণে প্রবাদ প্রায় প্রহেলিকার পর্যায়ে পড়ে গেছে।

১ যখন আছে দুই পাও, যথা ইচ্ছা তথা যাও।
যখন হবে চার পাও, ভাত কাপড় দিয়ে যাও।
যখন হবে ছয় পাও, বাবা তুমি কোথা যাও।

এখানে মানুষের দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা কেমন আপনা আপনিই চলে আসে তা চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট। দুই পা বিশিষ্ট মানুষ সর্বতোভাবে স্বাধীন, কিন্তু যেই সে বিবাহ করে সংসারী হল, স্ত্রীকে ধরে তার পদসংখ্যা রূপান্তরিত হল চারে এবং তখন তার দায়িত্বও বৃদ্ধি পেল, হ্রাস পেল স্বাধীনতা। এরপর যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করল, তখন আর তার পক্ষে পূর্বের স্বাধীনতাও রক্ষা করা সম্ভব হয়না।

২. অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও।

এখানেও বক্তব্য সহজে বোধগম্য হয় না। অনেক খাবার বাসনা থাকলে

কিরূপে অল্প খাওয়া সম্ভব ? অল্প খেতে হলে অনেক খাওয়াই বা যাবে কি করে ?

প্রথম 'অনেক খাবে' এই ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহারে দীর্ঘজীবী হবার পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে, আর দ্বিতীয় 'অনেক খাও' এই ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহারে তিরস্কার করা হয়েছে, বেশী বেশী খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে 'অল্প খাও' বলতে স্বল্পাহারী হবার সৎ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় 'অল্প খাবে' তে সতর্কীকরণ করা হয়েছে, স্বল্পায়ু হবার কথা বলা হয়েছে।

এক ক্ষেত্রের পরামর্শ অন্য ক্ষেত্রে সতর্কীকরণের রূপ পেয়েছে।

৩ কিবা দেশের গুণ, একই গাছে পান সুপারি, একই গাছে চুন।

এখানে বটবৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বটপাতা পান পাতার মত, বটপাতা বা বটের ডাল ভাঙ্গলে সাদা আটা বেরোয়, তা চুনের মত, আর বটফলকে এখানে সুপারি বলা হয়েছে।

৪. অতি ভাব যেখানে, নিত্য যাবে সেখানে।
যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীর্তি।।

এখানে প্রথম পংক্তিতে উপস্থাপিত বক্তব্য, দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রত্যাহৃত। দ্বিতীয় বক্তব্যেরই প্রাধান্য এখানে। আপাতভাবে মনে হবে নিত্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আসল বক্তব্য দ্বিতীয় পংক্তির শেষাংশে প্রকাশিত, যেখানে নিত্য গেলে বিরোধ বাধার সম্ভাবনার কথা বলে সতর্কীকরণ করা হয়েছে। মোদ্দা কথায় বিরোধ এড়াতে নিত্যদিন যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এখানে পরোক্ষ নৈতিকরণ লক্ষিত হয়।

(iii) বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগ ঃ

ধাঁধার সঙ্গে প্রবাদের গঠন শৈলীগত অন্যতম প্রধান পার্থক্য হল, ধাঁধায় ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেক সময়ে অর্থহীন অথবা মূল বক্তব্যের সঙ্গে সংস্রবহীন শব্দ প্রযুক্ত হয় উত্তরদাতাকে বিভ্রান্ত করার সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে। কিন্তু প্রবাদের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য তথা শব্দ ব্যবহারের অবকাশ নেই। তথাপি মাঝে মাঝে বাক্যালংকার ব্যবহৃত হতে দেখা যায় প্রবাদে। বলাবাহুল্য প্রবাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে এগুলি সম্পর্ক বিরহিত।

১ ওই ওই ওই, কার কথা কই।
বউ বলে—আন্, ঝি বলে আন্।
টানাটানি হয় লয়ে শাশুড়ীর প্রাণ।

২. আলি আলি আলি
যেখানে যাই সেখানেই শুধু ভাজা বালি।

উদ্ধৃত প্রবাদ দুটির প্রথম পংক্তি গুলি মূল বক্তব্যের সঙ্গে সংস্রবহীন।

(iv) প্রবাদে সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ প্রাচুর্য ঘটলেও সন্ধিবদ্ধ পদের তেমন প্রয়োগ সচরাচর চোখে পড়ে না। তবু দু' একটি প্রবাদে যে সন্ধিবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হয়নি এমন নয়, যেমন—

(১) ইষ্টানিষ্ট বোধ নাই, যারে পাই তার সঙ্গে যাই।
ইষ্ট + অনিষ্ট = ইষ্টানিষ্ট।

(২) কালের নেই কালাকাল।
কাল + অকাল = কালাকাল।

(v) অর্থালংকারের ব্যবহার ঃ

(i) আমরা পূর্বেই অনুপ্রাস অলংকারের নিদর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করেছি, এইবার সমাসোক্তি অলংকার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ঃ

১. ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে, তুমি বড় ফুটো।

ঝাঁঝরি—এই জড় পদার্থের উপর বাক্‌শক্তি আরোপিত হয়েছে।

২. কাঙাল বলে, ধন পাই,
ধন বলে, আশমানে যাই।

এখানে 'ধন' এই জড় পদার্থের বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

৩. কান কাঁদেন সোনারে, সোনা কাঁদেন কানে রে।

'সোনা'কে ক্রন্দনশীল করে সমাসোক্তি অলংকার করা হয়েছে।

৪. কানের জন্যেতে সোনা গড়াগড়ি যান।

সোনা এই জড় পদার্থের চেতন প্রাণীর মত গড়াগড়ি খাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যেহেতু সেই বৈশিষ্ট্য যা চেতনে লভ্য তা আরোপিত হয়েছে, তাই সমাসোক্তি হয়েছে।

(ii) ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত ঃ

ঠাকরুণের গর্ভ চমৎকার।
বিইয়েছেন এক বাঁদর অবতার।

—ঠাকরুণের এখানে প্রশংসার ছলে নিন্দা করা হয়েছে।

(iii) উপমা অলঙ্কার ব্যবহারের নিদর্শন ঃ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিতা।

এখানে উপমেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে উপমান পিতার তুলনা করা হয়েছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'সমে'র সাহায্যে।

(iv) বাচ্যোৎপ্রেক্ষার নিদর্শন ঃ

এক মায়ের একপুত খায় দায় যেন যমের দূত।

এখানে উপমেয় এক মায়ের যে এক পুত তার সঙ্গে যমদূতের তুলনা করতে গিয়ে উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে সংশয়বাচক শব্দ 'যেন'র সাহায্যে।

(v) প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার ব্যবহার ঃ

১. ধর্মের সংসার পাথরের গাঁথনি।

এখানে ধর্মের সংসার হল উপমেয়। উপমেয়কে উপমান 'পাথরের গাঁথনি' বলে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সংশয়বাচক শব্দ অনুল্লিখিত থেকে গেছে। তাই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

২ অমানুষের বোল, তিত্ পটোলের ঝোল।

এখানেও অমানুষের কথা তিক্ত পটোলের ঝোল বলে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সংশয়বাচক শব্দটি অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

(vi) বাংলা প্রবাদে রূপক ও যমক অলংকারের প্রয়োগ বেশ ভালই। যেমন—

১. উঠান সমুদ্র পার হওয়া।

এখানে উঠান ও সমুদ্র এই উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। তাই রূপক অলংকার হয়েছে।

২. এক রাত্রির দেখা, তুমি প্রাণ সখা।

'প্রাণ সখা' এই সমাসবদ্ধ পদে উপমেয় 'প্রাণে'র সঙ্গে উপমান 'সখা'র অভেদ কল্পনা করা হয়েছে, অর্থ করা হয়েছে প্রাণ রূপ সখা।

(vii) যমক অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে, এইবার সেইরকম কয়েকটি প্রবাদের নিদর্শন নেওয়া গেল—

১. কথাতে হাতী পায়,
কথাতে হাতীর পায়।

এখানে 'পায়' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিবিধ অর্থে। প্রথম 'পায়' পদটি ক্রিয়া পদ রূপে ব্যবহৃত, দ্বিতীয় 'পায়' শব্দটি বিশেষ্য পদ রূপে অর্থাৎ 'পদ' অর্থে প্রযুক্ত।

২. টাকা দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল।

এখানে 'গোল' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অর্থ প্রকাশ করেছে দ্বিবিধ। প্রথম 'গোল' শব্দটির অর্থ গোলাকার, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'গোল' শব্দের অর্থ হল গোলযোগ বা গোলমাল।

৩. কাল বললে ধরে কাল।

এখানেও যমক অলংকার হয়েছে। কেননা 'কাল' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত

হয়েছে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। প্রথম 'কাল' শব্দটির অর্থ হল আগামীকল্য, আর দ্বিতীয় কাল শব্দটির অর্থ হল মৃত্যু।

৪ এখন বাদশাহীর মতন চাল
শেষে হাটখোলাতে কাঁড়বে চাল।

এখানে 'চাল' শব্দটির দুবার দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার যমক অলংকারের নিদর্শন হয়ে উঠেছে। প্রথম 'চাল' শব্দটির অর্থ হল 'চালচলন', দ্বিতীয় 'চাল' শব্দের অর্থ তণ্ডুল।

৫. কুল ত নয় কুলের আঁটি
নরম নয় দাঁতে কাটি।

প্রথম 'কুল' শব্দের অর্থ বংশ, দ্বিতীয় 'কুল' শব্দটি গোলাকার বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির ফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. **বাক্যবিন্যাসগত :**

(i) পুনরাবৃত্তি :

লোকসাহিত্যে একই কথার পুনরাবৃত্তি একটি অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাংলা প্রবাদের জগতে এমন কিছু প্রবাদের সন্ধান আমরা পাই, যেখানে প্রবাদের দুটি অংশ একে অন্যের পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

১. বন রাখে বাঘে, বাঘ রাখে বনে।
২. শিব রক্ষক বন বন রক্ষক শিব।
৩ পর নয় আপন, আপন নয় পর।
৪ দূরমণ্ডল নিকট পানি, নিকট মণ্ডল দূর পানি।
৫. ফল ভেঙে ফুল, ফুল ভেঙ্গে ফল।
৬. থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।
৭. রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

দৃষ্টান্তগুলির কোনটিতেই প্রথমাংশে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে সেগুলি ছাড়া ভিন্নতর কোন শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি। এমনকি দু' একটি ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রথমাংশে শব্দগুলি যে শৃঙ্খলায় ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে প্রথমাংশের ক্রমকেই আক্ষরিকভাবে বিপরীত দিক থেকে অনুসরণ করা হয়েছে। 'পর নয় আপন, আপন নয় পর'—এই প্রবাদের প্রথমাংশ 'পর নয় আপন', দ্বিতীয়াংশটি হল, 'আপন নয় পর'। লক্ষণীয় প্রথমাংশের শেষ শব্দ আপন দ্বিতীয়াংশে প্রথমে যুক্ত হয়েছে, প্রথমাংশের দ্বিতীয় শব্দটি 'নয়' উভয় অংশেই একই ক্রমে বসেছে এবং প্রথমাংশের প্রথম শব্দ 'পর' দ্বিতীয়াংশের সর্বশেষ শব্দ রূপে যুক্ত হয়েছে। একই বক্তব্যকে জোর দিয়ে বলার জন্য এবং সেইসঙ্গে গতানুগতিকতা

ভাবটিকে রক্ষার করার জন্যই এমনভাবে পুনরাবৃত্তির প্রয়োগে প্রবাদের স্রষ্টাদের ঝোঁক দেখা যায়।

(ii) নেতিকরণ ঃ

বাংলা প্রবাদের গঠন শৈলীতে নেতিকরণ (Negation) একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। নঞর্থক বক্তব্যকেও কতখানি শিল্পমণ্ডিত করে এবং জোর দিয়ে উপস্থাপিত করা সম্ভব আমরা তারই পরিচয় পাই।

১. সাঁঝের অতিথি অতিথি নয়
বিহানের বাদল বাদল নয়।

এখানে সাঁঝের অতিথিকে অতিথিরূপে স্বীকার করা হয়নি, বিহানের বাদলকেও বাদল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আর এই অস্বীকৃতি জানাতে 'অতিথি' এবং 'বাদল' শব্দের প্রতিটি দু'বার করে উচ্চারিত হয়েছে।

২. অতি চতুরের ভাত নেই, অতি সুন্দরীর ভাতার নেই।

কোন কিছুরই আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নয় বোঝাতে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে দু'টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা হয়েছে অতি চতুর ব্যক্তি অভুক্ত থাকে এবং অতি সুন্দরীকে অনূঢ়ার জীবন যাপন করতে হয়।

৩. এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়,
এক কড়ি কড়ি নয়।

এই প্রবাদটিতেও নঞর্থক বক্তব্য উপস্থাপনে 'পুত', 'চোখ' এবং 'কড়ি'র পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৪. ঝি দিলেও জামাই নয়,
না দিলেও বাপ নয়।

৫. একলা গেলেও আগে যাই না,
নুন দিয়ে খেলে শুধু ভাত খাইনা।

৬. রাজারও রেয়েত নয়, সাধুরও খাতক নয়।

(iii) প্রবাদ মূলতঃ অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাই বলে গদ্য প্রবাদও অপ্রতুল নয়—

১. আপনার ঘোল কেউ টক্ বলে না।

২. আপনার নয় ঠাকুর পরে করবে কি।

৩. আপনার ঘরে সবাই রাজা।

(iv) গঠন শৈলীর বিচারে বাংলা প্রবাদগুলিকে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

১ অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রবাদ—

ক. কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনও নয়।

খ. কুড়িয়ে নিতে রত্নচয় সকলেই নত হয়।
গ কানা খোঁড়া একগুণ বাড়া।
ঘ. কান টানলে মাথা আসে।
ঙ. কান্দে পোলায় দুধ খায়, না-কান্দে পোলায় শুইয়া নিদ্রা যায়।
চ. কেউ মরে বিল ছেঁচে কেউ খায় কই।
২. উপদেশাত্মক প্রবাদ—
ক কাঙালকে শাকের খেত দেখাতে নেই।
খ. কানে কালা হও চোখে কানা হও।
গ কায়েত, কালসাপ, বেদোনারী, তিনজনকে পরিহরি।
৩. মন্তব্য—
ক. কিবা মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী।
খ. কাঠ কুড়ানীর মেয়ে রাজা আনল ঘরে।
গ. কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘি-ভাত খাওয়া।
৪. প্রশ্নবোধক প্রবাদ—
ক. কাদা মেখে ধোয় কাদা, তারে কেবা বলে গাধা?
খ. কেঁচোয় যদি মাথা তুলে কেউ কি তারে কেউটে বলে।
গ. কানা কি বুঝে চাঁদের আলো?
৫. সতর্কীকরণ—
ক. কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে।
খ. কাঠ খেলে আঙরা হাগতে হয়।
গ. কাঠ-কাটুনে, লোহা-পিটুনে, বেনে বিষম জাত,
তাদের সঙ্গে পীরিতে ঘর পোড়ে রাতারাত।
৬. ভর্ৎসনামূলক—
ক. এমন পদার্থ ছেড়ে মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।
খ. এমন সুন্দরের মুখে ছাই, জাতি কুলের ঠিক নাই।
৭. খেদোক্তিসূচক—
কাজ নেই ত করি কি, গলায় একগাছ দড়ি দি।

চ. **সন্দর্ভকেন্দ্রিক** (Discourse)

(i) উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক প্রবাদ ঃ

আমাদের বেশ কিছু প্রবাদ উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক। একাধিক চরিত্রের বক্তব্য সংলাপের ঢঙে উপস্থাপিত হওয়ায় একধরনের নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে প্রবাদগুলিতে। আমাদের প্রবাদের রাজ্যে নিঃসন্দেহে এই জাতীয় প্রবাদগুলি বৈচিত্র্য সঞ্চালক হিসেবে বিবেচিত হবার দাবী রাখে।

ক অনুকি কামড়ালে চুলকোয় গা,
একটু তেল দে অমর্ত্যর মা।
তেল আছে, নেই পলা, কাল এস দুপুরবেলা ॥

এখানে দাতার অনীহা চমৎকার ভাবে প্রকাশিত। গ্রহীতার পরিচয় অনুল্লিখিত থাকলেও অমর্ত্যর মাকে এখানে অনিচ্ছুক দাতা রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রবাদটির স্রষ্টা নাট্যকারের মত অন্তরালে আত্মগোপন করেছেন, সরাসরি আত্মপ্রকাশ করেননি বক্তব্যের ডালি নিয়ে।

২. আমার ঠাকুর খান কি ? ঘি-ভাত।
না পেলে ? শুধু ভাত ॥

এখানে প্রশ্নকর্তার বক্তব্য উত্তরদাতার কণ্ঠেই বাঙ্ময় হয়েছে এবং জানান হয়েছে যে উত্তরদাতার ঠাকুর ঘি-ভাত ভক্ষণে অভ্যস্ত। প্রবাদটির দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রশ্নকর্তার আত্মপ্রকাশ কল্পিত হতে বাধা নেই যেখানে ঘি-ভাতের বিকল্প ঠাকুর কিছু খান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়েছে। উত্তরদাতা জানিয়েছেন, সেক্ষেত্রে ঠাকুর তাঁর শুধু ভাত খেতেই অভ্যস্ত। আবার যদি প্রশ্নকর্তার আত্মপ্রকাশকে অস্বীকার করতে চাই, প্রথম পংক্তির মত দ্বিতীয় পংক্তিতে উপস্থাপিত প্রশ্নটিও উত্তরদাতার মাধ্যমেই উপস্থাপিত বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে এই প্রবাদটিকে monologue-এর বিরল দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করার পথ প্রশস্ত হয়।

৩. Monologue-এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত প্রবাদটিকেও বিবেচনা করা যেতে পারে—

এ গাঁয়ের মাতব্বর কে ? ছিলাম ত আমি।
এ গাঁয়ের বেকার কে ? পয়সা পেলেই ত নামি।

কেউ যদি এখানে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার পৃথক পৃথক সত্তাকে মেনে নিতে চান, তবে সেক্ষেত্রেও নাটকীয়তা গুণটি যে এই প্রবাদেও বর্তমান, এ সত্য অস্বীকৃত হয় না।

৪. উদারী উদারী বলি তোরে, সোয়ামী ধার দিবি মোরে ?
ধানে পারি, চালে পারি, সোয়ামী ধার কি দিতে পারি ?

যতই প্রশ্নকর্তা উদারতার মূর্তিমান প্রতীক বলে উত্তরদাতাকে অভিহিত করুক এবং তার কাছে তার স্বামীকে কর্জ চাক, উত্তরদাতার স্পষ্ট উত্তর—ধান-চাল ধার দিতে সক্ষম হলেও স্বামী ধার দিতে সে অক্ষম। উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক প্রবাদ বিরল দৃষ্টান্ত নয়, মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাতেই যে লভ্য সেই পরিচয় লাভের জন্যই আরও একাধিক অনুরূপ প্রবাদ দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হল।

৫. কেঁদো না মা জননী, কাঁদিনি মা, আমার মুখই এমনই।

এক্ষেত্রে যাকে 'জননী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেই উত্তরদাতা রূপে উপস্থাপিত। অপরপক্ষে ক্রন্দন করতে বারণ করেছে যে সেই অনুরোধকারী বা কারিণী প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ।

৬. কুড়ুলটা একটু দেবে কি ? ঘরে নেই তার দেব কি ?
না কর কেন, ওই তো দেখি। তোর গরজে দেব নাকি ?

কুড়ুল যাচঞাকারীকে এখানে কিভাবে বিমুখ করা হয়েছে তার অনবদ্য—শিল্পমণ্ডিত নেতিবাচক উত্তরটি বাস্তবিকই বাঙালীর রসিক মানসের পরিচায়ক-রূপে গৃহীত হবার যোগ্য।

(ii) ইডিয়ম যুক্ত প্রভাব ঃ

ইডিয়ম এবং প্রবাদ এক জাতীয় নয়, অন্ততঃ রূপের বিচারে। প্রবাদ হল একটি সম্পূর্ণ বাক্য, যেখানে একটি ভাব বা বক্তব্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত। A Proverb is a short Sentence ; কিন্তু ইডিয়ম হল বাক্‌পদ্ধতি, 'Mode of Expression peculiar to a tongue'। বাংলায় ইডিয়মকে বলা হয় বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ, যা নাকি প্রবাদের অংশ মাত্র। বিজ্ঞ লোকসংস্কৃতিবিদ্ মন্তব্য করেছেন, 'বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ বা ইডিয়ম' বাক্যের অংশ বলিয়া বিশেষ ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বিভিন্ন বাক্যের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া ব্যবহার করা যায়'।

আমরা বেশ কিছু প্রবাদের সাক্ষাৎ পাই, যেখানে বিশেষ অর্থ যুক্ত এই সব ইডিয়ম বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা প্রবাদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ইডিয়ম যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ, অবশ্যই ক্ষেত্র বিশেষে—

১ এখানে নয়, ওখানে ছয়।

এই প্রবাদে 'নয়-ছয়' ইডিয়মটি ব্যবহৃত হয়েছে। সচরাচর ইডিয়ম বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাদে প্রযুক্ত হয়না, যা এখানে হয়েছে।

২. এটা ধরি না ওটা ধরি, হাতের পাঁচ ছাড়তে নারি।

এখানে যে ইডিয়মটি প্রযুক্ত, সেটি হ'ল 'হাতের পাঁচ'।

৩ কই মাছের প্রাণ, অল্পেতে না যান।

এখানে 'কই মাছের প্রাণ' ইডিয়মটি যুক্ত হয়েছে।

৪ কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানি গাছে শুয়ে।
কলুর বলদ ঘানি টানে চোখে ঠুলি দিয়ে।

'কলুর বলদ' ইডিয়মের প্রয়োগ ঘটেছে এখানে।

৫ কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা।
বামন হয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা ।।

'বামন হয়ে চাঁদে হাত' ইডিয়মটির ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়।

৬ ঢেঁকির নয় ছয় কুলোর উনিশের বন্ধ।

এখানে যে ইডিয়মটি প্রযুক্ত হয়েছে, সেটি হল 'নয় ছয়'।

ইডিয়ম হল বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ, ব্যাখ্যাত না হলে এর তাৎপর্য বোধগম্য হয় না। কেননা প্রবাদের মতই ইডিয়মেরও বাচ্যার্থ মূল লক্ষ্য নয়, ব্যঙ্গার্থই মূল লক্ষ্য। ইডিয়ম যখন প্রবাদে ব্যবহৃত হয়, তখন কিন্তু ইডিয়মের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, কেননা ইডিয়ম যুক্ত প্রবাদে ইডিয়মের ব্যাখ্যা সুলভ। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বিচ্ছিন্নভাবে ইডিয়ম যেখানে দুর্বোধ্য, ইডিয়ম যুক্ত প্রবাদ সেখানে সুবোধ্য।

লোক প্রজ্ঞার অমূল্য সম্পদ হল প্রবাদ। একটি জাতির আচার-আচরণ, এবং বহু কালার্জিত অভিজ্ঞতা, সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষজ্ঞান বা আন্তর-অনুভূতি রসবোধের সংযোগে স্বতোৎসারিত হয়েছে প্রবাদে। এগুলির অধিকাংশই বিশেষ যুগে আবদ্ধ নয়, এ সর্বকালের। কোনো বিশেষ কালের সামাজিক রীতি-নীতি, মানুষের সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস ও সমাজের অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাংসারিক জ্ঞান, অবিকল প্রকাশ পায় প্রবাদগুলির মাধ্যমে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হচ্ছে লোকমুখে ব্যবহৃত বহুপ্রবাদ। মনোভাব প্রকাশে এগুলির সাহায্য এখন আর জরুরী মনে হচ্ছে না, বরং গ্রামীণ এলাকার সচেতন মানুষের কাছে এগুলোর ব্যবহার লজ্জাকর বলে অনুভূত হচ্ছে। কিছু প্রবাদ সংকলিত করে দেওয়া হল —

১ পাট বেচো আড়ে, ধান বেচো খালে
ঝাল বেচো কস্মিনকালে।

২. আমে বান, তেঁতুলে ধান।

৩. পর জামাই এর মাথায় ছাতি,
নিজ জামাই এর মুখে লাথি।

৪. চৈত্রে কু, ভাদরে বান

৫ কালো নারী, কুয়োর জল
পাকাবাড়ী বৃক্ষ তল।

৬. ঢিল মারি তো টিনের চালে।

৭. পাল (গরুর দল) ঘুরলে, গড়ে (কুড়ে) আগে।

৮. চাষার চাষ দেখে চাষ করল গোয়াল,
ধানের নামে খোঁজ নেই বোঝা বোঝা পোয়াল [বিচালি]

৯ ধানের জন্য বিচালির যত্ন।

১০. থ্যামের সময় [কাজের চাপ] কুড়ে বাগায় কড়ি।

১১. হেগো নারী মুখে দড়।

১২. বাতাস বুঝে থুথু ফেলতে হয়,
মানুষ বুঝে কথা বলতে হয়।

১৩ নওয়া পাড়ার বামুন, বাদাল ঝির কাঁসারী,
কালবাঘার খোঁপা, কালি নগরের চোপা।

১৪. পেটে ভাত নেই ঠোঁটে সিঁদুর।

১৫. কামড়ালো পদে, মাথায় গিয়ে জলপটি বাঁধে।

১৬ নেই ধান, তো নিড়িয়ে আন।

১৭. দু'বার গম, একবার মসনে,
খেঁড়ুয়ে আর যাস্‌নে।

১৮ মামা ভাগ্নের চাষ মনে মনে হাস।

১৯. বাইরে কোঁচার পত্তন,
ঘরে ছুঁচোর কেত্তন।

২০. যে মরবে আপন দোষে,
কি করবে হরিহর ঘোষে।

২১. জমি নয় যম।

২২. নেড়ে জুতায় সোজা।

২৩. কলাবতী বৌটি আমার কত কলাই জানে,
কলা গাছে নাঙ উঠিয়ে বেগড়ো ধরে টানে।

২৪. যার নেই জ্ঞান উত্তর পুব, তার মনে সদাই সুখ।

২৫. মুরগীর পাছায় তেল হলে
মোল্লার্ দোরে ঘোরাঘুরি করে।

২৬. গোয়ালা গরজে ঢেলা বয়।

২৭.. ঠেলায় পড়লে ঢেলায় গেলাস।

২৮. শাশুড়ী বৌ এর ঝগড়া
সকাল বেলাকার মেঘলা [ক্ষণস্থায়ী]

২৯. খন্দের কথা, বাচ্চা হবার ব্যথা। [মনে থাকে না]

৩০. খায় কি খায় না বৌ, আকালে বোঝা যায়,
হাগে কি হাগে না বৌ মেঘলায় বোঝা যায়।

৩১ ব্যবসার পান, বিড়ি; চাকরীর মাষ্টারি।

৩২ ভরার চেয়ে খালি ভালো যদি ভরায় (অন্তঃসত্ত্বা নারী) ভরতে যায়,
আগের চেয়ে পিছে ভালো যদি ডাকে মায়।

৩৩. দাদি ফুফুর খাওয়া
মার হাওয়া।

৩৪. যা নেই তোর গুলায়,
তা আছে আমার ঝুলায়। [ফকিরী প্রসঙ্গ]

৩৫. কালো বামন, ধলা কৈবর্ত্য, বেঁটে মুসলমান
ঘর জামাই আর পোষ্য পুত্র এরা সব সমান।

৩৬. ক্ষেতের কণা, লঙ্কার বাণিজ্য।

৩৭. ফোঁড় গুণে আপসে খেতে হয়।

৩৮. দাতার নারকেল, বকিলের [কৃপণ] বাঁশ।

৩৯. মাগীর মুখে বড় রস,
পাত্র ভর্তি আমানি ভাত গোটাদশ।

৪০. মুখে দেয়না মুতে চিৎ হতে চায় শুতে।

৪১ বাঁজা কি জানে বাঁচার স্বাদ।

৪২ সাত আনায় ফকির তাজা,
এক আনায় কুকুর তাজা।

৪৩ কচি পাঁঠা, বুড়ো মেষ,
দধির আগে, খলের শেষ।

৪৪ ফুটোদের কোন বাড়ী,
শিকেয় ঝুলছে কালো হাঁড়ি।

৪৫. যেখানে রাত সেখানেই কাৎ।

৪৬ নুনে গাড় মেরে দিয়েছে,
আদা দিয়ে আর ফ্যাদা হবে।

৪৭. বাবার কালে দেখেনি ডুলি,
ডুলি দেখে চার পা তুলি।

৪৮. দস্যুর দশ দশা কখনো হাতি কখনো মশা।

৪৯. গরীবের বউ সব্বলের ডেইনি।

৫০. হায়াৎ লেখা কপালে মজুত লেখা পায়।

৫১. কে বলল কিসের কথা,
পা দিয়ে চুলকায় মাথা।

৫২ গমও নরম, জাঁতাও ঢিল।

৫৩. ধান ভানুনির বিটা আমার মোড়ল সেজেছে
পান্ত ভাতে নুন জোটেনে আতর মেখেছে।

৫৪. আর করিসনে ফুটো জাঁক,
যেমনি আছিস তেমনি থাক।

৫৫. এক ছাগলের ধাড়ি, হাজার টাকার বাড়ী।

৫৬. যখন হবে তখন খলে ভাসাভাসি,
যখন হবে না তখন গিলতে কষাকষি।

৫৭. হরিদাস ধান দিলো না,
গ্রামের লোক ভাত খেলো না।

৫৮. ঘরে নাই কাটা বারা
কিনে বেড়াই লাল দামরা।

৫৯ দুই দিনের বৈরাগী হইয়া
ভাতক কয় প্রসাদ।

৬০ ঝাঁপে ব্যাঙ্গ ভাঙ্গে ঠ্যাং

৬১. ফাকুতে কাটানু দিন
হামালুরে মোরে আজ তুই।

৬২ নয়া নয়া বতুয়া শাক
ত্যালে নুনে খাই
বুড়ো হইলে বতুয়া শাক
দুয়া বাড়ি যায়।

৬৩ চ্যাংরা গরা ধান খায়
বুড়া গরার টোং যায়।

৬৪. ঐ যে বলে কইসে
আরো কবার চাইসে।

৬৫ সাজালে গোছালে বেটি
মুছিলে পুঁছিলে মাটি
বামুর দিলে চাটি।

৬৬ যার লাগি মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম।

৬৭ হাউশের বিদ্যা রূপণের ধন।

৬৮ দেখিলে মনত পড়ে
না দেখিলে মন ঠন্ ঠন্ করে।

৬৯ মুখ না হয় ভাল
চড় খায় গাল।

৭০ অধিক ঢ্যাঙা না হই
বাতাসে হেলায়
অধিক খাটো হই
ব্যাঙ এনে দেয়।

৭১ ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম ।

৭২ মেও মেও বিলাই (বিড়াল)
হাড়ি বাড়ি যম
[উপরে চুপ্‌চাপ্‌, কিন্তু ভিতরে শয়তানির ভাব]

৭৩ ঠাঙ্গ ঠং করে
কচু পাতায় রং করে ।
[অতিরিক্ত নাটকীয়তা যারা করে]

৭৪ সেনদুরাই আমের
তলত ঘুন ।
[উপরে সরস কিন্তু ভিতরে অত্যন্ত কুটিল]

৭৫ যেমন দেওয়ের তেমন পূজো
পেত্তানি দেওয়ের ভাজা ভুজা ।
[যে যেমন লোক তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করতে হবে]

৭৬. যার কথা এক,
স্বর্গে মর্ত্যে লাগে ঠেক ।
যার কথা দুই,
তার হত্যি নিহি থুই ।
যার কথা তিন,
দেখতে লাগে ঘৃণ ।

৭৭. ঠগে নষ্ট করে গাও
আর বাপ মায়ে নষ্ট করে ছেলের নাম ।

৭৮ একে তো দুখিয়ার দুঃখ
পন্থে বাজায় ব্যানা
তার চাইতে অধিক দুঃখ
গাবুর বয়সের ঢেনা । [বিপত্নীক]

৭৯. সুজনেরও ডুবে নাও
হাতীরও পিছিলে পাও ।

৮০. নদী নাই দেখিতে নাঙোট হওয়া

৮১. উদে মারে মাছ, খাটাসে করে তিন ভাগ ।

৮২. রাজারও রাজকাম নিজেরও পেটভাত ।

৮৩. গাছত কাঁঠাল গোঁফে তেল ।

৮৪. গুণ্ডো নাই তার
ফাক্‌কা বড় ।

৮৫ ঘরত নাই কাটা বাড়া
নাম বাড়াইছে ফটোমারা।

৮৬. ধনিক দেখিক ধনিক খুশি
আন্দা ভাতত মারে খাসি
নিধানিয়া ধরে ধনির পাছ
ধরেক পাশুন মারেক ঘাস।

৮৭ ছোট লোকের ছাওয়া হয়ে
কমিলিত বইসে
টিকা সঙ সুঙয়াই
মনে মনে হাসে।

৮৮. লালনে বহবো
দোশারত তরণে বহবো
পুত্র অন্ত শিষ্য তন্ত্র
ন লালনে বহবো শুনান
বহুদোষ জন্মে পুত্র করিলে পালন
বহু গুণ হয় পুত্র করিলে তারণ ।।

৮৯. আজ জন্মের সংস্কার না হয় দূর
যদি হয় মুনির কন্যা
তবু হয় জুতা চাটা কুকুর ।।

৯০. আট হাত কাউয়া
দশ হাত নাউয়া
ষোলাত বোল্লার নাক
কুড়ি হাত বামনের নাক।

৯১. এতই যদি ছিল মনে
দারাণ প্রেম বাড়াই কেনে।

৯২. বই মাষ্টার কিসে কয়
শুনো নাহি যায়
সাহেরাণার উপর দিকে
চাঁদ দেখা যায়
চল কন্যা আমার অন্তঃপুরে চলে যায়।

৯৩. মৃত্যুকে স্বামী ফেলাও জলে
চল কন্যা আমার ঘরে
আমার ঘরে গেলে কন্যা
সাহবে ঠাকুরাণী

অন্যের ঘরে গেলে কন্যা
সাহবে কুকুরাণী।

৯৪ ঘাটাং পালিং কামার
দাও গড়ে দাও হামার।

৯৫. ধান খায়া যায় ভবানন
ছামের গালাৎ দড়ি

বাংলা : উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।

৯৬. সুদিনের কনো ভাই,
কুদিনের কাঁহা নাই

বাংলা : সুসময়ে বন্ধু বটে—সকলেই হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

৯৭ উপুরোৎ রঙ চঙ তলং মহাকালের ফল।

বাংলা : চক্ চক্ করলে সোনা হয়না।

৯৮. ছানের ভিড়াৎ পদ্মফুল।

বাংলা : গোবরে পদ্মফুল।

৯৯ গোরোৎ দিসে মাটি, গেইসে মাথামাথি

বাংলা : এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো।

১০০ খুশির নাও ভাঙ্গাং চলে।

বাংলা : মনের মিল হলে সব কাজ সহজ হয়।

১০১. ধর্মের কেন্দেলা বাসুদেবে বাজায়।

বাংলা : ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

১০২. দূরে দূরে হামলাই, বগল আসিলে কামড়াই।

বাংলা : দূরের জিনিস ভালো মনে হয়।

১০৩ যেমন ঝাপা তেমন কুপা।

বাংলা : বাপ্‌কা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া।

১০৪. মাছ খালুং মাগুর
ভাতার ধরলুং দেশের ঠাকুর।

১০৫. শ্যাম, শম্ভু, পঞ্চানন / আর আছে তিন বেরাম্ভণ।

১০৬ বাঁশ, বঁড়শে, গাঁজা খোর / তিন নিয়ে ঘাটেশ্বর।

১০৭. জাঁক করলো তাতলার শিবু হরি / রোম বিকালো আড়ি আড়ি

১০৮. বিংশনগরের গাছের পাতায় টাকা চায়।

১০৯. যত ওঁচা / মুড়ো গাছা।

১১০. কিলিয়ে মালুম গাছা পাঠাবো।

১১১. ঘরের গেহু চাল উঁচু (গিন্নি কর্তা)।

১১২. মরে গেল হামিদ খাঁ / দিয়ে গেল অর্ধেক গাঁ।

১১৩. সারা বছর চাষ করে / চাষীর এক আধলা লুকসান।

১১৪ জমি নয় মা।

১১৫ মটরের রেসরাণিতে মুশুরি চ্যাপ্তা (চ্যাপ্টা)।

১১৬. কলির মানুষ কলির পাঁঠা।

১১৭ গরগরা না হরহরা, লোক জন হাঁসালি
আপনে না ধাপমে আমার পরাণ বাঁচালি।

১১৮. নয় মানসে কয় কতা / সইতে না পার যাই কুথা।

১১৯ পালাম থালে দিলাম গালে / পাপ নেইকো কোন কালে।

১২০ ভাব ভাব তেলা কুচো / ভাব নিয়ে যাবে কাল ছুঁচোয়।

১২১. আলনার ভাত নুন দিয়ে খাওয়া (গভীর বিষয়)

১২২ আস্তে, এখনো দই আছে।

১২৩ পানিতেই পানি ভাঁড়ায়।

১২৪. ডেকে ষাঁড় পোয়াল গাদায় নেয়া।

১২৫. মাথার কাপড় পড়ে যাওয়া। (বিধবা)

১২৬ শিখ (শিক্ষা) দিতে সবাই আছে / ভিখ্ দিতে কেউ নেই।

১২৭. এমনি হয়না, ভুজোয় তেলা।

প্রচলিত প্রবাদ সংকলনগুলিতে এখানে সংকলিত প্রবাদগুলির অধিকাংশেরই হদিস সহজে মিলবে না, তাই ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ এই প্রবাদগুলি এখানে সংকলি করা হল।

অধ্যায়/দুই

ধাঁধা : বুদ্ধি যাচাই ও কৌতুক সৃষ্টির আধার

বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল ধাঁধা বা প্রহেলিকা। লোকসাহিত্যের একটি বিভাগ হওয়ায় সাহিত্যিক ধাঁধার মত প্রথমাবধি তা লিখিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত ধাঁধাও মৌখিক ঐতিহ্যের সূত্রে প্রজন্ম পরম্পরায় টিঁকে থাকে। শুধু তাই নয়, লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলির মত ধাঁধা সংহত সমাজেরই সৃষ্টি। ব্যষ্টির সৃষ্টি হয়েও গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সমষ্টির সৃষ্টিরূপেই তা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এই কারণেই সাহিত্যিক ধাঁধায় যেমন রচয়িতার সন্ধান মেলে, লৌকিক ধাঁধার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোন বিশেষ রচয়িতার সন্ধান পাই না।

ধাঁধার বর্তমানে শিশুরঞ্জনের ভূমিকা ছাড়া আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষিত হয় না। শিশুদের পত্র-পত্রিকার পাতাতেই তাই অন্যান্য নানা বিনোদনমূলক উপহারের সঙ্গে ধাঁধাও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কোন কোন সমাজে অবশ্য ধাঁধার কিছু সামাজিক মূল্য এখনও অবশিষ্ট আছে। যেমন—বিবাহে বর অথবা বর পক্ষীয়দের কন্যা পক্ষীয়ের তরফে ধাঁধা জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু ধাঁধার প্রাচীনত্ব এবং তার ব্যবহারের ব্যাপকতা থেকে প্রমাণিত হয় এগুলি নিছক বিনোদনের উপাদান হিসাবেই অতীতে ব্যবহৃত হত না। অন্যান্য উপযোগিতাও একসময়ে ছিল। বিশেষতঃ সামাজিক উপযোগিতা। বুদ্ধির পরীক্ষা কিংবা নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াসকে বাদ দিয়েও বলা যায় ধাঁধার সঠিক উত্তরদানের মাধ্যমে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড একেবারে হ্রাস পেত অথবা মকুব হত। এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও মার্জনালাভ করতো।

আদিম সমাজে ধাঁধার ব্যবহার ছিল ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুষঙ্গে। বিবাহাচারের সঙ্গে ধাঁধার ছিল ওতপ্রোত সম্পর্ক। আমরা জানি বহুল পরিচিত গাজনোৎসবে সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর মূলক যে ছড়া

ব্যবহারের রীতি আছে, প্রকৃতিতে তা ধাঁধা ছাড়া কিছুই নয়। কোন কোন আদিম অধিবাসী বা উপজাতীয়দের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিতেও ধাঁধা ব্যবহারের চল রয়েছে।

বিবাহ ব্যতীত ধর্মীয় আচারের সঙ্গেও ধাঁধার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই কারণেই বৌদ্ধ জাতকে, বাইবেলে এমনকি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে ধাঁধার অস্তিত্ব দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও ধাঁধা ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন লভ্য। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা নাথধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাথ গীতিকায় আমরা ধাঁধার সন্ধান পাই। কোন কোন আদিম অধিবাসী প্রতিকূল অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও ধাঁধার আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

ধাঁধার উৎপত্তি বিষয়ে স্বভাবতই পণ্ডিতেরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। কারোর মতে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অথবা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ধাঁধা ব্যবহারের চল ছিল। কেউ বলেন সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদিম মানুষের মানসিক ক্রিয়া সঞ্জাত হল ধাঁধা। যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করে কিংবা তার অভিজ্ঞতার জগতে যে অনৈক্যের সন্ধান পায়, লক্ষ্য করে অসঙ্গতির, অসামঞ্জস্যের তাই প্রাচীনকালের শিশুমনের অধিকারী বয়স্কদের ধাঁধা সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। ফ্রেজারের ভাষায়—"All harmonies and fitness, all his discrepancies and inconsistencies attract the notice of the children and child like men" ধাঁধা একই সঙ্গে বিস্ময়ের আধার, সেই সঙ্গে শিশুমনের যুক্তি-বাদিতারও অভিব্যক্তি।

যেকোন বিষয় অবলম্বনেই ধাঁধা রচিত হতে পারে। মানবদেহ, পশুপক্ষী, ফলমূল, উদ্ভিদ, সৌরজগৎ কোন কিছুই ধাঁধার জগতে অলভ্য নয়। তবে লক্ষণীয় সেই উপাদান গুলিকেই ধাঁধার বিষয় হতে দেখা গেছে, যেগুলির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবে উপাদানগুলির বহিঃপ্রকৃতির ওপরেই রচয়িতাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে, এগুলির আন্তর প্রকৃতি নিয়ে রচয়িতাদের তেমন মাথা ব্যথা নেই। যেমন নাড়ী নিয়ে রচিত ধাঁধায় বলা হয়েছে—

"কাটিলে যে মরে না
না কাটিলে মরে।"

আমরা জানি নবজাতকের নাড়ীটি যথাসময়ে কেটে দেওয়া দরকার নতুবা তার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। প্রচুর রকমের মাছ আছে কিন্তু সব মাছ ধাঁধার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। সে যোগ্যতা সব মাছের নেই। কিন্তু চিংড়ি মাছ ধাঁধার বিষয় হয়েছে—

"ভিতরে মাংস বাহিরে হাড়
মাথার তলায় গু তার।"—

মাথার উকুনও ধাঁধার বিষয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে—

"কাল কাশুন্দের বনে কালো হরিণ চলে
দশ পেয়াদায় ধরে দুই পেয়াদায় মারে।"

এখানে কালো হরিণ বলতে উকুনের কথা বলা হয়েছে। হরিণ যেমন দ্রুতগামী, সহজে ধরা দেয় না, উকুনও সহজে ধরা দেয় না। কাল কাশুন্দের বনে বলতে মাথার চুলকে বোঝান হয়েছে। দশপেয়াদা বলতে হাতের দশটি আঙুলকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য উকুন কখনও একহাতে মারা যায় না। দুই পেয়াদায় মারে বলতে দুটি আঙুলের কথা বলা হয়েছে। কাঁকড়ার বিচিত্র গঠনের জন্যই ধাঁধার রাজ্যে তারও প্রবেশাধিকার ঘটেছে—

"দশশির ধরে সেই নাহিক রাবণ
নারীর হস্তেতে হয় অবশ্য মরণ।"—

আপাতভাবে দশমাথার প্রসঙ্গ যুক্ত হওয়ায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে রাবণ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কাঁকড়া রান্না করার দায়িত্ব বাড়ীর মহিলাদের, সেই জন্য মহিলাদের হাতে তার মরণের কথা বলা হয়েছে। শামুকও বিচিত্র গঠন এবং আচরণের জন্য ধাঁধার বিষয় হয়ে ওঠবার যোগ্যতা পেয়েছে—

"আমার ভাই বেটে বুটে
দোর আঁটে গুটে।"—

উনুনে যে গৃহস্থালীর কাজে খুবই প্রয়োজনীয় শুধু তাই নয়, তার গঠন প্রকৃতিটিও ভারী মজার—

"এক যে বুড়ি তিন সে মাথা।"—

এখানে উনুনের তিনটি ঝিঁককে তিনটি মাথা বলা হয়েছে। বাটি বা গেলাস ধাঁধার বিষয় হতে পারেনি। সে যোগ্যতা তাদের নেই, কেননা তাদের গঠনে না আছে বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারেও তার তেমন কোন বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু কলসী তা নয়। তাই ধাঁধার রাজ্যে কলসীর বিশেষ আধিপত্য।

"এক যে বুড়ি সকাল হলেই স্নান সারে।"

অথবা

"এক বুড়ি রোজ সকালে ওঠে আর ডোবে।"—

কড়ির চল বর্তমানে নেই। লক্ষ্মীর হাঁড়িতেই এখন তার স্থান সীমাবদ্ধ; কিন্তু গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য কড়ি বাংলা ধাঁধার বিষয় হতে পেয়েছে—

"পেটটা ফোড়া পিঠটা কুবা"—

নানাবিধ গাছ আছে ঠিকই, কিন্তু কলাগাছ তার উপযোগিতার গুণে ধাঁধায় বহুলভাবে চর্চিত হয়েছে। আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি।

"একগাছে তিন তরকারী নাম তার রাসবিহারী"—

কাঁচকলা, থোড় এবং মোচা—এই তিন তরকারী কলাগাছ থেকে লভ্য। সচরাচর এমনটি অন্য গাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। মুক্তার মত শিশির অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার, কিন্তু তার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। সূর্য কিরণে স্নাত শিশির অপূর্ব সৌন্দর্যের বিকিরণ ঘটায়। কিন্তু সহজেই তা বাষ্পীভূত হয় কিংবা সামান্য নাচাচাড়াতেই শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে গাছ গাছালির তলায়। একটি ধাঁধায় সেই শিশির বিন্দুকে বলা হল—

"একটু খানি গাছে মরিচ ঝুমঝুম করে
একটু খানি টুকাদিলে ঝুপঝুপাইয়া পড়ে।"—

দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটামুটিভাবে আমাদের পূর্ব বক্তব্যই সমর্থিত হয়েছে উদাহৃত দৃষ্টান্তগুলি থেকে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় পাঠকের ধাঁধা সম্পর্কিত একটি ধারণা স্পষ্টভাবে না হলেও অস্পষ্টভাবে গড়ে উঠেছে, এমন আশা করা অন্যায় হবে না। সচরাচর আমরা কোনো বিষয়ের আলোচনায় সর্বাগ্রে সংজ্ঞা দিয়েই শুরু করি। তারপর তার স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আমরা অগ্রসর হই। ধাঁধার আলোচনায় আমরা প্রথমেই স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্যের কিছু আভাস দিয়েছি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই, যাতে সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হওয়ার সুযোগ পায়। এইবার সংজ্ঞার প্রসঙ্গ। একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

"......Riddles are essentially metaphors and metaphors are the results of the primary mental process of association, comparison and the perception of likeness and differences."

এখানে বলা হয়েছে ধাঁধা মূলত রূপক। দুটি অসম বিষয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা ধাঁধায় করা হয়। শুধু তাই নয় তুলনা এবং ঐক্য অনৈক্যের ধ্যান ধারণাকে ধাঁধায় রূপায়িত করা হয়ে থাকে। এই সংজ্ঞায় মানবমনের মনন-শীলতাকে, তুলনামূলকভাবে অগ্রগতিকেই সূচিত করার প্রয়াস রয়েছে। একথা ঠিকই একটি বিষয়কে লক্ষ্য করে তার অনুরূপ আরেকটি বিষয়ের কল্পনা করা একই সঙ্গে রচয়িতা বা স্রষ্টার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সেই সঙ্গে তার কল্পনা শক্তিরও পরিচয়বাহী। এর ওপর উপস্থাপনা নৈপুণ্য যুক্ত হয়ে ধাঁধা ভিন্নমাত্রা লাভ করে। কারো মতে আবার—

"A Riddle is a traditional verbal expression which con-

tains one or more descriptive elements in opposition which may be literal and metaforical but contain no apparent contradiction" এই দ্বিতীয় সংজ্ঞায় ধাঁধা যে মৌখিক ঐতিহ্যের সূত্রে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে এসেছে, ধাঁধা যে লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তা স্বীকৃত। বলা হয়েছে এক বা একাধিক বর্ণনাত্মক উপাদানে তা সমৃদ্ধ হবে সেই বর্ণনায় বৈপরীত্যমূলক উপাদানকে ইচ্ছাকৃতভাবে স্থান দেওয়া হবে। কিন্তু আপাতভাবে কোন স্ববিরোধিতার সন্ধান সেখানে মিলবে না।

একটি ধাঁধায় কমপক্ষে একটি বিষয় ও সেই সম্পর্কিত একটি মন্তব্যকে উপস্থাপিত করা হয়। বর্ণনাত্মক উপাদান ধাঁধায় একাধিক থাকতে পারে। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে আপাতভাবে ধাঁধায় বিরোধিতা থাকে না। কিন্তু বর্ণনাত্মক উপাদান যেখানে একাধিক সেখানে উপাদানগুলি সুসংগত যেমন হতে পারে, অপরদিকে সেগুলিতে বিরোধিতাও উপস্থাপিত হতে পারে। যেমন 'কার চোখ আছে কিন্তু দেখেনা' (আলু)।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অন্যগুলির ক্ষেত্রে যেখানে অনুভূতি প্রকাশের তাড়না কিংবা সুনির্দিষ্ট প্রয়াস লক্ষিত হয়, সেখানে একমাত্র ধাঁধার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলনের ওপর। ধাঁধায় একটি সমস্যাকে উপস্থাপিত করা হয় এবং শ্রোতার কাছে চাওয়া হয় তার উপযুক্ত সমাধান। সমস্যাটি এমন কিছু দুরূহ নয়। কিন্তু উপস্থাপনের কারণে প্রকাশ বৈশিষ্ট্যে শ্রোতা কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সে স্মৃতি থেকে হাতড়াতে থাকে যথাযথ উত্তরটি। মনে মনে সে নিশ্চিত থাকে, যে প্রশ্নটি তাকে করা হয়েছে তার উত্তর তার জানা। অন্ততঃ তার অভিজ্ঞতার নাগালের মধ্যেই তা আছে। কিন্তু ঠিক সময়ে সঠিক উত্তরটি দেওয়ার যে নৈপুণ্য তা সবসময় হয়ে ওঠে না। ধাঁধার উত্তর যদি সঠিক হয় তবে উত্তরদাতা এক ধরনের আত্মগরিমা বোধ করেন এই ভেবে যে, প্রশ্নকর্তা তাকে অপ্রস্তুতে ফেলতে পারেনি। উল্টে সঠিক উত্তর দিয়ে তিনিই প্রশ্নকর্তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছেন। আবার বিপরীতক্রমে উত্তরদাতা যদি উত্তরদানে অপারগ হন, সেক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন, সঠিক উত্তরটি তিনি বলে দেন এবং তিনি এইভাবে এক ধরনের গৌরবত্বের অধিকারী হওয়ার আনন্দ পান। মনে রাখতে হবে ধাঁধায় যুক্তির কোন স্থান নেই। উত্তর নিয়ে বিতণ্ডার কোন অবকাশ নেই। ঐতিহ্যগত ভাবে যে ধাঁধার যে উত্তর, সেটি না বলতে পারলে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বিকল্প উত্তর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শ্রোতা যদি করেন, তবে কখনই তা গৃহীত হয় না।

"Archer Taylor ধাঁধার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন :

The true riddle or the riddle in the strict sense compares

an object to another entirely different object. Its essence consists in the surprise that the solution occasions: the hearer perceives that he has entirely misunderstood what has been said to him The true riddle may also contain an introductory and a concluding element. Both of these are ordinarily conventional, and either one or both may be lacking."

যথার্থ ধাঁধা বলতে টেলর সাহেব তাকেই বুঝেছেন যেখানে একটি বস্তুকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার মূল সত্তা উত্তরের বিস্ময়বোধকতায় বিদ্যমান ; যার উত্তর শোনার পর শ্রোতার উপলব্ধি হয় যে সে সম্পূর্ণ রূপে বিভ্রান্ত হয়েছে, যা তাকে বলা হয়েছে সে সেই অর্থ করেনি যথার্থ ধাঁধায় কখনও কখনও দুটি অংশ থাকে—একটি ভূমিকাংশ অপরটি শেষাংশ এই দুই অংশই সাধারণতঃ ঐতিহ্যানুসারী হয় অথবা দু'টিই অনুপস্থিত থাকতে পারে।

টেলর সাহেব ধাঁধার সংজ্ঞায় ধাঁধা যে মৌখিক সৃষ্টি এবং প্রজন্ম পরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে তা টি'কে থাকে, সেই অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ করেননি, টেলর সাহেব যদি object বলতে বিষয়কে বুঝিয়ে থাকেন তবে কিছু বলার নেই, কিন্তু 'বস্তু'কে বুঝিয়ে থাকলে সেখানেও প্রশ্ন উঠবে এমন অনেক বিষয়ই ধাঁধার উপজীব্য হয় যার বস্তু হবার যোগ্যতা নেই। ধাঁধার শ্রোতা যেখানে সঠিক উত্তরদানে ব্যর্থ, সেখানে প্রশ্নকর্তার মাধ্যমে উত্তরটি জানার পর তার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব যে সে ভিন্নতর বক্তব্যকে বুঝে বিভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু উত্তরদানে সক্ষম হলে ত সেক্ষেত্রে এই বিভ্রান্ত হবার প্রশ্ন ওঠে না। টেলরের বক্তব্যে কিন্তু মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শ্রোতা বিভ্রান্ত হবেই। ধাঁধার ভূমিকাংশ ও শেষাংশ সচরাচর ঐতিহ্যাশ্রিত হয় বলে টেলর বলেছেন। এখানে প্রশ্ন, তবে কি ঐতিহ্যকে বাদ দিয়েও ধাঁধা সৃষ্টি হতে পারে ?

এইবার Roger D. Abrahams ও Alan Dundes প্রদত্ত একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"Riddles are questions that are framed with the purpose of confusing or testing the wits of those who do not know the answer."

ধাঁধা হল আসলে প্রশ্ন, যেগুলি সেইসব শ্রোতাকে পরীক্ষা করা হয় যাদের ঐ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই, প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করা অথবা তার রসবোধ পরীক্ষা করা।

এই সংজ্ঞাতে সাহিত্যিক ধাঁধা ও লৌকিক ধাঁধার কোনো পার্থক্য করা

হয়নি যেমন, তেমনি লৌকিক ধাঁধা যে শ্রুতি নির্ভর এবং ঐতিহ্যাশ্রিত স্বভাবতঃই সেই বিষয়টি অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। বলা হয়েছে ধাঁধা তাদেরই করা হয় যাদের এর উত্তর জানা নেই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন, ধাঁধা জিজ্ঞাসাকারী কিভাবে জানবে কোন শ্রোতা তার ধাঁধার জবাব দিতে সক্ষম অথবা কোন শ্রোতা সক্ষম নয়। ধাঁধার উদ্দেশ্য শ্রোতার রসবোধ কিংবা বুদ্ধির পরীক্ষা যত না, তদপেক্ষা স্মৃতিশক্তির পরীক্ষাই প্রধান।

আমরা বলতে পারি, ধাঁধা হল সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মৌখিক রচনা যা প্রজন্ম পরম্পরায় ঐতিহ্যকে নির্ভর করে টিঁকে থাকে, যাতে আপাতভাবে যে বিষয়কে উপস্থাপিত করা হয়েছে বলে শ্রোতা মনে করে, প্রকৃতপক্ষে অনুরূপ কিন্তু ভিন্নতর বিষয়কে কৌশলে উপস্থাপিত করা হয় প্রশ্নাকারে, যার উদ্দেশ্য শ্রোতার বুদ্ধির পরীক্ষা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের স্বীকৃত সমাধানটি তার ইতিপূর্বে জানা কিনা তার পরীক্ষা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতার যৌথভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে যার ফলশ্রুতি কৌতুক রসাস্বাদন, তাকেই বলা হবে ধাঁধা।

স্বভাবতই প্রবাদের সঙ্গে ধাঁধার তুলনার কথা মনে আসে। প্রবাদও লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান. লৌকিক ধাঁধাও তাই। লৌকিক প্রবাদের রচয়িতার সন্ধান মেলে না লৌকিক ধাঁধার রচয়িতাও অন্তরালেই থাকেন। প্রবাদ যেমন সংহত সমাজ কর্তৃক গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় গৃহীত হলে তবেই তা সংহত সমাজের ব্যবহারোপযোগী বলে স্বীকৃত হয়, ধাঁধাও তাই। অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রেই Re-creation থিওরি প্রযোজ্য। দু'টিই প্রথমাবধি লিখিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। উভয় ক্ষেত্রেই মৌখিক ঐতিহ্যই আশ্রয়। কিন্তু এত গেল বহিরাগত দিকের প্রসঙ্গ। এইবার উভয়ের অন্তরঙ্গগত পরিচয়ের প্রসঙ্গে আসতে পারি। এক্ষেত্রে সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, প্রবাদও উচ্চারিত হয় শ্রোতাকে উদ্দেশ করে, ধাঁধাও তাই। কিন্তু প্রবাদ যিনি বলেন তিনি কোন বাচনিক প্রতিক্রিয়া আশা করেন না শ্রোতার কাছ থেকে। অপরপক্ষে ধাঁধার প্রশ্নকর্তা ধাঁধার বাচনিক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশী। ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক যে কোন একটি প্রতিক্রিয়া শ্রোতাকে ব্যক্ত করতেই হয়। প্রবাদের মত ধাঁধার শ্রোতা কখনই নীরব থাকতে পারবেন না। তার ভূমিকা কখনও নিষ্ক্রিয় হয় না। বলা যেতে পারে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার সম্মিলিত ভূমিকা গ্রহণে ধাঁধার পূর্ণতা।

প্রবাদে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় উপদেশ, ইতি—কর্তব্য, সাবধানবাণী, ভাবটা এমন শ্রোতাকে তার জানা বিষয়কেই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে শ্রোতা সচেতন হয়ে উঠতে পারেন, সে সচেতনতার পরিচয় ঘটবে তার আচরণে, ক্রিয়ায়। কিন্তু ধাঁধার ক্ষেত্রে মূলতঃ বুদ্ধি তথা স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা নেওয়ার

একটা ব্যাপার থাকে। ধাঁধায় সর্বোপরি একটা মজা আছে। উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হোন আর না হোন, উভয় ক্ষেত্রে সেই মজাটির আঁচ পাওয়া যায়। সে তুলনায় প্রবাদের বিষয় অপেক্ষাকৃত গুরুগম্ভীর, লঘুতার স্থান সেখানে বড়ই সীমিত।

প্রবাদের কোন আচারগত মূল্য নেই, কিন্তু ধাঁধার আচারগত মূল্য এখনও ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্যমান। প্রবাদ কোন ভাবেই যাদু ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু ধাঁধা অনেক ক্ষেত্রেই যাদুক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রবাদের সঙ্গে শিশুদের কোন সম্পর্ক নেই, সম্পূর্ণভাবে তা বয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ধাঁধার প্রচলন বিশেষ করে বর্তমানে শিশুদের মধ্যে; যেহেতু তারা এরমধ্যে বিনোদনের কিছু খোরাক পায়। প্রবাদের অবয়ব হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধাঁধার অবয়ব ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ করা হয়। প্রবাদে কোন অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য অথবা শব্দ থাকে না। কিন্তু ধাঁধায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বা বক্তব্যকে যুক্ত করা হয়, শ্রোতাকে বিমূঢ় করার জন্য। প্রবাদে মূলতঃ লোক চরিত্রের সমালোচনাই গুরুত্ব পায়। কিন্তু ধাঁধার প্রকৃতি কখনই সমালোচনাত্মক নয়। মানুষের অবয়ব নিয়ে ধাঁধা রচিত হয়, কিন্তু মানব প্রকৃতি কিছুতেই ধাঁধার বিষয় হয় না। যদিও ধাঁধার উত্তরদানে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় কিন্তু ধাঁধার উপাদান গুলি মূলতঃ দৃষ্টি গ্রাহ্য জগৎ থেকেই আহৃত। কিন্তু প্রবাদের উপাদানগুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য উপাদান নির্ভর হলেও তার ব্যঞ্জনা, মূল বক্তব্য প্রকৃতিতে যুক্তিগ্রাহ্য। তবে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলনামূলকতা ধাঁধা এবং প্রবাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা চলে।

প্রবাদের সঙ্গে ধাঁধার পার্থক্য সম্পর্কিত আলোচনার পর আমরা এবার ছড়ার সঙ্গে ধাঁধার মিল অমিল নিয়ে তুলনা করে নিতে পারি। ছড়া বলতে আমরা শিশুদের উপভোগ্য শিশুবিষয়ক ছড়াগুলিকেই বোঝাতে চাইছি, অবশ্যই লৌকিক ছড়া। ছড়াগুলি সবসময়ই ছন্দোবদ্ধ পদে রচিত। কিন্তু ধাঁধা পদ্যবদ্ধ অবস্থায় যেমন মেলে তেমনি গদ্য ধাঁধাও দুর্লভ নয়। ছড়া স্বল্প দৈর্ঘ্যের হয়, যেমন দুই বা চার পংক্তি বিশিষ্ট। আবার দীর্ঘাকৃতির ছড়াও দুর্লভ নয়। মূলতঃ ধাঁধা রচয়িতার ঝোঁক দুই বা চার পংক্তির মধ্যে বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখা। কিছু কিছু দীর্ঘাকৃতির ধাঁধার সন্ধানও মেলে তবে সংখ্যায় তা বেশি নয়। ছড়ার মধ্যে দুটি উপাদানের প্রাধান্য। ছন্দ নির্মিতি কৌশল এবং অসংলগ্নভাবে উপস্থাপিত চিত্রকল্প। ছড়ায় বুদ্ধি বৃত্তির কোন স্থান নেই! সম্ভব-অসম্ভবের বিচিত্র সমাবেশ সেখানে! পদ্য-ছন্দে যে ধাঁধাগুলি রচিত, সেগুলির কথা মনে রেখেও বলা যায়, মূলতঃ সেখানে বুদ্ধি বৃত্তিরই প্রাধান্য। হয়তো বা সেই সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে

স্মৃতিশক্তিরও। ধাঁধাতেও আমরা চিত্রকল্পের সন্ধান পাই। তবে, ছড়ার তুলনায় তা প্রকৃতিতে অনেক শিল্পগুণ সম্পন্ন, matured.

লৌকিক ছড়া মূলতঃ শিশুদের দ্বারা আদৃত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ধাঁধার সামাজিক উপযোগিতা থাকলেও বর্তমানে কিন্তু তা মূলতঃ শিশুবিনোদনেরই উপাদান। তবে ছড়া যে শিশুদের জন্য আবৃত্তি করা হয়, তারা ছড়ার অর্থ তেমন বোঝে না। ছড়ার মাধ্যমে সৃষ্ট ধ্বনি তরঙ্গই তাদের পুলকিত করে। শিশুদের ছড়া ব্যবহারকারিণী হল তাদের জননী বা জননী স্থানীয়ারা। কিন্তু ধাঁধা শিশুরা নিজেরাই ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিছক শ্রোতার নয়। এমনকি তেমন শিশু বয়স্ক মানুষের সঙ্গে ধাঁধা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ সেই শিশুরা তুলনামূলকভাবে ছড়ার শিশুদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ, যারা অর্থ অনুধাবনে সক্ষম, এছাড়া ছড়া এবং ধাঁধা দুইই লোকসাহিত্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ার সুবাদে প্রথমাবধি অলিখিতরূপে আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত, স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর। দু'য়ের ক্ষেত্রেই রচয়িতার সন্ধান অলভ্য এবং দুইই সংহত সমাজের সম্পদ বলেই বিবেচিত।

আমরা এইবার কয়েকটি ধাঁধার উল্লেখে এগুলিতে উপস্থাপিত কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রকাশ, চিত্রকল্প, বিজ্ঞানমনস্কতা, হাস্যরস সৃষ্টির পরিচয় গ্রহণ করবো।

চিত্রকল্প —

"হাঁটু জলে ফোটে ফুল
জল শুকাইলে ফোটে ফুল।"

'ভাত রাঁধা' নিয়ে এই ধাঁধাটি রচিত বলাইবাহুল্য। কিন্তু চালসিদ্ধ হয়ে যখন তা ভাতে রূপান্তরিত হয়, লোক কবির চক্ষে তখন তা ফুলের চিত্রকল্পরূপে দেখা দেয়। ভাতের হাঁড়িতে তো কানায় কানায় জল দেওয়া হয় না, তাই বলা হয় হাঁটু জল।

হাস্যরসাত্মক—

"হাঁসতে হাঁসতে বসল নারী পর পুরুষের কাছে।
হস্তা হস্তি কস্তা কস্তি ভিতর যাবার আগে।।
ভিতর গিয়ে শীতল হল।
যে ভাবটি মনে করেন সে ভাবটি নন।।"

শাঁখা পরা - এই বিষয়টিকে নিয়েই ধাঁধাটি রচিত। শাঁখারি যখন বিবাহিতা রমণীকে শাঁখা পরায়, তখন স্বভাবতই তাকে ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে শাঁখা পরিধানে ইচ্ছুকের হাতে শাঁখা পরানো চাই, অপরদিকে তা যেন

না ভাঙে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয় শাঁখারিকে। শাঁখা পরার চিত্রটি জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। কিন্তু হঠাৎ করে শুনলে নারী-পুরুষের সঙ্গমের কথা মনে জাগবে। বর্ণনা কৌশলটি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

"প্রথমেই একঠেলা
কোমরে কোমর দিয়ে জড়িয়ে ধরলো গলা।"—

আপাত ভাবে মনে হবে বুঝিবা নারী পুরুষের মিলন প্রসঙ্গই উপস্থাপিত। কিন্তু আসলে কলসীতে জল ভরে কাঁখে নেওয়ার চিত্রটিকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

একটু অশালীন হলেও নাকঝাড়াকে কেন্দ্র করে রচিত ধাঁধাটি হাস্যরসের উদ্রেক করে।

"ধর শালাকে মার আছাড়।"—

কিন্তু স্নিগ্ধ পরিহাস প্রিয়তার পরিচয় মেলে প্রদীপ জ্বালানোকে যখন ধাঁধায় প্রকাশ করা হয়।

"একটুকু বাবাজী গঙ্গাজলে ভাসে
পিছনে খুঁচে দিতে ফিক করে হাঁসে।"—

এই যে সলতেকে একটু নেড়ে দিতেই আলোর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ, হঠাৎ তাকে হাঁসির সঙ্গে তুলনা করার মধ্য দিয়ে অনবদ্য হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে!

বিজ্ঞান মনস্কতা:

"দীর্ঘতম তৃণ বল কি আছে ধরায়
খাঁড়াভাবে উর্ধমুখে সদাই দাঁড়ায়।"—

আমরা যদিও বাঁশকে গাছ বলে থাকি, আসলে বাঁশ ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ মাত্র। নিরক্ষর লোক কবি এখানে সেই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন, বাঁশকে 'দীর্ঘতম তৃণ' বলে অভিহিত করেছেন।

"মুখেদি খায়
মুখেদি আগে।"—

এখানে 'মুখ দিয়ে'র সংক্ষিপ্তরূপ 'মুখেদি' ব্যবহৃত হয়েছে। বাদুড় যে মুখে খায় সেই মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি এখানে অবিকৃত রাখা হয়েছে।

কাব্যিক সৌন্দর্য—

"রক্ত টলমল কাজলের ফোঁটা
এমন সুন্দরী কন্যা বনে কেন বাসা।"—

এখানে কুঁচফলকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বাস্তবিকই এই ক্ষুদ্রাকৃতির ফলটির সৌন্দর্যে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। কি অনবদ্য Colour contrast। যেন কোন নিপুণ শিল্পী খুব যত্নে এমন একটি ফল সৃষ্টি করেছেন।

"বন থেকে বেরোল টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া।"—

আনারসকে নিয়ে এই যে ধাঁধাটি রচিত হয়েছে, বস্তুত তার কাব্যিক সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে।

"লোটুম লোটুম বাটিটি
কোন কুমারে গড়েছে
তাতে মুক্ত মানিক ভরেছে।" —

ডালিমের দানাগুলিকে মুক্ত-মানিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

তৈজসপত্র সংক্রান্ত—নানা তৈজস পত্রাদির মধ্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কিছু তৈজসই ধাঁধার উপজীব্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যেমন—

ক "বড় ছোটকে গড় করে" – কসসী ও ঘটি।

খ. "কচলে এক মলে দুই
ধুয়ে ধায়ে তুলে থুই"—ঝিনুক।

গ "সকাল হলেই কুয়ায় ঝাঁপ দেয়"—বালতি।

ঘ "আঁকা বাঁকা নদীটি দুই চরণে যায়
হাজার টাকার গুলি খেয়ে আরও খেতে চায়"—যাঁতি।

ঙ. "একটা বুড়ির চারটে মাথা"—উনুন।

চ. "বাঁকা উরু মাথায় ছাই
হাত মুখ চোখ নাই।"—চিমটে।

বৃক্ষ ও উদ্ভিদ সংক্রান্ত ধাঁধা – বৃক্ষ ও উদ্ভিদ নিয়ে অসংখ্য ধাঁধা রচিত হয়েছে। লক্ষণীয় যেসব বৃক্ষ বা উদ্ভিদ ধাঁধায় স্থান পেয়েছে, সেগুলির আকৃতিগত বিশিষ্টতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ক. "আগায় ছাতি গোড়ায় জাতি
ছেলে কাঁদানে বৃহস্পতি।"—ওল।

খ. "একটা বুড়ি গোটা গা তার কাঁটা কাঁটা
তিন অক্ষরে নাম তার সর্বলোকে খায়
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে জেলে নিয়ে যায়।"—এঁচোড়।

গ. "একটুখানি ছোঁড়া
তার গা ভরে ফোঁড়া"—করলা

ঘ "আগা ঝন ঝন পাতালে বালি
এমন ফুল গেঁথেছে কোন গাঁর মালি।"—ধানগাছ

ঙ. "ভিজালে পোয়া শুকালে সের"—পাট।

গ্রহ-নক্ষত্র সংক্রান্ত—গ্রহ নক্ষত্র তথা সৌরজগতের নানা অনুষঙ্গ ধাঁধায় আত্মপ্রকাশ করেছে—

ক "সন্ধ্যাকালে জন্ম যার প্রভাতে মরণ
জিনিস খুঁজে পাবে না আর এমন।"—তারা।

খ "এই দেখলাম এই নাই
কি কইমু রাজার ঠাঁই।"—বিদ্যুৎ।

গ "ওপরে পাতা নিচে পাতা ঝনঝন করে
বৃন্দাবনে আগুন লেগেছে কে নেভাতে পারে"—রোদ।

ঘ. "মধুবন তোতাটি ফুল ফুটিছে একটি"—সূর্য

ঙ "মামা ডাকে মামা বলে, বাবাও ডাকে তাই
ছেলে বলে মামা তাকে, নহে মার ভাই।"—চন্দ্র।

চ "আশি টাকার খাসি, নব্বই টাকার বই
একপিঠ দেখা যাচ্ছে, আর একপিঠ কই"— আকাশ।

মানবদেহ কেন্দ্রিক—মানব দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধাঁধার বিষয় হয়েছে। কয়েকটি নিদর্শন মাত্র উল্লিখিত হল—

ক "পা পৃষ্ঠ মাথাটা, দুহাত কুঁড়ি, আঙুল নাকটা"—মানুষ।

খ "এক হাত গাছটি, ফুল তার পাঁচটি" —আঙুল

গ "হাতে আছে হাত বাড়িয়ে পায় না"—কনুই।

ঘ. "পাহাড়ের দুধারে দু ভাই, দেখাদেখি নাই"—কান।

ঙ "যমুনার জল টলমল করে এটুক কুটা পাইলে সর্বনাশ করে"—চোখ।

চ. "এতটুকু কানি শুকাতে না জানি"—জিভ!

ছ. "একটু গর্তে বত্রিশ ছেলে হাঁসে"—দাঁত।

পশুপক্ষী সম্পর্কিত—ধাঁধার বিশাল সাম্রাজ্যে বিশালাকৃতি পশু থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গও স্থান পেয়েছে। যেমন—গরু নিয়ে অনেকগুলি ধাঁধা রচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হল

ক. "চার ভাই চাপুর চুপুর
চার ভাই তার দুধের গোপাল,
দু ভাই তার শুকনো কাঠ
এক ভাই তার পাগল নাট"—

খ. 'ইঁদুর' নিয়ে রচিত ধাঁধাটি হল—

"ওপরে মাটি নিচে মাটি
চলেছে যেন বাবুর বেটাটি"

গ 'ছাগল' নিয়ে রচিত ধাঁধায় বলা হয়েছে—

"বিনা ঝড়ে খেঁজুর পড়ে"

এখানে ছাগলের নাদিকেই খেঁজুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ঘ 'বেঁজি' ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও ধাঁধা-রচয়িতার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি।

"আকাশ গুড়গুড়ি যায় বুড়ি
ফিরে ফিরে চায়।"

ঙ. বিশালাকৃতির 'হাতি'ও ধাঁধার রাজ্যে দিব্যি প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

"থপ থপ থপিয়ে যায়
লক্ষ্মী প্রদীপ জেবলে যায়,
জোড় কুলো পাছুরে যায়
জোড় শঙ্খ বাজিয়ে যায়
ঢোঁড় সাপ খেলিয়ে যায়"

ঢোঁড়া সাপ বলতে হাতির শুঁড়কে বোঝান হয়েছে। এবারে আমরা দুই একটি পাখিকে কেন্দ্র করে রচিত ধাঁধার পরিচয় নেব।

ক. "পুরুষের মর্ম জানি না
ছেলের মর্ম জানি"-- ময়ূর

খ. "সাদা পোষাক পরে
এল পুকুর ধারে
আহার জোগাড় করে
চলে গেল ঘরে"—বক

গ অতি পরিচিত বকের ডাকও ধাঁধায় স্থান পেয়েছে—

"দু অক্ষরের নাম পাখি পৃথিবীতে থাকে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে সেই নামে ডাকে"—

Challenging riddle এর বাংলা কেউ কেউ করেছেন আক্রমণাত্মক ধাঁধা, কারো মতে আবার সম্ভাষিত ধাঁধা, আবার কেউ কেউ বলেছেন পারিতোষিকের আশ্বাসমূলক, আমরা কিন্তু একটি প্রতিশব্দে একে প্রকাশ করার পক্ষে নই। মূলতঃ Challenging riddle-এ দুই ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত হতে দেখা যায় আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি প্ররোচনা সৃষ্টিকারী এবং উৎসাহ-মূলক। যখন বলা হয় বিশেষ একটি ধাঁধার সমাধান করতে না পারলে শ্রোতা গাধা জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে কিংবা সে ত বটেই এমনকি তার পিতা

শুধু কানা বলে পরিগণিত হবে, তখন এখানে স্পষ্টতঃই একটা প্ররোচনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। 'বিপরীতক্রমে যখন সঠিক উত্তরদাতাকে হাজার টাকা, কিংবা সোনার মোহর ইত্যাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয় তখন সেখানে স্পষ্টতই শ্রোতাকে উৎসাহিত করার মানসিকতাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আসলে এই পর্যায়ের ধাঁধায় প্রশ্নকারীর এক ধরনের উন্নাসিকতাই বড় হয়ে দেখা দেয়—উন্নাসিকতার কারণ - সে এমন প্রশ্ন জানে, যার রহস্য ভেদ অন্য কারো পক্ষে সহজসাধ্য নয়। অবশ্য এসবই আপাতভাবে পরিদৃশ্যমান, প্রকৃত সত্য নয়, সত্য যা তা হল বক্তার শ্রোতার অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়াস। কেননা শ্রোতাও যেমন জানে সে উত্তর দিতে সক্ষম হলেও প্রশ্নকারী তার প্রতিশ্রুতিমত পুরস্কারদানে অগ্রসর হবে না, আবার উত্তরদানে অক্ষম হলেও প্রশ্নকারীর বক্তব্যমত বক্তার হীনতা বা সীমাবদ্ধতা প্রতিপন্ন হবে না।

১ কান্দির উপর কান্দি,
এই শিলোক যে না ভাঙ্গায়,
তার মা আমার বান্দী। কলার ছড়ি

২. কলা গাছে বল্লার চাক, শিমুল গাছে তোত:
এই শিলোক যে না ভাঙ্গাইতে পারে,
তার মুখে মারি গুঁতা। কলার থোড়

৩. লাল লাঠি তিলের ফোঁটা
এই শিলোক যে ভাঙ্গায় সে বাপের বেটা। কুঁচ

৪ গাঙ্গের মধ্যে মাদার গাছটি ঘন ঘন কাঁটা
যে ভাঙ্গানি না কইতে পারে বুদ্ধিটা তার মোটা। কুমীর

৫. উড়ে ডুগড়ুগ না মেলে পাতা।
এই শিলোক ভাঙ্গি দিতে পারলে শাহ সায়েবের বেটা। গরুর শিং

৬ এক বৈরাগীর এগার ছেলে :
চার ছেলে তার কাতুর কুতুর,
চার ছেলে তার ঘৃত মধুর,
দুই ছেলে তার সেগুন কাঠ
এক ছেলে তার পাগল নাট।
এই শ্লোক যে না ভাঙ্গতে পারে, সে যে গাধার জাত। গরু

৭. আগ কুমকুম গুঁড়ি আঁটা,
এইটা যে না ভাঙ্গায় তার বাপ চোট্টা। ঝাঁটা

৮. আগা তুড়ি বুড়ি গুড়ি মুইট্যা
এই শিলুক ভাঙ্গাইতে লাগে পাহাড়ে উইঠ্যা।

পাহাড়ের রাজা পেগাম্বর,
এই শিল্লুক যে ভাঙ্গায়, তারে দিব সোনার মোহর। ঝাঁটা

৯. লাঠির উপর কুঠি কুঠির ভেতর দানা।
যে না কইতে পারে তার বাপ শুদ্ধ কানা। পদ্মবীজ

১০. গলা কাটলে ধলা রক্ত, ফল মনোহারী।
এই কথা যে কইতে পারবে তার বুদ্ধি বলিহারী। পেঁপে

১১ আশমানোত ঘর, পাতলোত দুয়ার,
তার বেটার নাম শ্রীমন্ত কুমার।
তার নাম হইল উই
এই শোলক ভাঙ্গে দিতে লাগবে বছর দুই। বাবুই পাখির বাসা

১২. আন্টোতে কান্টো, ষোলতে জোড়া,
যে ভাঙ্গানী না কইতে পারে,
সে মদন ঠাকুরের ঘোড়া। মই

১৩. ময়ূরের পাখ, হাতির দাঁত।
এ শিলোক না ভাঙ্গাইতে পারলে গাধার জাত। মূলা

১৪ ভাঙ্গায় কালাও দেখি,
মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা ; পক্ষীর নাই ডিম
এই শ্লোক যে ভাঙ্গাইতে পারে, হাজার টাকা দিম।

কাঁকড়া, ও বাদুড়

১৫. হাড়ের হড়হড়ি
চামড়ার পাকানে দড়ি
মস্তকের খাবে খানা,
যে না কহিতে পারে তার বাপ শুদ্ধ কানা।

পাটকাঠি, পাটের শাক ও পাটগাছ।

কয়েকটি বাংলা ধাঁধার অনুরূপ বিদেশীয় ধাঁধার উল্লেখে দেখা যাবে বিষয় নির্বাচনে এবং সেগুলির প্রকাশে উভয়ের মধ্যে কতই না সাদৃশ্য।

ক বন থেকে বেরুল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।—আনারস
The Parrot Came out of the wood,
With golden helmet on its head.—Pineapple

[ইন্দোনেশিয়া]

খ. সকাল বেলা চার পায়ে হাঁটে
দুপুর বেলায় দুই পায়ে হাঁটে

বিকাল বেলায় তিন পায়ে হেঁটে
দেশে চলে বাবাজী।—মানুষ
Four feet it has in the morning,
Yet first movement is a lacking
With about mid-day
He can manage much better
Though he gets at night fall three,
He moves but soft and slow—Man [গ্রীসদেশ]

গ এতটুকু কানি, শুকাতে না জানি। জিভ
Long legs, short thighs, little head and no eyes.
[English]

ঘ দেখিতে সুন্দর ভালো।
কেবল বদন কালো।
রাজা প্রজা সবে দেয় কর---
কর পেয়ে অতিশয়
করেতে প্রবল হয়।
পঞ্চমুখ নহে সে শংকর ।।—পয়োধর
Golden cup with leg ; King's son drinks from it.
[Irish]

ঙ গাছটা চলে গেল পাতাটা পড়ি রইল।—পদচিহ্ন
Strongest thin at the fair. [English]

চ টুটুর তলে মুটুর মুটুর তার তলে কেউ—মাথা
What is it that I am able to see that you are not able to see. [Irish]

ছ সরোবরে দেখি মনোহর গাছ
একটি পাতা তার বত্রিশটি দাঁত
শুকায় না সাত দিন সাত রাত—মুখ গহ্বর
Red sheep in a garden full of white sheep. [English]

এইবার আমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আমাদের ধাঁধাগুলির মূলতঃ গঠনগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় গ্রহণ করব। ধাঁধার স্রষ্টারা নিছক কোন এক প্রশ্ন যেমন তেমন করে উপস্থাপন করেন নি, এক্ষেত্রেও তাঁরা অনবদ্য শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন, হয়ত বা অবচেতন ভাবেই।

ক ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ ঃ

১ ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নই,
গলায় পৈতে বাউন নই। (চরকা)

২. একটুখানি ছোঁড়া
তার পেট গুড়গুড় করে,
তার মাথায় আগুন জ্বলে। (জোঁক)

৩. ধপা ধপ লাথি খাই কুমড়োর মত.
বেশি করে খাই লাথি পায়ে পড়ি যত,
ছুটোছুটি করে শেষে হারাইলে গোলে
আবার তখন মোরে হাত ধরে তোলে। (ফুটবল খেলা)

৪ এ ঘর থেকে ও ঘর যায়
ধুপুস করে আছাড় খায়। (ঝাঁটা)

৫. বড় বড় কিসে সাঁ সাঁ উড়ে,
জীব নয় জন্তু নয় মানুষ গিলে। (জামা)

৬. থপ থপ থপিয়ে যায়
লক্ষ্মী প্রদীপ জেবলে যায়
জোড় কুলো পাছুরে যায়
জোড় শঙ্খ সাজিয়ে যায়
ঢোঁড় সাপ খেলিয়ে যায়। (হাতী)

৭. একটুখানি গাছ, মরিচ ঝুমঝুম করে,
একটুখানি টোকা দিলে ঝুপঝুপাইয়া পড়ে। (শিশির)

ভোঁ ভোঁ, গুড়গুড়, ধপাধপ, ধুপুস, সাঁ সাঁ, থপথপ, ঝুমঝুম—এসবই ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলীর নিদর্শন। বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া এইসব শব্দের প্রয়োগে জীবন্ত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। ক্রিয়ার বাঙ্ময় রূপ সৃষ্টিতে লোককবিরা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

খ. পুনরাবৃত্তি ঃ

১. এ পাড়ায় বুড়ি মরল
ও পাড়ায় গন্ধ গেল। (কাঁঠাল)

এখানে দু'বার 'পাড়ায়' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

২. উপরে মাটি, নীচে মাটি
মদ্যিখানে দাম্বার বাটি। (ওল)

'মাটি' শব্দটির দুবার ব্যবহার লক্ষণীয়

৩. কোটার মধ্যে কোটা তার মধ্যে কোটা,

তার মধ্যে বসে আছে বুড়ো এক বেটা। (কলার মোচা ও থোড়)

'মধ্যে' পদটি তিনবার এবং 'কোটা' পদটিও তিন বার প্রযুক্ত হয়েছে।

৪ হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়

হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। (জল, পদ্ম পাতা ও ব্যাঙ এবং সাপ)

'হরি' শব্দটি ছ'বার ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিশেষ ব্যঞ্জনা মণ্ডিত বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

৫ প্রথমেই এক ঠেলা,

কোমরে কোমর দিয়ে জড়িয়ে ধরলো গলা।

(কলসীতে জল ভরে কাঁখে নেওয়া)

'কোমর' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত।

৬ একটা হাঁসের বারটা ডিম

চারটে গরম চারটে নরম

চারটে কালা হিম। (বছর)

'চারটে' পদটি তিনবার প্রযুক্ত হয়েছে!

৭. এক বুড়ী ডুবুরী, ডুবে ডুবে বাঁধ দেয়। (সূঁচ)

'ডুবে' পদটির দু'বার ব্যবহার ঘটেছে।

পুনরাবৃত্তিমূলকতা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কখনও শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করতে, কখনও বা বিশেষ চিত্রকল্প রচনার তাগিদে, আবার কখনও বিশেষ কোন বক্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করতে এর ব্যবহার ঘটেছে ধাঁধায়।

৮. লিক লিক গাছ চিকি চিকি পাতা

মালেক ডাণ্ডা সাড়ে ষোল হাত,

খেতে মধু ফেলতে কাপাস। (আখ)

লিক লিক এবং চিকি চিকি—দু'বার করে ব্যবহারের নিদর্শন।

৯ ফল ফল ফল ফলের ভিতরে অনেক জল। (নারিকেল)

'ফল', পদটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে।

গ. **বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ :**

১. আকাশে আছে, পাতালে নাই,

কি জানিস তা বল দেখি ভাই। তাস

আকাশে—পাতালে—বিপরীতার্থক শব্দ।

২. রাতে গরু বাথান লাগে, দিনে গরু নাই,

কোন্ শহরে গেল গরু মাঠে গোবর নাই! তারা

রাতে –দিনে—বিপরীতার্থক।

৩ কাঁচাতে তুলতুল, পাকাতে ভোমরুল। বেগুন
কাঁচাতে—পাকাতে—বিপরীতার্থক।

৪. কাটলে বাঁচে, না কাটলে মরে
এমন সুন্দর ফল কোন্ গাছেতে ধরে। সন্তানের নাড়ী
কাটলে—না কাটলে বিপরীতার্থক ; বাঁচে—মরেও বিপরীতার্থক।

৫ সকালে ডুব দেয়, সন্ধ্যায় উঠে। চন্দ্র
সকালে - সন্ধ্যায় বিপরীতার্থক।

৬. কাঁচায় তুলতুলে পাকায় সিন্দুর
যে পারে না বলতে সে ধাড়ী ইন্দুর। মাটির হাঁড়ী
কাঁচায়-পাকায় বিপরীতার্থক।

৭ পিট, কালো, বুক ধলো সমুন্দুরের আল,
মা মরেছে ছ'মাস আমি হইছি কাল। কচ্ছপ
কালো—ধলো—বিপরীতার্থক।

এখানে লক্ষণীয় বিপরীতার্থক শব্দগুলির ব্যবহারগত বিশিষ্টতা—কখনও বিপরীতার্থক শব্দগুলি পাশাপাশি বসেছে, আবার কখনও কিছুটা ব্যবধানে প্রযুক্ত হয়েছে।

ঘ. অনুকার শব্দের প্রয়োগ :

১ জলে জন্ম লগনে কর্ম কারিগরে করে,
ঠাকুর নয়, ঠুকুর নয়, মাথার উপর চড়ে। শোলার মুকুট
ঠাকুরের অনুসরণে 'ঠুকুর' শব্দের ব্যবহার ঘটেছে।

২ সুরসুরে পাখীটি গুরপুরে যায়
হাড় গোড় নাই গো তার মানুষেতে খায়। ফুটবল খেলা
হাড়ের অনুসরণে 'গোড়' শব্দটি এসেছে।

৩ কাঠ খায় কোঠরে হাগে
ফেলতে গেলে গায়ে লাগে। উনুনের ছাই
'কাঠের' অনুসরণে 'কোঠরে' কল্পিত হয়েছে।

৪. চার পায়ে বসি আট পায়ে চলি
রাক্ষস খোক্ষস নয় আস্ত মানুষ গিলি। পাল্কী
রাক্ষসের অনুকার শব্দ 'খোক্ষস'

৫ কাঁপ কাটা মধ্যে কাঠা
নাড়লে চাড়লে পড়ে আঠা। কলস
'নাড়লে'র অনুসরণে 'চাড়লে' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

৬ বইরেগী না টইরেগী মালা ঝুনঝুন সার
সউগ জিনিসের পুক্‌টি তল পাকে
পাঞ্জরাত্‌ পুক্‌টি কার ? তেলের ঘানি
এখানে 'বইরেগী'র অনুসরণে 'টইরেগী' শব্দটি কল্পিত হয়েছে।

৭. উঁকি দিয়ে ফুকি চায়,
গহিন গভীরে যায়। ইঁদুর
—উঁকির অনুসরণে 'ফুকি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৮ আটখানা হাড় গোড় এক ঝুড়ি ভুঁটি,
এ শ্লোক যে বলতে না পারে তারে খালুই বিলে পুঁতি। খাট
হাড়ের অনুসরণে 'গোড়' শব্দটি পরিকল্পিত হয়েছে।

৯. এটে রুনু গাচ-গাচালি ওটে রুনু গাচ-গাচালি ভাঙ্গা গেইল ডাল।
চুমা পাখী ছাড়ি দিচো আসবে কতকাল। ধোঁয়া
গাচের অনুসরণে 'গাচালি' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

১০. ধান নাড় চাড় হে নারী ধানে দিয়া মন,
তোমার মানুষ হাটে যায় সওদার কথা কও।
আকাশের ভনভন, পাতালের ফনফন,
বাঁচে যদি কড়ি, হস্তির দন্ত চুন ধইর‍্যা
আইনো হালি চারি। কলা, মানকচু ও মুলা
'চাড় শব্দটি 'নাড়'র অনুসরণে সৃষ্ট

১১ একটুখানি আড়া,
তার মধ্যে সোনা দানা ভরা। ডালিম
এখানে 'দানা' অনুকার শব্দ —

সচরাচর মূল শব্দের পরেই অনুকার শব্দ প্রযুক্ত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন ধাঁধায় দেখা যায় মূল শব্দ ও অনুকার শব্দদ্বয় স্থান পরিবর্তিত করেছে। যেমন—

. ইল্লি গেলাম দিল্লী গেলাম গেলাম কলকাতা
ইস্টিশনে দেখে এলাম তিন কোনাচে পাতা। পরোটা
এখানে মূল শব্দটি 'দিল্লী' পরে বসেছে, 'হিল্লী' দিল্লীর অনুসরণে সৃষ্ট হলেও প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. **সমাস :**

১ পরতে গেলেই কাঁদাকাঁদি
ভেতরে গেলেই হাঁসি। চুড়ি পরান
কাঁদাকাঁদি = ব্যতিহার বহুব্রীহি

২. ঘরের ভিতর ঘর তার ভিতরের ঘর,
মা বিটি কইন্যা বাপ বেটা স্বয়ম্বর। পায়রা
স্বয়ম্বর = যে স্বয়ং বরণ করে ; উপপদ তৎ

৩ হাঁড়ি বাউঁড়িদের রাঁধা বামুন বোষ্টমে যায়,
তাদের জাত কেন নাই যায় ? গুড়
হাঁড়ি-বাউঁড়ি = দ্বন্দ্ব ; বামুন-বোষ্টম = দ্বন্দ্ব

৪. চোখে চোখে রাখে মোরে পুরুষ রমণী
সকলের শেষে মোর আছেন জননী। চশমা
পুরুষ-রমণী = দ্বন্দ্ব।

৫. হাত পা সকলি আছে, নাহি লেজ মুড়া,
সকলেরে কোলে করে কিবা ছেলে-বুড়া। চেয়ার
হাত-পা = দ্বন্দ্ব, লেজ ও মুড়া = দ্বন্দ্ব, ছেলে ও বুড়া = দ্বন্দ্ব

৬. দশ ভুজা পতি যার দুভুজা রমণী
তাহার পিতার পুত্র অপুত্রক গণি। পঞ্চ পাণ্ডব
দশ ভুজ যাহার = দশ ভুজা, বহুব্রীহি, স্ত্রীলিঙ্গে : নাই পুত্র যাহার =
অপুত্রক = নঞর্থক বহুব্রীহি।

৭. দশ মুণ্ড নব দাড়ি
ষোল ঠ্যাঙে বাড়াইয়া বাড়ি,
কালিদাস পণ্ডিতে কয়
আগে চার ঠ্যাং উপরে রয়। পান সাজা ও খাওয়া
দশ মুণ্ড = দশ মুণ্ডের সমাহার = দ্বিগু ; ষোল ঠ্যাং—ষোল ঠ্যাং-এর
সমাহার = দ্বিগু ; কালিদাস = কালীর দাস, ষষ্ঠী তৎ।

৮. কৃষ্ণবর্ণ তনুখানি গুটি ছয় পা
চুপ করে মানুষ খায় নাই করে রা। উকুন
কৃষ্ণ যে বর্ণ = কৃষ্ণবর্ণ = কর্মধারায়

৯. ঘরের মধ্যে ঘর নাচে কন্যা বর। মশারী
কন্যাবর = দ্বন্দ্ব

১০. একখানা কুঞ্চিত আঁকাবাঁকা
ফুল ফুটেছে বাঁকা বাঁকা
কোন কুমারে গড়েছে,
সোনা দিয়ে জুড়েছে। দুর্গা প্রতিমা
আঁকা ও বাঁকা = দ্বন্দ্ব।

চ. অধিকরণ কারকে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ ঃ

১ পানিত্ জন্ম পানিত্ বাস
পানিত্ গেলে সর্বনাশ। লবণ
পানিত্—এখানে 'ত্' বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে।

২. উপরের বাড়ীত্ আগুন লাগছে
উঠান ঠনঠন বাড়িত্ নাই,
খাই বস্তুর সকল নাই (লবণ)
বাড়িত্ = 'ত্' বিভক্তি।

৩ দশ মর্দে দাবরে নিয়া যায় দুই মর্দে ধরে.
তালাপুরেত বিচার হয় লক্ষ্মীপুরে মারে। উকুন
তালাপুরেত = 'ত' বিভক্তি প্রযুক্ত।

৪. লাঠির উপর কাঠি তারি ভিতরত দানা
এই কিচ্ছা ভাংগে না দিতে পারলে জড় গুষ্টি হবে কানা।
—পদ্মগাছের বীজ

ভিতরত = অধিকরণে 'ত'।

অধিকরণে শূন্য ঃ

১. এক না বুড়ি হাট যায়
আমাকে দেখে দুয়ার দেয়। শামুক
এখানে 'হাট' শূন্য বিভক্তি যুক্ত

২. চল পাঁচু হাড়দা যাব.
হাড়দায় যায়ে তব্দায় যাব। ফুটবল খেলা
'হাড়দা' শূন্য বিভক্তি যুক্ত।

ছ সহচর বা অনুগামীশব্দ ঃ

অনুকার শব্দ এবং অনুগামী শব্দের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ শব্দ ব্যবহারের পর তবেই অনুকার কিংবা অনুগামী বা সহচর শব্দের প্রয়োগ ঘটে। মূল শব্দের অর্থ দ্যোতনায় অনুকার বা সহচর শব্দ অর্থবহ হয়ে ওঠে। সূক্ষ্মভাবে দেখলে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্যের সন্ধান অবশ্য মেলে। তা হলো অনুকার শব্দের নিজস্ব কোনো অর্থই নেই। একান্তভাবে তা বিশেষ শব্দের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সহচর বা অনুগামী শব্দের নিজস্ব অর্থ আছে। অর্থাৎ বিশেষ শব্দের অনুষঙ্গে তার ব্যবহার না হলেও নিজস্ব অর্থেই তা অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

১ জীব নয় জন্তু নয় থাকে অনেক ঘরে
কান মুলে দিলে পরে গান বাজনা করে। রেডিও

এখানে গান বাজনা দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, বাজনা সহচর শব্দ, গানের

অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু গান শব্দের ব্যবহার ব্যতিরেকেও 'বাজনা' শব্দটির নিজস্ব একটা অর্থ আছে।

২. মা পেটে ঝি হাটে। পেঁয়াজকলি

এখানে 'মা'র অনুষঙ্গে 'ঝি' শব্দের ব্যবহার হওয়ায় এ'টি সহচর শব্দ বা অনুগামী শব্দের মর্যাদা পেয়েছে। লক্ষণীয়, 'ঝি' শব্দটির অর্থ মেয়ে।

৩. ঢাক ঢোল ভিতরে খোল
বহে নদী বহে জল। নাক
এখানে 'ঢোল' সহচর শব্দ, ঢাকের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪ কাটিলে বড় হয় ছোট হয় না কখনো
ভেবে চিন্তে এই কথা বল দেখি এখন। পুকুর কাটা

'ভেবে' এই মূল শব্দের অনুষঙ্গে 'চিন্তে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সহচর শব্দ হয়ে উঠেছে।

৫. হাড় নাই তার মাংস আছে
কানা কর্তা জলে ভাসে। জোঁক
'মাংস' সহচর শব্দ, 'হাড়ে'র অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. চন্দ্র সূর্য দুই ভাই এক মুখে খায়
পেটে গেলে গড়গড়িয়ে যায়। জাঁতা

'সূর্য' সহচর শব্দ রূপে এসেছে। তবে সাধারণত 'চন্দ্র' কেই সহচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৭ চামড়ার দেহ তার হাড মাষ নাই
এদেশ ওদেশ ঘোরে তারা দুটিভাই
প্রধানতঃ পায় পায় লোকের পায় চড়ে
রাগিলে উঠিয়া হাতে পিঠে গিয়ে পড়ে। জুতো

এখানে দুটি জোড় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হাড় মাষ এবং এদেশ-ওদেশ, মাষ এবং ওদেশ যথাক্রমে অনুগামী শব্দ।

৮ হাড়ি বাউঁড়িদের রাঁধা বামন বোষ্টমে খায়
তাদের জাত কেনে নাহি যায়। গুড়

হাড়ির সহচর রূপে বাউঁড়ি, অপরপক্ষে বামুনের সহচর রূপে বোষ্টম শব্দের আগমন ঘটেছে।

৯ জল নাই খালে বিলে
জল আছে গাছের ডালে। নারকেল
'বিলে' শব্দটি অনুগামী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০ এ আসলো বাপ-বেটা ও আসলো বাপ-বেটা
তিনটি নারকেল প্রায় গোটা গোটা। পিতামহ, পিতা, পুত্র
বাপের সহচর রূপে 'বেটা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। লক্ষণীয় বাপ
বেটা এই জোড় শব্দের দু'বার ব্যবহার ঘটেছে।

জ. নৈতিকরণ :

১ উড়ে উড়ে পেখম ধরে ময়ূর সে নয়
গুন গুন কইর‍্যা গান করে গায়কও সে নয়,
গরু খায় মানুষ খায় ভল্লুকও সে নয়,
বসে বসে ইংরাশন করে ডাক্তারও সে নয়। মশা

২. পাখী নয় গাছে রয় অঙ্গ তার চারু
গায়ে কাঁটা আগাগোড়া নয় সে সজারু।
বাদুড় নহেক তারা ফুলে ফুলে ঝুলে
সৌরভ গৌরব ফলে নাহি কিছু ফুলে। কাঁঠাল

৩. ভূত নয় প্রেত নয় ধীরে ধীরে চলে
কাষ্ঠ নয় তেল নয় রাতদিন জ্বলে।
মোষ নয় গণ্ডার নয় লম্বা দুটি শিং
প্যাখি নয় পক্ষী নয় ভুইতি পাড়ে ডিম। ঝড়, বৃষ্টি, শিল ও বজ্র

৪. ঠাসন দিলি সয় না
আছাড় দিলি ভাঙ্গে না। ভাত

৫. মূলো চাক চাক মূলো চাক চাক, মূলোও তো না
সাদা ধব ধব সাদা ধব ধব, তুলাও তো নয়
সধবায় পরে, তাহা শাড়িও তো না। শাঁখা

৬. ইন্দ্র নয় তবু তার সহস্র নয়ন,
লোহা নয়, তামা নয়, তামাটে বরণ।
মোরগ নয়, ময়ূর নয়, শিরে মোহন চূড়া
তারে পেয়ে খুশি হয় ছেলে মেয়ে বুড়া। আনারস

৭. নাক আছে হাঁচে না,
চুল আছে বান্দে না
মারলে কান্দে না। নারকেল

৮. পাখা আছে পাখী নয়,
গান করে বৈরাগী নয়। মশা

৯. ডাল নেই পালা নেই, আছে শুধু পাতা
নাক নেই মুখ নেই কয় তবু কথা। বই

১০. বাঘ নয় ভালুক নয় মানুষের রক্ত খায়,
কোটাল নয়, চৌকিদার নয়, রাতে হাঁক দেয়। মশা

১১. ভোঁ ভোঁ করে ভোমরা নই
গলায় পইতে বাউন নই। চরকা

ঝ. **অপিনিহিতি :**

১. এক বেডার নাম সাউদ,
তার সারা গতরে দাউদ। আনারস
সাধু > সাউদ

২. মানুষ শিন্নি রান্ধে
আমারে দেইখ্যা দোয়ার বান্দে। শামুক
দেখিয়া > দেইখ্যা

৩. উপরের বাড়িত্ আগুন লাগছে
মধ্যের বাড়ি থাইম্যা রইছে
নীচের বাড়ি ডাক মারছে। হুঁকা
থামিয়া > থাইম্যা।

৪. লাল নীল দুই বর্ণ,
চাইর চউখ চাইর কর্ণ
বাঁশ কাটি মীর্জাপুর,
ছয় ঠ্যাং দুই লেজুর। এক শিয়াল ও এক মোরগ
চারি > চাইর।

৫. অন্ধ বেডা ধন্ধ লাইগ্যা রইছে, বৈরাগী রইছে চাইয়া
গাছের ফল গাছে রইছে, কষ পড়ে বাইয়া। কলার ছড়ি
লাগিয়া > লাইগ্যা

৬. ঝাঁকড়া চুলের মাথা কোদলা কোদলা গা
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা, গিলে গিলে খা। খেঁজুর গাছ
বান্ধিয়া > বাইন্ধ্যা।

৭. এইখান থাইক্যা মারলাম ছুরি
ছুরি গেল পাতালপুরী। কেঁচো
থাকিয়া > থাইক্যা।

৮ ধইরতে চিড়া খাইতে মিডা। দুধ
ধরিতে > ধইরর্তে

৯ রাজার রাইজ্য নাই বাইন্যার দোহান নাই
আ এইগ্যা কইল্যোন কি ? স্বামীর চাইলে দেয়্যাম কি। শিল
বানিয়া > বাইন্যা : রাজ্য > রাইজ্য

১০. উরত্তুন পইল থাল, থালে মাইরল তিনফাল। বৃষ্টির ফোঁটা
মারিল > মাইরল।

এও স্বরভক্তি :

১ আসলে জনম তার কর্মকারের ঘরে,
বিনা মাইনেতে করম করে দুয়ারে দুয়ারে। তালার চাবি
কর্ম > করম ; জন্ম > জনম

২ নীল বর্ণ কপিত্থ বরণ,
চার চক্ষু চৌদ্দ চরণ,
এক লেটু দুই কান
বুঝিয়ে দাও পণ্ডিত জন। কাঁকড়া ও শিয়াল
বর্ণ > বরণ

৩ জনম গেল দুঃখে
বুকে আমার আগুন দিয়ে খায় মনের সুখে। হুঁকা
জন্ম > জনম

৪. শোলক শোলক মহাশোলক
গর্তের মধ্যে মা। জুতো
শ্লোক > শোলক

৫. আগড়ুম্ বাগড়ুম্ কথার মাঝে বারতা
আক্‌লে পছন্দে কও আছাড়ে ভাঙ্গেনা কিতা। ভাত
বার্তা > বারতা

৬. জলে জন্ম ডাঙ্গায় কর্ম
মিস্তিরি গড়ে, মস্তকে চড়ে। টোপর
মিস্ত্রী > মিস্তিরি

৭.   সন্ধ্যাকালে জন্ম তার প্রভাতে মরণ
মস্তক উপরে সদা করে বিচরণ
স্বর্ণকার মনোহর দেহের বরণ
এক পথে করে গতি সেই কোন জন।   —তারা
বর্ণ > বরণ

আমরা বুঝতে পারি ধাঁধার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো, ছন্দোবদ্ধতা, বক্তব্যের কাব্যিক প্রকাশ, যদিও কিছু কিছু গদ্য ছন্দের ধাঁধাও আছে। আর তাই ছন্দের তাগিদে রচয়িতারা স্বরভক্তির আশ্রয় নিয়েছেন।

ট   প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধা :

প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধায় স্বভাবতই এক ধরনের নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, দুটি চরিত্রের সংলাপে এই শ্রেণীর ধাঁধা সমৃদ্ধ। প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতাব উক্তি প্রত্যুক্তিতে এই পর্যায়ের ধাঁধার অবয়বও অন্যান্য ধাঁধা থেকে দীর্ঘতর হয়েছে।

১.   আগ দিয়ে ফিরে চায় ওটি তোমার কে
ওর বাপে আমার বাপে শ্বশুর-জামাই যে।
তোরা বুঝে দেখে নে।   মা ও ছেলে

প্রথম পংক্তির প্রশ্নটির উত্তর, দ্বিতীয় পংক্তিতে মা'র জবানীতে প্রদত্ত হয়েছে। 'ওর বাপে' বলায় বোঝা যায় মা তার ছেলেকেই ইঙ্গিত করেছে।

২   আগে যায়, পিছে চায় ওটি তোমার কে ?
কিবা যাই কয়ে বেলা যায় বয়ে,
ওর বাপ বিয়ে করেছে মোর বাপের মেয়ে
ঘুইর‍্যা আইসো বাঁক দুই
খুঁইজ্যা দেখো অর্থ দুই।   ভাগনে ও মামা

প্রথম পংক্তিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, বোঝা যায় এ প্রশ্ন ভাগ্নেকে উদ্দেশ করে করা, দ্বিতীয়াংশে উত্তর প্রদত্ত হয়েছে মামা কর্তৃক অত্যন্ত কৌশলে। নিজের ভগ্নীকে মামা পরিচয় দিয়েছেন তার পিতার কন্যা বলে। এমনিতেই ধাঁধা হল Round about way of speaking, ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত, তদুপরি প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধায় এই জটিলতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ানো হয়েছে উত্তরদাতাকে বিমূঢ় করার সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ে। একটি তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা প্রশ্নোত্তরমূলক সাহিত্যিক ধাঁধার উল্লেখ-যোগ্য পরিচয় পাই।

৩. তুই খলসে মুই খলসে এক বিলের মাছ,
এক সঙ্গে মরিস যদি কাঁকাল ধরে নাচ।
তোর মরণে আমার মরণ এক সাথে মরি,
দু'জনার মরণ হলো বল হরি হরি। মরিচ ও রসুন

এখানে মরিচ ও রসুনের উক্তি প্রত্যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে, কোনো প্রশ্নের পরিবর্তে প্রস্তাব প্রদত্ত হয়েছে।

৪. শাক তুলুনী শাক তুলুনী,
শাক খাওয়াবে কাকে,
তোর বাপ বিয়ে করেছে
আমার বাপের মাকে (পিসী ও ভাইঝি)

পূর্বের সম্পর্ক কেন্দ্রিক ধাঁধাগুলিতে যেখানে প্রশ্নকর্তাকে অনাত্মীয় কৌতূহলী ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত হতে দেখা গেছে, এখানে সেই ব্যবধান অপসারিত।

৫ কাল পাথর মাজ তুমি, কাল তোমার গা,
কি জাতির মেয়ে তুমি বল দেখি গা ?
কাল পাথর মাজি আমি কাল আমার গা
কলসীর কানায় ডিম রেখে ছাগলে দেয় তা
সেই জাতির মেয়ে আমি, মরি আহা যা। স্যাকরা ও মেয়ে

৬. চাইর ধারে ঘুররে বগুলা খাও মাছ জোঁক,
দেখ্ছিলা কি একজন মেয়ে লোক।
দেখ্ছি দেখ্ছি খনুকে ডালে।
খনুকে ভাসে নয়নের জলে
হাতের পান জলে ফ্যালায়
কাইন্দ্যা কুইট্যা বাড়িতে যায় !
এই কথা যে মানি কয়
সবে তাঁরে পণ্ডিত কয়।

এক জেলে এক যুবতীকে ভালোবেসে অভিসারে বেরিয়ে যুবতীর দেখা না পেয়ে ফিরে যায়। কেননা সে বড় দেরী করে এসেছিল। ইতিপূর্বে তার প্রেমিকা ঠাকরুণ প্রেমিকের সাক্ষাৎ না পেয়ে চলে যায়। ব্যর্থকাম জেলে যুবতীর অনুপস্থিতিতে উপস্থিত এক বককে যুবতী সম্পর্কে জানতে চাইলে বক তার উত্তর দেয়। এই প্রশ্নোত্তরমূলক ধাঁধাটিতে তাই বিধৃত হয়েছে।

ঠ অপ্রাসঙ্গিক শব্দের বা পংক্তির প্রয়োগ :

প্রবাদে কোন অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বা পংক্তির প্রসঙ্গ উল্লিখিত না হলেও ধাঁধায় উত্তরদাতাকে বিমূঢ় করার জন্য প্রশ্নকর্তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেক অপ্রাসঙ্গিক শব্দ, পদাংশ অথবা পঙক্তিকে সংযুক্ত করতে দেখা যায়। ছন্দ

নির্মিতি কৌশলের অঙ্গস্বরূপও অনেক সময় এইরূপ বাক্যাংশ সন্নিবিষ্ট হতে দেখা যায়।

১. শাক তুলুনি শাক তুলুনি শাক খাওয়ারে তোকে
আমার বাপে বিয়া করেছে তোমার বাপের মাকে। উত্তর—ঠাকুমা।
এখানে প্রথম পঙক্তিটির সঙ্গে ধাঁধার মূল প্রশ্নের কোন সম্পর্ক নেই।

২ আন মাঝি তান মাঝি।
কাঁকুড় কিনলেন তিনটি॥
কেউ খাবে না কাটা।
ভাগ করে দেখা বেটা॥ উত্তর—মা, মেয়ে, নাতনি।
এখানে 'আন মাঝি তান মাঝি'র সঙ্গে ধাঁধার মূল প্রসঙ্গ সম্পর্কিত নয়।

৩ রিং রিং রিং মাথায় দুটো শিং
পাক নাই পাকুড় নাই, ডাঙায় পাড়ে ডিম। উত্তর—কুক্কুট
এই ধাঁধাটির প্রথম পঙক্তিটি অপ্রাসঙ্গিক। তবে ছন্দের প্রয়োজন প্রথম পঙক্তি কিছুটা মিটিয়েছে।

৪ ইবি ইবি ইবি
আকাশ পানে মুখ করে
হাগে কোন বিবি? উত্তর—কেঁচো
এখানে প্রথম পঙক্তিটি বিভ্রান্ত সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

ঙ. **অলঙ্কার:**

১. কাল পাথর মাজ তুমি কাল তোমার গা
কি জাতির মেয়ে তুমি বল দিকি গা? স্যাকরার মেয়ে
এখানে যমক অলঙ্কার হয়েছে। প্রথম পংক্তির 'গা'র অর্থ দেহ, দ্বিতীয় পংক্তির শেষে সন্নিবিষ্ট 'গা' সম্বোধন সূচক।

২. ধ্যানে স্নান, স্নানে ভোজন
এক কাজে তিন কাজ করে কোন জন? মাছরাঙা
এখানে 'ন' বর্ণটি নয়বার ব্যবহৃত হয়ে কাব্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করায় অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়েছে।

৩, এপার খাগড়া ওপার খাগড়া,
খাগড়ায় খাগড়ায় লাগল ঝগড়া। ভুরু
এখানে 'ড়' বর্ণটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়ে অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

৪ চাইর পাশে লোহার আইল,
মাঝে কেঁঅনে জোয়াঁর আইল্ ? (নারকেল)

যমক অলংকার হয়েছে কারণ প্রথম পংক্তির শেষে 'আইল' বলতে 'সীমানা জ্ঞাপক' বোঝানো হয়েছে, অপরপক্ষে দ্বিতীয় পংক্তির 'আইল' ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত, আসিল অর্থে বলা হয়েছে 'আইল্' ।

৫. জল আছে খালে বিলে
জল আছে গাছের ডালে। (নারিকেল)

অনুপ্রাস, 'ল' বর্ণটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. আন্দার ঘরে বান্দর নাচে,
মানা করলে আরো নাচে। (জিহ্বা)

'ন' বর্ণের ছয়বার ব্যবহারে অনুপ্রাস হয়েছে।

৭. বড় একটা মানুষ তার মধ্যখানে নাই। (নাভি)

এখানে শ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে। 'নাই' বলতে নঞর্থক আবার নাভি দুই অর্থ প্রকাশিত, অথচ 'নাই' শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

৮ চার কোনার পুকুর মরা ডিঙ্গি ভাসে,
পার্শ্বে খোঁচা দিলে খিল খিলাইয়া হাসে। (পিঠা)

এখানে সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে অচেতন পদার্থ 'ডিঙ্গি'র উপর সচেতন প্রাণীর গুণ আরোপিত হয়েছে।

৯. লেটুস লেটুস বাটিটা,
কোন কুমারে গড়েছে
তাতে মুক্তা মানিক ভরেছে। (ডালিম)

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা, ডালিমের দানাগুলিকে মুক্তা মানিক বলে মনে হবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সত্য সত্যই তো আর দানাগুলি মুক্তা মানিক নয়, গভীর সাদৃশ্য বশতঃই এই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সংশয়ের ভাবটি এখানে বেমালুম অন্তর্হিত, সংশয়বাচক শব্দের অনুপস্থিতিই এক্ষেত্রে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে পরিণত করেছে। উপমেয় ডালিমদানা মুক্ত-মানিক বলে প্রতীতি জন্মেছে।

১০ আকাশ থেকে পড়ল ইঁট,
ইঁট বলে আমার পাঁচ পিঠ।

ইঁট জড় পদার্থ হয়েও বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়ার গুণে সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে।

১১. দু হাতে দশ আঙ্গুল চক্ষু কর্ণ নাই
এই জীব সৃষ্টি কইর‍্যাছে কোন গোঁসাই। (মানুষ)

এখানে 'নাই' শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হলেও দুটি অর্থ প্রকাশ করেছে। একটি 'নাই' অর্থে 'নাভি' আর একটি অর্থ হল নেতিবাচকতা। তাই শ্লেষ অলংকার হয়েছে।

১২. এক বেটা উড়ে যায়
পা তার মাটিতে। (উড়িয়া)

এখানে 'উড়ে' শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হলেও দুটি পৃথক অর্থকে প্রকাশ করেছে—উড়িষ্যাবাসী ও উড্ডীয়মান হওয়া। এখানেও শ্লেষ অলংকার হয়েছে।

১৩. এক বিঘতা গাছটি,
ছাতার মতন পাতাটি,
যে লাড়ে কোলটি,
সেই তুলে ফলটি। (কুমারের চাকা)

এখানে পাতাকে ছাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে উপমেয় পাতা. উপমান ছাতা, সাধারণ ধর্ম গোলাকৃতি; সাদৃশ্যবাচক শব্দ হল 'মতন'। উপমা অলংকার।

১৪ অতটুকু পাখী, সরষে পারা আঁখি। (মশা)

এখানে উপমেয় আঁখি, উপমান সরষে, সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'পারা' এবং সাধারণ ধর্ম ক্ষুদ্রাকৃতি। অর্থাৎ উপমা অলংকার হয়েছে।

১৫. চার পায়ে দাঁড়ায়
দু পায়ে ঘুমায়। (খাট)

এখানেও সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে।

চ. সংখ্যাবাচক শব্দ :

১. চারটে বোতল উপুড় করা
ছিপি নাই তার মধু ভরা। (গরুর বাঁট)

২. একশ টাকার ঘর জল পড়ে ছাচর। (পানের বরজ)

৩ বনে থেকে বেরুল বাঘ
বাঘের গায়ে একশ দাগ। (আনারস)

৪ একটা হাঁসের বারটা ডিম
চারটে গরম চারটে নরম
চারটে কালা হিম। (বছর)

৫. তিন অক্ষরে নাম তার,
জলে বাস করে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
গাছে এসে ঝোলে। (কাছিম)

৬ তুরতুরে ফুরফুরে ভাঁড়ার ঘরে যায়
হাজার টাকার কুলুপ ভাঙ্গে ঝাল ছোলা খায়। (ইঁদুর)

৭. আট ন ষোল হাঁটু মাছ ধরিতে যায় টাটু,
ডাঙ্গায় ফেলে জাল, মাছ ধরে খালে খাল। (মাকড়সার জাল)

৮. দুই পায়ে আসে চার পায়ে বসে
দুই পায়ে ঘসে। (মাছি)

৯ তিন ইঞ্চি বাবাজী গঙ্গা জলে ভাসে,
পাছায় তার হাত দিলে ফিক করে হাসে। (প্রদীপের সলতে)

১০. কাল কাল পাহাড়ে কালো গাই চরে
লক্ষ লক্ষ টাকা দিলে নাই নাই বলে। (চোখ)

১১. চার প্রকারের চারটি রঙ
মুখে পুরলে একটি রঙ। (পান)

১২. বারটি ডিম ত্রিশটি পাতা, প্রতি পৃষ্ঠা সাদা এক পৃষ্ঠ কালা।
(বৎসর)

সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য একটিই আর তা হল শ্রোতাকে বিমূঢ় করা। সংখ্যাবাচক শব্দগুলিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। আক্ষরিক অর্থে কিছু সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে 'চার' এই সংখ্যা শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহৃত, কেননা গরুর বাঁটের সংখ্যা নির্দেশক-রূপে সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা বারো মাসের বৎসরকে যখন চতুর্থ দৃষ্টান্তে হাঁসের বারটি ডিম বলে অভিহিত করা হয়, তখনও আক্ষরিক অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ নজরে পড়ে। পঞ্চম দৃষ্টান্তে 'কাছিম' শব্দটি যেহেতু তিন অক্ষরে গঠিত, তাই প্রথম পংক্তিতেই বলা হয়েছে 'তিন অক্ষরে নাম তার', সংখ্যাবাচক শব্দের আক্ষরিক প্রয়োগ ঘটেছে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে যে পানের বরজকে একশ টাকার ঘর, কিংবা তৃতীয় দৃষ্টান্তে বাঘের গায়ের দাগের সংখ্যা একশ বলা হয়েছে তা মোটেই আক্ষরিক অর্থে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যথার্থ কিংবা অসংখ্য অর্থেই এসব ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৭. হিন্দী, ইংরেজী, ওড়িয়া ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ :

১. লম লম দাড়ি শিঙ্গে কালি
কাহালে আলে সাধু কহ সে বাত
বারিবাঘের জন্য সাত দিন উপাস। (ছাগল)
'বাত' হিন্দীশব্দ।

২. চিঁ চিঁ পাতা বোঁ বোঁ ডাল
ফল কা বেঁকা বিচি কা লাল। (তেঁতুল)
'কা' হিন্দী শব্দ।

৩. নয়া জামাই গোসল করে
টুপি থাকে মাথার পরে।
একশ কলস পানি দাও,
তবু শুকনা তার গাও। (কচু গাছ)
'নয়া' 'গোসল' 'পানি' এগুলির সবই হিন্দী।

৪ উড়ে উড়ে পেখম ধরে ময়ূর সে নয়
গুন্‌গুন্‌ কইরগা গান করে গায়কও সে নয়,
গরু খায় মানুষ খায় ভল্লুকও সে নয়,
বসে বসে ইংরাশন করে ডাক্তারও সে নয়। (মশা)
এখানে 'ইংরাশন' ইংরেজী ইনজেক্‌শনের বিকৃত রূপ।

৫ খান ভাইজান, ইকারীর পান
কোন জন্তুর পাখা টান। (ফড়িং)
'ভাইজান', 'খান' হিন্দীশব্দ।

৬. আকাশে জুড়লাম লাঙ্গল পাতালে জুড়লাম মই,
সাত তাল কাউয়ায় চিড়িয়া খায় খই। (বৃষ্টি)
'কাউয়া' হিন্দীশব্দ।

৭. এমন কি বা চিজ্‌ আছে ভাই এই সংসারে
দিলে খায় না, না দিলে খায়। (গরুর মুখের টোনা)
'চিজ' হিন্দী শব্দ।

৮. তিন অক্ষরকা সেরা নাম,
উল্টা সিধা এক সমান। (নরেন)
'কা', 'অক্ষরকা', 'উল্টা', 'সিধা' ইত্যাদি হিন্দী।

৯ চারটি চালা চালছি
মানিক দীপ জলছি
রেনা সাপ খেলছি
দুটি কুনো হসুছি। (হাঁটু)
ক্রিয়াপদগুলি সবই ওড়িয়া।

ঙ. প্রশ্নবোধক (Interrogative):

ধাঁধা মানেই প্রশ্নবোধক, কেননা প্রবাদের মত তা কেবল বক্তার বক্তব্যেই শেষ হয়ে যায় না, শ্রোতার কাছ থেকে উত্তর এতে প্রত্যাশিত। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, ধাঁধা হল প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতার উভয়ের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের বিষয়। তবে আবার পৃথক করে প্রশ্নবোধক ধাঁধার উল্লেখের আবশ্যকতা কোথায়? আবশ্যকতা সেখানেই, প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহারে (মৌখিক ভাবেই) যার উপস্থাপনা ঘটে। আমরা প্রত্যক্ষ প্রশ্নবোধক ধাঁধাগুলির প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করছি। বলাবাহুল্য, উত্তর অনুপস্থিত থাকায় প্রশ্নোত্তর মূলক ধাঁধার নাটকীয়তা এই শ্রেণীর ধাঁধায় অনুপস্থিত; তবে অন্যদিকে, প্রশ্নকর্তার সোচ্চার উপস্থিতি এই পর্যায়ের ধাঁধায় আমরা সহজেই অনুভব করি।

১. ইট ঘুঘুর পিঠ টান
কোন্ ঘুঘুর চাইর কান? (চৌয়ারী ঘর)

২. বনে গ্যালাম নেফুল পালাম
এ নেফুল দ্যা করবো কি বোটা নাই তার ধরবো কি? (ডিম)

৩. অতি আস্বাদন, মায়ে ছুঁইলে কইন্যার মরণ
লোক তারে খায় নিতি, বল এই প্রশ্নের উত্তর কি? (লবণ)

৪. খোসা আছে বোঁটা নাই বলত কি জিনিস ভাই? (চোখ)

৫. উত্তরে চিলের বাসা, কোন্ গাছের ফল কাঁচা। (পেস্তা)

৬. প্রতি ডুবেই মাথায় লাথি বলতে পার এটা কি? (হামান দিস্তা)

চ. প্রত্যক্ষ উক্তি:

প্রত্যক্ষ উক্তিতেও বহু ধাঁধা সৃষ্ট। বলাবাহুল্য এই ধরনের ধাঁধায় শ্রোতার সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ বা সম্পর্ক যেন সহজেই স্থাপিত হয়।

প্রশ্নকর্তার সঙ্গে নৈকট্য বোধ হওয়ায় বস্তুভাবনা তিরোহিত হয়ে আত্মভাবনার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। প্রশ্নকর্তার ব্যক্তিত্ব উপস্থাপিত প্রশ্নে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

১. নহি আমি গাছ তবু শাখা আছে মোর
   সব সময় থাকি মাথার ওপর। (হরিণের শিং)

২. শুঁড় দিয়া কাজ করি নহি আমি হাতী,
   পরহিতে খাটি সদা তবু খাই লাথি। (ঢেঁকি)

৩. বাঁশ হতে জন্ম আমার, কাগজ হয়ে চলি,
   হাত নেই পা নেই হাওয়া পেলে চলি। (ঘুড়ি)

৪. কূপের মাঝে জন্ম আমার নেই কোন রস
   মানুষের শরীরে থাকি নহি জীবকোষ। (লোম)

৫. ঘরের মধ্যে জন্ম আমার জলের মধ্যে বাস
   পাড়ে যখন ঘুরে বেড়াই, বয়ে বেড়াই বাস। (শামুক)

দ. নামবাচক শব্দের প্রয়োগ : (ব্যক্তি নাম)

বক্তব্যে প্রত্যক্ষতা তথা বাস্তবতা আনতে অনেক সময়ে ধাঁধায় নামবাচক শব্দ যুক্ত হতে দেখা যায়। যে সব নামবাচক শব্দ যুক্ত হয় সেগুলিকে আমরা ব্যক্তি নাম ও স্থাননামে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমে ব্যক্তিনাম বাচক শব্দ যুক্ত কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত গৃহীত হল :

১. আইলরে কালু খাঁ বইলরে ডালে,
   কার বাপের সাধ্য আছে কালুকে চেপে ধরে। (মৌমাছি)

২. উপরে তিতা ভিতরে মিঠা গুল গোবিন্দ দাস
   এই কথাটি কইতে লাগে সাড়ে তিনডা মাস। (জাম্বুরা)

৩. ঝাঁপের উপরে ঝাঁপ তার উপরে বইয়া রইছে কেরুল সাইবের বাপ
   কেরুল সাইবে আস্তা পাড়ে।
   কোন্ পণ্ডিতে ভাঙ্গাইতে পারে। (উকুন)

৪. একটা গাছে তিন তরকারী
   বইসকা আছে রাসবেহারী। (কলাগাছ)

৫. এক জিনিসের বাইশ নাম, শুনিয়াছ ভুঁইয়া ?
   নছিরাম কামারে কয়, উয়ার নামই উয়া। (বাইশ)

থ এইবার স্থান নামের প্রসঙ্গ :

১. গেছিলাম খুরজীপুর হাটে, এক ছাওয়া দেখে এলাম দুই মায়ের পেটে। (দরজার খিল)

২. যাইতে আসতে রহনপুর একডালে পাঁচফুল। (হাতের আঙ্গুল)

৩. কলিকাতায় আগুন লিগেছে নলডাঙ্গায় শব্দ হচ্ছে (হুঁকা)
নারিকেল ডাঙ্গায় ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

৪ চাইরো পাকে লোহার ব্যাড়া
কোন জাগা দিয়া যামো কামার পাড়া। (কবর)

৫. এইখান থাইক্যা মারলাম ছুরি ছুরি গেল পাতালপুরী। (কেঁচো)

কালুখাঁ, গোবিন্দ দাস, কেরুল সাহেব, রাসবেহারী, নছিরাম এইসব ব্যক্তিনাম যেমন সত্য-সত্যই ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, তেমনি খুরজীপুর, রহনপুর, কলকাতা, নলডাঙ্গা, নারকেলডাঙ্গা, কামারপাড়া, পাতালপুরী প্রভৃতি স্থান নামগুলিও নির্দিষ্ট কোনো স্থানের সূচক নয়। অনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানের দ্যোতক রূপেই নামবাচক শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

ন. সংক্ষিপ্ত রূপ :

গদ্যে রচিত ধাঁধা আছে ঠিকই কিন্তু পদ্য ছন্দে রচিত ধাঁধারই সংখ্যাধিক্য। ছন্দব্যবহারের প্রবণতা ধাঁধার অবয়ব গঠনে সহজেই আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। আর ছন্দের তাগিদে অনেক সময়েই দেখা যায় মূল শব্দের ব্যবহারকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণের তাগিদে অথবা বিকৃত উচ্চারণের ফলেও শব্দ সংক্ষিপ্ত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে :

১. একটা পুষ্কুণী, দুই রকম পানি,
জলদি করে দেও ভাঙ্গানি।
পুষ্করিণী > পুষ্কুণী। (ধ্বনিলোপ)

২. পানিত যায় থাকে, মাছ নয়,
দুই শিং নাড়ে মৈষ নয়।
মহিষ > মৈষ (ধ্বনিলোপ)

৩. এ পান্দে মাল্লাম ছুরি,
ছুরি গেল গাঙ্গের মুরি
পার দিয়ে > পারদে > পান্দে।
মারিলাম > মারলাম > মাল্লাম (ধ্বনিলোপ)

৪. চাইরো পাকে লোহার ব্যাড়া
কোন জাগা দিয়া যামো কামার পাড়া। (কবর)
জায়গা>জাগা। (ধ্বনিলোপ)

৫. লমলম দাড়ি শিঙ্গে কালি
কাহালে আলে সাধু কহ সে বাত
বারিবাঘের জন্য সাত দিন উপাস (ছাগল)
উপবাস>উপাস। (ধ্বনিলোপ)

৬. ঝোপের থেকে বারালো টিয়া
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া। (আনারস)
বাহির হইল>বারহল>বারালো। (ধ্বনিলোপ)

৭. ইঁটদ্যা বানালাম ভিটা, ভুঁইদ্যা বানলাম আইল,
মা মরছে দশ মাস আগে, বাই অইছে কাইল। (কাছিম)
ইঁট দিয়ে>ইঁটদ্যা, ভুঁই দিয়ে>ভুঁইদ্যা
বানাইলাম>বানালাম। (ধ্বনিলোপ)

৮. সিংহ রাজার বেটা নয়রে সিংহ রাজার নাতি,
এই শিলোক খানি কইতে লাগবে আশিন আর কাতি
আশ্বিন>আশিন, কার্তিক>কাতি। (ধ্বনিলোপ)

৯. কাল ছাগলের গলায় দড়ি,
সন্ধ্যা হতেই তলাস করি
তল্লাস>তলাস। (বর্ণলোপ)

১০. ভাঙ্গা ঘরত কইন্যা নাচে
গুঁথা দিলে উয়া নাচে।
কন্যা>কইন্যা। (বর্ণাগম)

১১. আশায় বাঁধলাম ঘর, দুয়ার রাখলাম না
গরম জলে পুড়ে মলাম টের পেলাম না
মরলাম>মলাম। (বর্ণলোপ)

১২. পাইলে হক্কুলে খায়
নিংডা হই হাটত যায়।
হকুলে>হক্কুলে। (বর্ণদ্বিত্ব)

১৩. সকল ভাইয়ের এক নাম একই নামে ডাকে। (দাঁত)
এক্কই>একই ; এক্ষেত্রে বর্ণদ্বিত্ব হয়েছে 'ক' বর্ণটিকে দ্বিত্ব করা হয়েছে।

১৪. উপর থেকে আসছে বুড়ো কুড়ুল ঘাড়ে করে,
এমন সুন্দর শিমুল গাছ কাটবে কেমন করে। (ছায়া)
কুড়াল > কুড়ুল। (স্বরসঙ্গতি)

১৫. বার মাস জলে একশো দুশো গিলে। (ডিঙ্গি নৌকা)
গেলে > গিলে (স্বরসঙ্গতি)

১৬. হাড়ি বাউড়িদের রাঁধা বামুন বোষ্টমে খায়
তাদের জাত কেনে নাই যায়। (গুড়)
কেন > কেনে (স্বরসঙ্গতি)

১৭. কোটাল নয়, চৌকিদার নয়, রেতে হাঁক দেয়
বাঘ নয় ভালুক নয় মানুষের রক্ত খায়। (মশা)
রাতে > রেতে ঃ স্বরসঙ্গতি

১৮. বন থেকে বেরুল টিয়া ঠোঁটখানি তার লাল
আদর করে চুমু দিলাম পুড়ে গেল গাল। (লঙ্কা)
চুম > চুমু = স্বরসঙ্গতি

১৯ এই না ভবে কোথারে,
এক যে আছে বিরিক্ষি, শিকড় ছাড়াই বাড়ে। (মানুষ)
বৃক্ষ > বিরিক্ষ (স্বরভক্তি) > বিরিক্ষি (স্বরসঙ্গতি)

২০. মুণ্ডু কেটে রাঁধে ছাল নিয়ে যায় বাজার,
আবার হাড়ের মাথায় আগুন জ্বলে। (পাটশাক, পাটকাটি ও পাট)
মুণ্ড > মুণ্ডু ; স্বরসঙ্গতি

২১ আজার বেটী কেশেরী,
চুলি মেলে আথারি-আথারি। (লাউ গাছ)
কেশরী > কেশেরী স্বরসঙ্গতি

প. বর্ণাগম ও বর্ণলোপ ঃ

১. কাঠের গাই মাটি বাছুর
ওরে বেটা কালাচান্দি
দুধ খাবি তো বাছুর বান্দ। (খেঁজুর গাছ ও মাটির ভাঁড়)
চাঁদ > চান্দ ; বাঁধ > বান্দ (বর্ণাগম)

২. টলডং নলডং উপরে ছাতি
তারে ফল খায় আশিন কাতি। (মুখীকচু)
আশ্বিন > আশিন ; কার্তিক > কাতি (বর্ণলোপ)

৩. কাঁচায় তলতলে পাকায় সিন্দুর
যে না বলতে পারে সে হয় গেছো ইন্দুর। (মাটির কলসী)
ইঁদুর>ইন্দুর (বর্ণাগম) (ন)

৪. চামড়ার দেহ তার হাড় মাস নাই
এদেশ ওদেশ ফেরে তারা দুটি ভাই। (জুতা)
মাংস>মাস (বর্ণলোপ)

৫. পৌষ মাসে পুষ্প মাঘ মাসে শিরে জটা
ফাগুন মাসে কাটল মাথা তার তরকারী আমাদের ঘরে। (সজনে)
ফাল্গুন>ফাগুন (বর্ণলোপ)

৬ যাদুমণি খেলা করে বুক বেয়ে লাল পড়ে। (ভাতের ফেন)
নাল>লাল ; বিষমীভবন

৭ আই বড় থাকল মা
বিটি গেল শ্বশুর গাঁ। (পুতুলের বিয়ে খেলা)
বেটি>বিটি ; স্বরসঙ্গতি

৮. হাট যাচ্ছেল তোমরা, পয়সা দেছি হামরা
হামার সঙ্গে কিনি আনেন শুধু চামড়া। (পেঁয়াজ)
কিনে>কিনি ; স্বরসঙ্গতি

ক. গৌরবার্থে 'টি' ; Classifier এর প্রয়োগ :

১ একটুখানি গাছে রাঙা বৌটি নাচে—(মরিচ)
'বৌটি'র 'টি' গৌরবার্থে প্রযুক্ত।

২. তুচ্ছার্থে 'টি' ;
একটুখানি গাছটি
গোয়া ধরে পাঁচটি। (মরিচ)
'গাছটি'র 'টি' তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত।

ক. বর্ণ বিষয়ক :

১. সাদা পাগড়ি মাথায় দিয়া,
দরবেশ রইছে ধ্যানে বইয়া। (বরফশীর্ষ পর্বত)

২. মুখ দিয়ে বমি করে রক্ত কালো কালো।
তোমার আমার সবার কাছে ইহা কত ভাল। (কলমের কালি)

৩. কালো রঙের ঘাঘ্‌রা পরা একটি মাত্র পা,
কান্দে চইড়্যা ঘুইর‍্যা বেড়ায় দ্যাখতে মজারা। (ছাতা)

৪. পিঠ কালো বুক ধলো সমুদ্দুরের আল
মা মরেছে ছ'মাস আমি হইছি কাল। (কচ্ছপ)

৫. পরের ঘরে জন্ম বলে রং হয়েছে কালো
দেখতে আমি কালো বটে গান শুনাই ভাল। (কোকিল)

৬. কালো কালো ভোমরা কালো ঘাস খায়,
রাত হলে ভোমরা খোয়াড়ে লুকায় (কাঁচি)

৭. খড়্গ মাথা পিঙলা চুল
সাত পাও তিন নেঙ্গুল। (চিংড়ি)

৮. হলুদ বরণ গা, কাঠির মত পা
বন থেকে ভেকটি দিলে চমকে উঠে গা। (বল্লা)

৯. মুলা চাক চাক মুলা চাক চাক মুলাও তো না
সাদা ধব ধব সাদা ধব ধব তুলাও তো না। (শাঁখা)

১০ লাল ধানে কাল মারে, তার ঘর ওপারে,
কাল ধানে চাপট মারে, তার ঘর ওপারে। (লোহা পিটানো)

এই ভাবে সাদা, কালো, হলুদ, লাল ও অন্যান্য নানা বর্ণ প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে আমাদের নানা ধাঁধায়।

ব. নামধাতু :

১. বল দেখি বিচক্ষণ জিজ্ঞাসি তোমারে
জিজ্ঞাসি = জিজ্ঞাসা করি।

২. স্বামী হতে পুনরায় জম্মায় নিজ ঘরে
জম্মায় = নামধাতু।

৩ জ্বালা পেয়ে স্ত্রীর পেটে প্রবেশিল পতি
প্রবেশিল = নামধাতু।

ভ. সমীভবন বা ব্যঞ্জনসঙ্গতি :

১. মামুরা সিন্নি রান্ধে
আমারে দেইখ্যা দুয়ার বান্দে। (শামুক)
সিরণি > সিন্নি।

ম. সন্ধি :

১. নয়ন রঞ্জন করে নহে তো অঞ্জন,
চর্ম রহে তবু নহে চর্ম আভরণ।

নাকে রহে নাকফল—নাকছাবি নয়,
স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ কভু নাহি হয়। (চশমা)
ভেদাভেদ = ভেদ + অভেদ।

২. এ পান্দে মাল্লাম ছুরি,
ছুরি গেল গাছের গুরি। (রাস্তা)
পার + দে = পান্দে ;
মার + লাম = মাল্লাম।

পরিশেষে ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ কিছু ধাঁধা সংকলিত হল :

১. কাঁচার সময় তুকতুক
পাকিলে হয় লাল সিঁদুর
এ শ্লোক যেনা পারে
তার বাবা হবে বুড়া ইঁদুর। মাটির হাঁড়ি

২. ঝিকা গাছে ঝিক ঝিক করে
সাধুর পোলায় কন্ধক ধরে। বিদ্যুৎ চমকানো

৩. খাল বিল শুকিয়ে গেল
গাছের আগায় জল রইল। নারকেল

৪. ধোয়ায় ছেলের গাও
না হই ছেলের মাও
ছেলের বাপে জাতশ্বশুর
আমার বাবার তার শ্বশুর। ভাই বোন সম্পর্ক

৫. আগের জনের মাই
পিছু জনের বাপে
আমায় শ্বশুর বইলা ডাকে। স্বামী ও ভাগ্নে

৬. আশি টাকার খাসি মইল
ষোলশো শকুনে মাইল
একটা শকুনের কয় পয়সা অংশ পেইল। পেয়সাকরে

৭. উঠিতে ঝঝমক
বসিতে পাহাড়
লক্ষ লক্ষ জীব মারে
তবু না করে আহার। জাল

৮. মরাই বত্তাক খাই
পেটে গিয়ে খড়বড়াই। মাছ

৯ পূর্ব পশ্চিম উত্তর, দক্ষিণ
কেওনা পায়ের দেওয়া
তোমার গরুকে নিয়ে এসো
কোন কল কাঁচা। চালকুমড়ো

১০ একটি খানি চেংড়া
বড় বড় গাছুন লাগাই নেড়াং। মাকড়সা

১১ ধুপ কড়ি পইল
চুপ কড়ি ঔল। গোবর

১২. এ্যাক নী গাছে এ্যাক নী ফল
পাকিয়াছে টলটল। আনারস

১৩. ইড়কিচি বিড়কিচি
নাইচোচা নাইবিচি। লবণ

১৪ ঘরের ভিতর ঘর
তার তলে পুইড়্যো মর। মশারী

১৫. শুভঙ্করের ফাঁকি
ছত্রিশ এর মধ্যে তিনশ গেলে
কয়টা থাকে বাকি। স, ষ, শ

১৬ আমটা আমটা কণ্টি কণ্টি
তুই মোকে ছেঁচলি
সুঁচ মুখ করাতের ধার
তুই যে এখান দিয়ে চললি
আপন চলা চলব না
আপন পড়া পড়বনা। চালতা ও কাকলা মাছ

১৭. চারিদিকে বেঁধ কাটা
মাঝখানে সাহেবব্যাটা। আনারস

১৮. খালবিল শুকিয়ে গেছে
গাছের আগায় জল রয়েছে। নারকেলের জল

১৯. ধ্যাড় ধ্যাড় ধ্যাড় ধ্যাড়া
ছাপ দিয়া করলাম খাড়া
জোয়ানে করে একবার
বুড়ীরা করে বারবার। সুচসুতো

২০. জঙ্গল থেকে আসল ভুইট্যা
পাতে দিল মুইত্যা। লেবু

২১. আন্ধার ঘরে বান্দর নড়ে
না করলে আরও বেশী নড়ে। জিহ্বা

২২. এত বড় আকাশটা
এতগুলো ফুল ফুটেছে
তুলিয়াও নাই ফুরিয়াও নাই। তারা

২৩. ফেরেরে চমাকলে পাইছে
বিনা বাপে পুত হইছে
পুত হইল দুপুরে
মানাই এ ঘরে
এইপুতে কারে ডাকবে বাপ। টাকা

২৪. ভনভন ভোমরাও না
সুতামাটি খোঁড়ে শুয়োর ও না
গলায় লোগুন আছে
বামুনও না। লাটিম

২৫. কলা কচু জলে ভাসে
হাড়ডি নাই তার মাংস আছে। জোঁক

২৬. রাজার ছাগলগুলা
ফেল ফেলাই যায়
একশ টাকার মরিচ খাইয়্যা
আরো খাইতে চায়। শিল, নোড়া, বাটা

২৭. এত গোনা গাছ কোনা
তারে তলে পুজা খানা। তুলসী গাছ

২৮. তাল তাল তাল
তাল নীচে চুড়ে
পৃথিবীতে আগুন লাগলে
কেউ নিবাইতে পারে না। সূর্য

২৯. একটুকু ছেলে
দুধ ভাত খায়
বড় বড় গাছের সঙ্গে
যুদ্ধ করতে যায়। কুড়াল

৩০. গাছের ওপর গাছ
মাঝখানে একটা ফল। আনারস

৩১. জেনর কানিতে গাইটা
গনুটা ধরে পাঁচটা
যদি গনুটা লাল হয়
হাজার টাকার মনে হয়। কমলালেবনু

৩২ আই মাই মাই
ছোট হইলে কাপড় আছে
বড় হইলে নাই। বাঁশের মোতা

৩৩. হলনুদ হইলে ভ্যামনুগ
দনুধেরে বর্ণ এই শ্লোকটা ভাঙাতি না দিলে
গাধার জন্ম। ডিম

৩৪. ইরকিচি বিরকিচি
নাই চাচা, নাই বিচি। লবণ

৩৫. ইরকিচি বিরকিচি
ফিচি ধারের হাট
দৌড়ী দেখি আসিলাম
দনুয়ে কোনা দাঁত। বাঁশের গঠয়ের মাপা

৩৬. রাজার বেটি
ধন খরাপেটি
বিনা কোদালে খনুঁড়ে মাটি। শনুয়োরের মাথা

৩৭. এত ফোলা কলা গাছ
পিছলে গেলে সর্বনাশ।
পাকা কলার খোলার উপর পা দিলে পিছলে পড়ে যায়।

৩৮. কালো কিন্তু কাক নয়
গোল কিন্তু বল নয়
কথা বলে কিন্তু মাননুষ নয়। গ্রামোফোন রেকর্ড

৩৯. রাধার আছে কৃষ্ণ
কৃষ্ণের নাই শহরে কদনুরে আছে
কলকাতায় নাই। 'র'

৪০. চারিদিকে লোহার আইল
তার ভিতরে কেমন করিয়া জল আইল। নারকেল

৪১. একটা বুড়ি সকালে ওঠে
তিন চারটে গুঁড়ি। গরুর ঘুঁটি

৪২. *আকাশে ঝিকিমিকি*
পাতালে শুরু
এই কিচ্ছা ভাঙতে না দিলে
হবে দামড়া গরু। ঘুড়ি এবং তার সুতো

৪৩. তাল গুরগুরে উপরে ছাতি
তা খাই মানুষে আশ্বিন কার্তিক। যাজ / কচুর নীচের অংশ

৪৪. *পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ*
চারটা শিশি মধু ভরা
মুখটা ভাই উপুর করা। গাই গরুর বাঁট

৪৫. *চোখ দিয়ে খায় মুখ দিয়ে হাগে। মাছ ধরার টেপাই*

৪৬. এটে থাকি দিলুম দৃষ্টি
এই গাছটাই বড় মিষ্টি। আখ

৪৭. দিদিমণি দিদিমণি নমস্কার
তিনটি ফুটা আছে কার? হাওয়াই চপ্পল

৪৮. হাতীর মতো দেহটা
খাইতে খাইতে ভাণ্টাটা। পোয়ালের (খড়) পুঁজি

৪৯. মধ্য দিঘির বেলের গাছ বেল ঝুমঝুম করে
কার বাপের সাধ্য আছে
বেলটা দিতে পারে। তারা

৫০. একগাছে এক ফল
পাখী আছে টলমল। আনারস

৫১. মধ্য দিঘির কোড়ালের বাসা
ছেলে মেরে করে আশা। ভাত

৫২. মধ্য দিঘিতে ফেলালুম ছাই
ভাসি উঠল কালা গাই। জোঁক

৫৩. দুই চরু তাতে দিলাম ভরে
ও দি একটা ধাম
ও দি কতা শ্যাম। ফাঁতি বাশন্তা

৫৪. একনা বাপই
সারা গায়ে আটই। কাটাল / কাঁঠাল

৫৫. একনা বাপই
একান শিকই। বামুন / ঝাড়ুন

৫৬ আঁস্ত গেলুম আঁস্ত গেলুম
গেলুম মরার ঘাট
একদৌড়ে দেখে আসিলুম
আঠারোটা নাক। লাঠি মাছ

৫৭. বক্ বক্ বগিলা
ধক্ ধক্ ধকিলা
চার মাথা বারো ঠ্যাং
কাহা দেখিলাম। গরু দোয়ানোর সময়

৫৮. একনা বুড়ি খই ভাজে
মানুষ দেখলে দুয়ার আঁটে। শামুক

৫৯ আঙখীর উপর পাখির বাসা
জল দিয়াছে শ্যালে
চার পায়ের উপর নিপায়ে উঠিল
দুপায়ে নিল ডালে। গরু, চিল, মাছ

৬০ হাতির মত দেহটা
খাইতে খাইতে কাঁটাটা। কাঁঠাল

৬১ জঙ্গল থেকি বেড়ল হোকস
মাথা করে টোকশ টোকশ। জোঁক

৬২. টিপ দিয়ে ময়না
ঢ্যালা মারলে ভাঙেনা। ভাত

৬৩ একটা-ঘ্যাড়ে ঘরটা-ঘিরে। বাতি

৬৪ একটা গাছের একটা ফল
পাকিয়াছে টলমল। আনারস

৬৫. ইরকিচি-বিরকিচি
নাই চোচা নাই বিচি। লবণ

৬৬. মধ্য নদীর কালের গাছ
ব্যাল ঝুমঝুম করে
কার বাপের সাধ্য আছে
ব্যালটা ছিঁড়ি আনতে পারে। তারা

৬৭. একটা ছাগলের তিনটি মাথা
খায় লতা পাতা যায় অনেক দূর। উনান

৬৮. বন থেকে বার হল টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া
যদি টিয়া মন করে
দূর মাটি চুর করে। লাঙলের ফলা

৬৯. জঙ্গলের থেকে বার হল তুতি
তুতি বলে তোর পাত ভইর‍্যা মুতি। লেবু

৭০ হলুদের চমক
দুধের বর্ণ
এ শুলক যে না কইতে পারবে
গাধার জন্ম। ডিম

৭১. খোদার কি কাম
এক ঘরে এক খাম। ছাতা

৭২. কাঁচা কলার চা কেটে
পাঁঠার কেটে পা
লবঙ্গের বঙ্গ কেটে
পাঠিয়ে দিয়ে যা। কাঁঠাল

৭৩, মামার বাড়ীতে গেলাম
পিন্দনে জিনিস দিয়ে খেয়ে এলাম। কচুর লতি

৭৪. তুমি থাক জলে
আমি থাকি খালে
দুই জনেতে দেখা হবে মরণের কালে।
পোনা মাছ ও লেবু

৭৫. লোহার বালতী লোহার গাই
দিনাং ছেকি দিনাং খাই। কল

৭৬. বাবা ভাঙা মাওপাত করি
ভাই দুম বোনাই সুন্দরী। কুমড়া

৭৭. জঙ্গল থাকি বেরাইল মিণ্টার রায়
হস্ত নাই পা নাই হাঁটাত দাঁড়ায়। জোঁক

৭৮ দুই হাত দিয়া ধরিয়া ঝাঁপিয়া
চড়িয়া ঠেলিলে যায়
না ঠেলিলে না যায়। সাইকেল

৭৯. গায়ে তার ছেঁড়া কাঁথা
গলা ভাঙা তার কথা। ভেড়া

৮০. পাঁচ অক্ষরের এমন একটা খেলোয়াড়ের নাম বল, যার শেষের তিন অক্ষর কেটে দিলে একটা ফসলের নাম হয়,
আর প্রথম অক্ষর কেটে দিলে একটা পদবীর নাম হয়। কপিল দেব

৮১ নদীতে আছে মাছ
সে মাছ তো নয়
করোটে কাটে, সে করট নয়
নদীর সঙ্গে বাস করে, সে পুরুষ নয়। হাতের চুড়ি

৮২ গোড়াটা ধসা মদ্যরডা হল আচচা
মুখ দিয়ে বার হয়
ছায়া ছোড়, পাছা দিয়ে বার হল বাচ্চা। কলাগাছ

৮৩. একটা ঘরের দরজা নাই
মুখ আছে তার কথা নাই। কবর

৮৪. কলকাতার কল ধরিবার আছে হল
উপরে একটা লাউ টিক টিক
হল একটা জল। মোমবাতি

৮৫ চৌর পাঁকে নদী তোমরা
আসছেন কুদি। নৌকা

৮৬. চারিদিকে জঙ্গল মাঝখানে রাস্তা। সিঁথে

৮৭ কোন জিনিস কাটা যায় না? জল

৮৮. কোন দেশে মাটি নেই। সন্দেশে

৮৯. কোন সাগরে জল নেই। বিদ্যাসাগরে

৯০ কোন চিল ওড়ে না। পাঁচীল

৯১. কোন লাইট জ্বলে না। সানলাইট

৯২. আকাশ থেকে পড়ল টিয়া
সোনার টোপর মাথায় দিয়া। বৃষ্টি

৯৩. লক লক কর তুমি কিসের কারণে
তোমার জন্য আমার পৃষ্ঠে বন্ধন
সার গিদে বসিয়া তার গিদে ঘর
মরিবার যদি ইচ্ছা আছে। বক ও পুঁটি

৯৪. এক গোপাল ত্রিপদ গামী
সপ্ত ঘাটে পিয়ে পানী
নববৃক্ষের তল শোয়ে
দ্বাদশ গোপে গাভী দোয়
বল ইহার সংখ্যাগুলি
তবে তোমায় ধন্য মানি

৩ | ৩, ৭, ৯, ১২
১, ৭, ৩, ৪
=২৫২টা গোরা

৯৫. জলের নীচে শিমুল গাছ
কাঠটে লাগে বারোমাস। ছায়া

৯৬. অঙ্কুর বলেছিল অঙ্কুরের কথা
আশিটি তেঁতুল গাছে কতগুলো পাতা। একশত ষাট

৯৮. মা গর্ভে ছেলে ছাতা ধরে। সুপারী

৯৯. কালাকালা কে চুলি
দুইলে যে আমারে ছেঁচলি
জানিস না আমার জাতের ধারা
তুই কেন আমার পথে দাঁড়াস। তাল / সাপ
[তাল গাছের তলা দিয়ে সাপ যেতে গিয়ে
তাল পেড়ে সাপ আঘাত পায়]

১০০. চার অক্ষরে নাম তার
সর্ব লোকে চেনে
মাঝের দু অক্ষর কেটে দিলে
সবাই বিচরণ করে
দুই পাশের দুই অক্ষর কেটে দিলে
মরুভূমিতে চলে। নিউটন

১০১. খাইনা পান করি
তবু বলি খাই
দুই অক্ষরে নাম তার
কি বল ভাই। জল

১০২. পূর্ণিমায় ওঠে অমাবস্যায় ডোবে
এমন কি জিনিষ নামাকলেপারে। চাঁদ

১০৩. টিয়ার মত ঠোঁট যার
টি পাখী নয়, হাতি নয় মানুষ নয়
সব জীবই খায়। মশা

১০৪. এ ঘরের বুড়ি ও ঘরে যায়
কুটুর করে সুপারী খায়। সুপারী কাটার জাতি

১০৫. হাতও আছে পাও আছে
মানুষেরও কায়া
বৃষ্টিতে ভিজিয়া মরে
নেই বুদ্ধি হারা। বানর

১০৬. গাছের ওপর বীজ, বীজের ওপর গাছ। আনারস

১০৬. ডিম্ব ডিম্ব হাসের ডিম্ব
টিপ দিলে গলেনা, আছার দিলে ভাঙেনা। আনারস

১০৭. গোল কিন্তু রুটি নয়
কালো কিন্তু কয়লা নয়
মানুষ নয় তবু কথা কয়। রেকর্ড

১০৮. চিৎ করে ফেলে, উপুর করে করে
এমন করা করে, গয়না শুদ্ধ নড়ে। শিলনোড়া

১০৯ সাদা মিয়ার নোঙায় দাড়ি
তাকি আছে তোমার বাড়ী। রসুন

১১০. কোরলের মধ্যে কোরলের বাসা। নারকেল

১১১. বন থেকে আসল বুড়ি
হলুদ শাড়ি পড়ে
পুজায় বসল বুড়ি সাদাশাড়ী পড়ে। কলা

১১২. হাতুর বাধাল বাইশখান
চোরে নিল তিনখান
আর কি থাকে। থাকে না

১১৩. হাতে হাতে ঘষাঘষি, মধ্যে গেলে কষ্ট
ভিতরে গেলে কি আনন্দ
যদি বা বুঝে ভন্ড
পঞ্চাশ টাকা হবে দন্ড। শাঁখা

১১৪. হাসে কলকল, কথা বলে ঠারে
এ শ্লোকটা ভাঙতে গেলে অল্প কিছুক্ষণ লাগে। আয়না

১১৫. এ দিক পাছা ওদিকে পাছা
মাটিতে পাছা
তিন মাথা দশ পাও
তার কিছু রস খাও। গরু দোয়ানোর সময়

১১৬. মামারা খাইতে বইসে
কে যেন পাতের ওপর মুইতে দিল। লেবু

১১৭ ঢোকেনা ঢোকেনা ঢোকাও কেন
পরের মেয়েকে কাঁদাও কেন। শাঁখা

১১৮. পাপিষ্ট মাথাড়া বাড়ি আঙুল নাকটা
চক্ষু কর্ণ নাই তার মত জীব আর পৃথিবীতে নাই। মানুষ

১১৯. একজন প্যাসেঞ্জার
চার জনে ড্রাইভার
চার জনে একটি মরা বয়ে নিয়ে যাওয়া।

১২০. ছোট একটি গাছে রাধাকৃষ্ণ নাচে। লঙ্কা

১২১ ঘরের ভিতর ঘর
তার ভিতরে মানুষ। মশারী

১২২. লাল নীল চৌদ্দচরণ
মধ্য সমুদ্দর
দুই বুড়ি যুদ্ধ করে
একটা লেঙ্গুট। কাঁকড়া ও শিয়াল

১২৩ একটা বুড়ি খাই খাই
মানুষ দেখে দরজা লাগায় দ্যায়। শামুক

১২৪ একটা বুড়ার টিকাত খুড়ো। রসুন

১২৫ একটা খেত দিয়ে গোটাই ঘরটা
ঘিরাই মেলাই। মোমবাতি

১২৬ এক কাপ চা, দশ পয়সার বুট। যামবুট

১২৭ কপাল হইল গাড়িয়া
দুধ মারার জন্য বাচ্চি কিনলুম
তা হয়ে গেল আঁড়িয়া। মন্দভাগ্য

১২৮ টোপলা দেখলে টোপলি নাচে
নাই টোপলার বসি আছি।
মাথায় তেল না থাকলে কেহ তেল দেয়না।

১২৯. আগা ঝুমঝুম গোড়া মোটা
যে না বলতে পারে তার শাশুড়ীর গাছার ঢোতা। ঝাঁটা

১৩০. চতুর্দিকে বেত কাঁটা
মধ্যিখানে সাহেব বেটা। আনারস।

১৩১. আড়াই থেকে বেরোল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। মোচা

১৩২ উত্তর দিক থেকে আসলেন সন্ন্যাসী
গাছে বাড়ালেন কোটা
গাছের ফল গাছে রয়ে গেল
ছিঁড়া আইল তাঁর বোঁটা। শালুক

১৩৩. দিলে খায় না, না দিলে খায়। মুখা

১৩৪. উপর থেকে পড়লো ঢ্যাপ
ঢ্যাপ কয় প্যাট কাট। সুপুরি

১৩৫. সাদা মুরগা সাদা দাড়ি
চল মুরগা আমার বাড়ী। রসুন

১৩৬ দুইটা চাল, একটা বাতা। কলকাতা

১৩৭. কাটের গাই মাটির বাচ্ছুর
দুধ পড়ে তার টাপুর টুপুর। খেজুর গাছ

১৩৮. শুইতে গেলে দিতে হয়
যেটা মনে তর সেটা নয়। দুয়োর বা দরজা

১৩৯. আসিলাম বসিলাম
গুয়া পান খেলাম
ঢুকি দিতে উঃ আ
সন্ধ্যা হলে কি সুন্দর। শাঁখা

১৪০. কাটা কিটিলিং কাট শিটিলিং
চিকির চ্যাং করে
সেই জাগাতে ধরে
সেই জাগাতে করে। খিল

১৪১. একটা নারকেল গাছে আশিটা ডইগা
একটা ডালে আশিটি করে কাক
একটা কাকের মুখে এক ছটাককে বোন
মোট ঐ গাছে কতটা করে ধান আছে। ১৬ ছটাক = ১ সের

১৪২. আকাশ থেকে পড়ল ধুম
ধুম বলে আমার পা সোন। তাল

১৪৩. চার ভাই খুটুর মুটুর
দুই ভাই বমিনা ঠাকুর
দুইভাই মন্দিরা বাজাই
এক ভাই চরণ হাগের। গরু

১৪৪ মানুষ খাই গরু খাই
বাঘ কিন্তু নয়
বনে বনে ঘুরে বেড়ায়
সন্ন্যাসী ও নয়
কৃতি সুরে গান গায়
বাঁশি কিন্তু নয়। মশা

১৪৫ কোদাল কুড়ুল বাইশখান
চোরে নিয়ে গেল দুইখান
আর কয়খান থাকল। একটা

১৪৬. আনদন ঘরত বান্দর নাচে
না না কারণে আরো নাচে। জিহবা

১৪৭. লাল ডাটার পাতাটা
ছুঁইতে টাকাটা

১৪৮. উল্টা পাছা পালটা পাছা
হাটুৎ পাছা মাটিৎ পাছা
গরুর দুধ দোয়ার সময়কালীন অবস্থা

১৪৯. ছয় পুটকি বিশ পাও
এটা নিয়ে তোমরা দিমা পাও।
হাল দেওয়ার সময় (৪) গরু ও কৃষকের (২ জন) অবস্থা

১৫০. ঝিলিক ঠাডা ঝিলিক ঠাডা
ধান বানে আঠারো কাড়া
ফালায় ধান থাকে না
রাইত হইলে থাকেনা। হাট

১৫১. জঙ্গল হইতে বেরল বুড়ি
জঙ্গল হইবে তার আঠেরা কুড়ি। আনারস

১৫২ আটু জলে মাটু ফুল
দিটে পানি ফুটে ফুল। ভাত

১৫৩. দশে দৌড়াই দুয়ে মারে। মাথার উকুন

১৫৪. মাচার ভিতর ফ্যাচার দাও,
তিন মাথা ছয় পাও। পালকি

১৫৫. ইক রেগো করমর মাকরে পোশ আঁশ
ফল নাই গোটা নাই, ধরে বারো মাস। গান

১৫৬. এক ঘর টান দিলে বাপ গরলরে
কুকুরে ডিম ভেসে ফিরে। দুধের মাখন

১৫৭. শাক নদীর মাছ নাই
মাছ আছে তো পাঁক নাই। নারকেল
তাহার গু সর্বলোকে খায়। ডাউল ভাঙ্গার যাতা

১৫৮. হাত নাই পা নাই
চাল চালাইয়া খায়
কাটলে মাংস নাই
সর্বলোকে খায়। জল

১৫৯ নাক দৈত্যের বান্যা
নঙ্গ দৈত্যে নীল
পরম যত্নে বেড়ায় নিয়ে রাখল। সর্দি

১৬০. পাঁচ বেড়ায় তুলে দিল, বত্রিশ বেড়ার ঘাড়ে
একলা বুড়া বেড়ায় ঠেলে নিল ঘরে। জিহ্বা

১৬১. ঠকালে ঠকিতে হয় বিচিকিনে করি
কাটলে খাই দিলাম চিতল গঞ্জে
গুমাইদি আইরা বাড়ী
আকাশ থেকে পড়ল বুড়ি
রক্তে ছড়াছড়ি। কালোজাম

১৬২. জঙ্গল থেকে আসল বুড়ি
বুড়ির গায়ে হাজার বুটি। আনারস

১৬৩. গাছের উপর বীজ বীজের উপর গাছ। আনারস

১৬৪. এক গাছে এক ফল
পাখি করে টলমল। আনারস

১৬৫. পেট আছে নাড়ি ভুঁড়ি নাই
গলা আছে মুখ নাই। ঘট

১৬৬. একটি কালো গরু
ঘটে ঘাটে জল খায়। বর্শি

১৬৭. উঠতে ঝকমক বসতে পাহাড়
লক্ষ্য জীব মারে করে না আহার। জাল

১৬৮. সাদা জন্ম কালা করম
মাথায় তার দশ হাত লেঙ্গট। জলে

১৬৯ দশ শিরা আদেসার নয় রাবণ
রমণীর হাতে তার হয় যে মরণ। ঝিঙা

১৭০. হাটে যাবেন স্বামী ধন
কোথা যাও শুনি
একখানা জিনিসের
তিন কোণা নাম
তাকেই আনো কিনি। তিন প্রকার মাছ
হিদল, শুটকি, এমনি মাছ

১৭১. ফুল বিস্তর
ফল বারোটি পাকলে একটি। ১২ মাস

১৭২. আত্রি প্রভাত কালে রজনী সন্ধ্যার
তার পেটে জন্ম তারই মাংস খায়
হাতির মতন শুঁড় তার চলে ছয় পায়।
পামের ভিতরে যে পোকা যায়

১৭৩. চার আঙুল চেপটা
মারতে খায়
থিরথির বাইলে
দেখিবার ভাল। গচা বা ল্যাম্প

১৭৪ কথার নাই মাথা
ব্যাঙে দই চিড়া খায়
বাপের মিয়াও নাধ হইতে
বেটার নাওয়ের যায়।
নাওয়ের খানে বিয়া। কলাগাছ

১৭৫. বাজালে বাজে, সাজালে সাজে
হেন ফুল ফুটিয়াছে বাজারের মাঝে। মাটির কলস

১৭৬. দুল দুল দোলনী
ছোটবেলা খেলনী
পাকিলে সুন্দর হবো
লেপটা হয়ে বাজারে যাবো। তেঁতুল

১৭৭. গাছে উপর আছে খুটা (কাঠ)
গায়ে হল মল দুধ মিঠা। মৌচাক

১৭৮ টিক টিকা ভুই নিকা
ছয় চক্ষু তিন টিকা। লাঙল ; গরু ও মানুষ

১৭৯ কোন পাতালে মানুষ থাকে। হাসপাতালে

১৮০ কোন ফুলে পুজা হয় না। বিউটি ফুল

১৮১ কোন মাছ বাচ্চা আর দুধ দেয়। তিমিমাছ

১৮২ কোন শাড়ী পড়া যায় না : মশারী

১৮৩. তোমারা আছো ভালত
হামরা আছি খালোত
একদিন কালে দেখা হবে
মরণ কালত। মাছ মরিচ

১৮৪. চল্‌রে ভাই পাহাড় যাই
পাহাড় যাইয়্যা লেবু খাই

১৮৫ যাচ্ছি তো দিয়ে যা। দরজা

১৮৬. চামড়ার বন্দুক
হাওয়ার গুলি
মেরে দিলে ফাকে
জেলে যাবে নাকে। পাদ

১৮৭. দুপা ধরিয়া
আপন কাজ করিয়া
ছাড়িয়া দিলাম তারে। জাতি

১৮৮ পরের কোণা আটি বাটি
নিজের কোণা চিমটি কাটি। কৃপণ লোকের যে অবস্থা হয়।

১৮৯. একটু একটু বাচ্চাগুলো দুধে ভাতে খায়
টিকার মধ্যে চিমটি দিলে বহুদূরে যায়। টর্চ লাইট

১৯০. তুড়ুক তুড়ুক নাচে
তোমার বাড়ী কি আছে ? ছাড়ু / ঝাড়ু

১৯১. মরা জেতা খায়
ভিতরে যাইয়্যা ধরমরায়। টেপাই মাছ ধরার যন্ত্র

১৯২. গাছের আগায় পুষকোণি
খায় ভুর ভুর করে
রাজা আয়ে বাদশা আয়ে
উঠবে সেলাম করে। ভাবা

১৯৩. ছোটো খাটো লোকটা
দাড়ি মোচ্ নড়ে
ঘর থেকে বের হয় না
মুরগীর ভয়ে। আরশোলা

১৯৪. ঘরের ভিতরে ঘর
তার ভিতরে গান করে লতা মঙ্গেশকার। মশা

১৯৫ কোন খাওয়ায় পেট ভরে না। মার খাওয়া

১৯৬ দাঁ-কাটারি বাইশ খান
চোরে নিল তিনখান
বাকী থাকে—উত্তরটা। একটিও না

১৯৭ ছায়ায় ছায়ায় হাটে যায়
গোটা গোটা মাছ খায়। ছাতা

১৯৮ চারটে শিশি উবুত করা
তাতে ত আছে মধু ভরা। গরুর বাঁট

১৯৯. একটা গাছে তিনটে নারকেল
পাড়ান্তরে বাপই খায়
তোমরাও দুই গপ্পে
আমরাও দুই গপ্পে
গোটায় গোটায় খায়। দাদু বা নাতি

২০০. কপাট কপাটি বরণ দুই
বিরা চোদ্দ চরণভূমি
বিরা উচিয়া কয় উনায় কেমন কতা
দুই বিরা যুদ্ধ করে একটা মাথা। কাঁকড়া ও শিয়াল

২০১ ধোপাও ধুতে পারে না
দর্জিও সেলাই করতে পারে না। কলাপাতা

২০২. চিক চিকা ভুঁই নিকা
তিনটিকা দুই চোকা। দুইটি গরু ও একটি মানুষের জমিচাষ

২০৩. আই আই আই
ঘর আছে তার দুয়ার নাই। ডিম

২০৪ একটা বুড়ী পেটটা ক্যারা। গম

২০৫ ইরুবাস বিরুবাস
বাপ কেকেরা
সোনার চাইলন বাতি
মানসিক কামড়া। বোলতা

২০৬ তিনপাকে তিনটে বাশের মোড়া
মদ্যাতে ভাদুবুড়া
ভাদুবুড়া ডিমপাড়ে চাওয়ার ছোটে
আশা করে। ভাত

২০৭. আই আই আই
ঘর আছে তার দুয়র নাই। মশারী

২০৮. উপরে লাল
তলে ধলা
তাক কড়ি চাষাভূষা
পণ্ডিতে বুঝোলো। কলাই

২০৯. লম্বা বাবার পেছুটা ছান্দা। শিকা

২১০. উপর থেকে পড়ল বুড়ি
বুড়ি বলে ঘুরিঘুরি। বাঁশের পাতা

২১১ এক ভাই সাগরে
এক ভাই নগরে
এক ভাই নিমাপিনা আগালে। পান, চুন, সুপারী

২১২. আড়াবাড়ি থাকি
বিড়াইল জোকস
মাথা করে ঠোকঠোক। জোঁক

২১৩. একটা গাছ ঝাপুর ঝুপুর
তল দিয়ে যায়
কালা পুকুর। উকুন

২১৪. এক নালাটি পিরপির ঘাটি
গালত ঘুঘুরা
মাথায় ছাতি। সুপারী গাছ

২১৫. ইন্তির গাজত ফিন্তি নাচে
সুজন ঠালোর ঘুঘু নাচে
ফিরিয়া দেমং মরিয়া আছে। খই

২১৬. মধ্যমদীত্ত ফেলালুং ছাই
দৌড়ি আসিল কালাগাই। জোঁক

২১৭. তিন বীরের তিন বর্ণ
ছয় চক্ষু চার নাক
বল কন্যা শ্লোকের অর্থ
ষোল পদে একটা ন্যাটো।

মানুষের দুটো পা, শিয়ালের চারটি পা, কাঁকড়ার দশটি পা, শিয়ালের একটাই লেজ

২১৮ পাপিণ্ট মাথাডা
দুহাত কুড়ি আঙুল নাকটা
চক্ষু কর্ণ জিহ্বা তার নাই
এই রকম জন্তু কি দেখিয়াছো ভাই। মানুষ

২১৯. তিনতেরও আরো বারো
নয় দিয়া পুরণ করো
মোর সোয়ামীর এই নাম
পার করে দাও নাইরের যাই। ষাইট

২২০ জলের ওপর তালের গাছ
তাতে ব্রহ্মার বাসা
কেউ পায় কেউ পায় না
ছাওয়া ছোট আশা। ভাত

২২১ আদুরাইলে ভাঙ্গেনা
টিপিলে মরে না। ভাত

২২২ তলে কাঁসা উপরে কাঁসা
তার তলত লাল তামসা। মুশুরেডাল

২২৩ এক অক্ষরে একটি গাছের নাম। 'ধ'

২২৪ ওদরং গোবর
গোদরং শিং
ঝড়ঝনাৎ পাড়েনিন। কাঁকড়া

২২৫. তিতরি মিরমিরি পাত
বুঝিবার না পালু তাক

তুই মরলু মাকো মারলু
গিবির করলু হিত
শাক পাতায় চাষাভূষা
পণ্ডিতে না পায় ষিত। ফাঁদ, আধার, বক

২২৬ কোলার আছে আয়না
বৌ দেখা যায় না
লাঙ্গল কাঁপ্যে পুঁটিমাছ ঝাপুপে। কোকিল

২২৭ সোলার মত ভাসে
লোহার মত ডোবে। ব্যাঙ

২২৮. অডিম পাখি বেথুলাশাক
কোন জন্তুর আঠারো নাক। টাঁকিমাছ, ঢেঁকিয়াশাক

২২৯ খাইলে মোটা
না খাইলে মোটা। কলা

২৩০ দশ ভাই পিট্টাই
দুই ভাই ধরে
তালা পুড়ে বিচার করে
লাখ পুড়ে মারে। উকুন

২৩১ বকবক বকিলে ঠকঠক ঠকিলে
চার মাথা বারো ঠ্যাং
কাহা দেখিলে। দুটো মানুষ দুটো গরু

২৩২ বনসিয়া বাড়ী থেকে বিড়াল টিয়া
সোনার টুপি মাথায় দিয়া। মোচা

২৩৩ গেলু তাই গেলু
মোর কানটা কেটে মরে গেলু। তালাচাবি

২৩৪. দুইখান চালের একখান বাতা। কলাপাতা

২৩৫ তিন পাশে তিনটি বাঁশের মুড়া
মধ্যাতে ভাদুবুড়া
ভাদুবুড়া ডিমা পাড়ে
ছাগুলা আশা করে। ভাত, উনান

২৩৬ দুহাতে মামাচি ধরে
ঝাপে উঠে ঝুকুত চরে
হাটু ঝাকাইলে কাজে হয়
না ঝাকাইলে নয়। সাইকেল

২৩৭. ছোট থেকে মানুষ কইরা
জলে ভাসাইলাম
গমড়া বেচে চাল আনে
হাড্ডি পুড়ে ছাই। পাটের গাছ

২৩৮. গাছটা ফলফলা
ফলটা কাচাকণা
কার্পাস কালাই করেঙ্গা। কার্পাস তুলার ফল

২৩৯ না দিলে বলে না
দিলে খাইনা। তেজপাতা

২৪০. একে কোনা বাপই
যারা গায়ে আট-ই। কাঁঠাল

২৪১ হাতির মত দেহটা
খাইতে খাইতে বোনটাটা।
ঘরের পালার ভিতর যে বংশ দেওয়া তাকে থাকে বলা হচ্ছে

২৪২. হিস্তি গেলুং হুস্তি গেলুং
গেলুঙ মড়ার ঘাট
ঐ কেক শুকে দেখিয়া আসলুম
তিন কোণীর দাঁত। উনান

২৪৩ এ্যাস্তে কোণা চেংড়া
বড় বড় গাছে লাগাই নেংড়া। মাকড়সার জাল

২৪৪. একটা মামা তার ভিতরে
অনেকগুলো জামা। পেঁয়াজ

২৪৫. লতা লতিয়ে লতিয়ে যায়
লতা চোখেতে কামড়ায়। ধোঁয়া

২৪৬. যাকে কাটে সে কাঁদে না
যে কাটে সে কাঁদে। পেঁয়াজ

২৪৭. ফলগুলা ঝুমুর ঝুমুর
থাল নিয়ে গেল চোরে
বৃন্দাবনে আগুন লাগিছে
বাহী নিবির পরে। সূর্যের আলো

২৪৮. উপরে বাড়ী গেলুং
লাল নাটিটা হাড়িয়ে আসলুং। পানেরপিচ

২৪৯. একটা বুড়ী হাট যায়
মানুষ দেখলে চিমটায়। লাউ

২৫০ বুড়োবুড়ি হাট যায়
ঠোকর ঠোকর ভাঙ খায়। দুটো শিং

২৫১. জঙ্গল বাড়ী থেকে বেরোল শাপ
নেকু ধরি এক পাক
গরীবরা ফেলে দেয়
বড়লোক পকেটে ঢোকায়। কফ

২৫২. দেখতে তার গোলগাল
পেটের ভিতর হাতটা
বলে তা নড়ে না। ঘড়ি

২৫৩. এক অক্ষরে দুটো ছেলে-মেয়ের নাম। চন্দ্রবিন্দু

২৫৪. এক গোপাল ত্রিপদ গামী
সপ্ত ঘাটে পিয়ে পানি
নব বৃক্ষের তলে শোয়
দ্বাদশ গোপে গাভী দোয়
বল ইহার সংখ্যাগুলি
তবে তোমায় ধন্য মানি।
৩ | ৩, ৭, ৯, ১২
১, ৭, ৩, ৪
=২৫২টি গরু

২৫৫ ধোপায় ধুতে পারে না
দর্জিও সেলাই করতে পারেনা। কলাপাতা

২৫৬. চিক চিকা দুই নিকা
তিন টিকা, ছয় চোককা।
দুইটা গরু ও একটি মানুষের জমিচাষ।

২৫৭: এমন না দেখি বৃক্ষ অগমে তার বাস
ডালপত্র নাহি তার না লাগে বাতাস
সেই বৃক্ষের ডাল যদি পার পাঠাইতে
প্রণয় করিব তবে তোমার সাক্ষাতে। ভ্রূণ

২৫৮. রাম অবতারে ধনুক ধরি কৃষ্ণ অবতারে বাঁশি
রামের অভক্তি না হলে কি নারদের কাঁধে আসি? বাঁশ

২৫৯. অকট চন্দ্র বিকট দন্ত প্রথম অক্ষর 'ক'
মাঝের অক্ষর জানিনে ভাই শেষের অক্ষর 'ত'। করাত

২৬০. রাম নয় লক্ষ্মণ নয় মাথায় আভরণ
দেবকী নয় বসুদেব নয় গর্ভে নারায়ণ
রাম নয় লক্ষ্মণ নয় শেল মারে বুকে
কন্যা নয় পুত্র নয় চুম্বন দেয় মুখে। হুঁকো

২৬১ চারটি হাঁড়ি রসে ভরা
আঢাকা তাই উপুড় করা। গরুর বাঁট

২৬২. নামটি আমার বিশ্বকর্মা
বাড়ি আমার সুরপুরে
'বাইশে' পা কেটেছি
যাচ্ছি আমি ধীরে ধীরে। ছুতোর

২৬৩ হাতীর উপর হাব্দাখানা
তার উপরে পাখাটানা
তার উপরে ছপর খই
তোরা এলি তারা কই ?
তারা আসবে দুদিন বই। সজিনা গাছ, পাতা, ফুল ও ডাঁটা।

২৬৪. মাধবপুরে বাড়ি আমার
কেশবপুরে চরে
হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়ে
লক্ষ্মণপুরে মারে। উকুন

২৬৫. ইজ বেগুনের বীজ নাই
খাই বেগুন, রুই নাই। পোয়াল ছাতু (মাসরুম)

২৬৬. কোথা যাচ্ছিস খরখরানি
চুপ করলো দলদলালি
গেরস্থর বৌ শুনতে পেলে
মজিয়ে দেবে এক্ষুণি। বেগুন ও কৈ মাছ

২৬৭ ঐ আসছে কেলে / আমায় ধলে মেলে। জাল

২৬৮ একটুখানি জল চাবি আঁটা কল। ডাব

২৬৯. হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
আকাশ সমান দাড়ি
জল করে থৈ থৈ
বিনা দুধে বসে দই। ডাব

২৭০. তুই যে এত বুদ্ধিমান
কোন ঠাকুরের তিনটি কান। উনুন

২৭১ বাবুদের বাগানে পাতিহাঁস
থাই খোলা ফেলি'শাঁস। চালতা

২৭২ হাতে আছে হাতে নাই
হাত বাড়ালে পাই নাই। কনুই

২৭৩ ই-আল উ-আল করে
না ডিঙুতে পারে। চোখ

২৭৪ পাতা আছে ডাল নাই
জল আছে মাছ নাই। চোখ

২৭৫ ছোটবেলায় কাপড় পরে
বড় বেলায় ন্যাঙটা। বাঁশ পোঁক

২৭৬. রুইলাম কালো জিরে
হল শাল ডাণ্ডা
ফুটিল পারুল ফুল
হল কামরাঙ্গা। তিল

২৭৭ সাদা জমিখানি
কালো জিরে বুনি
নাম সুরধান
যাবে অনেকখানি। চিঠি

২৭৮ তিন অক্ষরে নাম তার
ঝোলে বৃক্ষ ডালে
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে
ভাসে গঙ্গার জলে
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে
মীনের মরণ
শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে
সবার ভোজন। আমড়া

২৭৯. জ্যৈষ্ঠতে জনম মোর ভাদ্রেতে মরণ
তিনদিন তিনরাত জলেতে শয়ন
একদিন সেনাপতি মারিয়া না মারে
দেখা হলে ফিরে তারা
কাটাকাটি করে। শণ

২৮০ দিলে খায়না
না দিলে খায়। গরুর জালি

২৮১. লতানো লতিয়ে লতিয়ে যায়
সর্বাঙ্গ থাকতে তাহার চক্ষু দুটি খায়। ধুঁয়া

২৮২ বাঘ খায় মানুষ খায়
বাঁশ বাগানে বাঁশি বাজায়। মশা

২৮৩. এরা বাপ বেটা ওরা বাপ বেটা
তালতলা দিয়ে যায়
একটি তাল পড়লে
সমান ভাগ পায়। তিন এঁটে তাল।

২৮৪. নাম আমার বিশ্বকর্মা
বাড়ি সুরপুরে
বাইশে পা কেটেছি
যাচ্ছি আমি ধীরে ধীরে। ছুতোরের 'বাইশ' মাপক যন্ত্র

২৮৫. এক রত্তি ঘরে, ঘোড়া ধড়ফড় করে। খৈ

২৮৬ চারকোন পুকুরটি / টুবুক টাবুক করে
মতিলাল পাখী এসে / আনাগোনা করে। মশারি

২৮৭. ঘর আছে তার দুয়ার নাই
মানুষ আছে তার কথা নাই। কবর

২৮৮ ঘষর ঘষর ঘষ্‌তো
তিনপুলি তার দশ পা। লাঙল

২৮৯. উপর থেকে আসছে সাদা কাপড় পরে
পুজো করতে বসল বামুন মাথা হেঁট করে। বক

২৯০. উপর থেকে পড়লো দুম
দুম বলে তার পোঁদটা শুঙ্‌। তাল

২৯১. একটুখানি মামা
গায়ে গুচ্ছের জামা। পিঁয়াজ

২৯২. চামড়ার জাঁতি
চুপ করে কাটি। পায়খানা

২৯৩. কাঠের গাই মাটির বাছুর
দুধ দেয় সে হুচুর হুচুর। খেঁজুর গাছের রস দেওয়া

২৯৪. প্রথম হল তার দুটি করে পাতা
তার পর হৈল তার ছাতা পারা মাথা
পবনের হাওয়াতে মুলসুদ্ধ চলে
কবি কালিদাসের বৌ চাল ধুতে ধুতে বলে। পানা

২৯৫ এক রতুন বুড়ি
গা ময় ফুসকুড়ি। উচ্ছে

২৯৬. কাঁচায় তলতলে পাকায় সিঁদুর
যে না বলতে পারে সে খায় বুড়ো ইঁদুর। মাটির হাঁড়ি

২৯৭. ঝামরি ঝুমরি গাছটি
তার নীচে খামারটি
তার নীচে ডবর ডবর
তার নীচে সকর সকর
তার নীচে বকর বকর। মুণ্ডু

২৯৮ নাড়ালেই বাড়ে। চুলকানি

২৯৯ ছুটে গেল পেট ফুলিয়ে এল। লুচি

৩০০. উঠলো ডুবলো ঢ্যামনা সাপ
যে না বলতে পারে তার চোদ্দটা বাপ। ভুঙ্গি

৩০১ মাঠের নিম গাছটি / নিম ঝুর ঝর করে
এমন শালা বেটা নাই যে / কুড়িয়ে শেষ করতে পারে।
পোস্ত

৩০২ বন থেকে বেরোল টিটি
টিটি বলে ভদ্দোলোকের পাতে মুতি। লেবু

৩০৩ একটি বাগানে সবাইকে ঢুকতে দিচ্ছে
অথচ 'কাউ'কে ঢুকতে দিচ্ছে না। গরু

৩০৪. এপারে দেহ রইলো / ওপারে বুড়ি বেড়াতে গেল। লতা

৩০৫. বিছানার শেষ নাই / শুয়ে আর পারি নাই। আকাশ

৩০৬. এতবড় বিছানা / কেউ তো শোয় না
এত ফুল ফুটেছে / কেউ তো তোলে না। আকাশ ও তারা

৩০৭ নীচে গঙ্গা মাঝে ব্রহ্মা
ওপরে কালা। লন্ঠন

৩০৮. বাবা গেছে আকাশে ঘাই বাঁধতে
দাদা গেছে বোকাকে বুঝুতে
দিদি গেছে একটাকে দুটো করতে
মা গেছে ছোটকে বড়ো করতে।
ঘর ছাওয়া, টিউশনি, কলাই ভাঙা, মুড়ি ভাজা।

৩০৯ একটি লোক ৩০টি মিষ্টি কিনে খেতে (ক্ষেতে) খেতে (ক্ষেতে) আসছে। বাড়িতে আসার পর কটি মিষ্টি থাকবে। ৩০টি

৩১০. পেটে খায় পিঠে চলে। নৌকা

৩১১ পুবে বাড়ি, পোঁদে দাড়ি
পেটে দাঁত ভাত খায়নি ছমাস।
সুর্য্য, পানা, লাউ, অন্নপ্রাশনের আগে পর্যন্ত

৩১২ ষোলশো গোপিনী একটি মাত্র পিঠে
তার দুধটাও মিঠে। মৌমাছি, মৌচাক ও মধু

৩১৩ এক ঘটি জল দুরঙা। ডিম

৩১৪ চারটি পায়রা চার রঙ
খোপে ঢুকলেই এক রঙ। পান, চুণ, সুপারি, খয়ের

৩১৫ ভাতের ধান কোথায় রাখে ? থালার কানায়

৩১৬ দিনের বেলায় দেখা শোনা
রাতের বেলায় বিয়ে
সকাল বেলায় উঠে দেখি
ছেলে কোলে নিয়ে। ডিম

৩১৭. নাকুবাবুর ছেলেটি পাঁচুবাবু নেয়
এমন সুন্দর ছেলেটি ধুলোয় ফেলে দেয়। শিকনী

৩১৮ এ ঘর যায় ও ঘর যায়
ভিট ভিট কাছাড় খায়। ঝাঁটা

৩১৯ মামাদের লাল গাই
যা দেয় সব খায়
জল দিলে মরে যায়। আগুন

৩২০. এমন কে শয়তান
নাকে বসে ধরে কান। চশমা

৩২১ সাত ভাতারী সাবিত্রী। অরুন্ধতী
পাঁচ ভাতারী এও। দ্রৌপদী
বাপ ভাতারী বলে গেছে। সীতা
ভাই ভাতারী মেও। সুভদ্রা

৩২২. ধুন লুকা কালো ঢুকা। বেগুন

৩২৩ এতটুকু জলে লাল বউটি চলে। মুসুরির ডাল

৩২৪. হাত চামটা কলুই ঘাটা
পাঁশ মাখালে দুকান কাটা
ত্রিভুবন দেখালে চিলে ব্যাটা
ঢের দেখেছি টিপটিপর ঘা
তুই ব্যাটা ঘরকে যা।

একটা ল্যাটা মাছকে একজন কলুই-এ করে ধরেছে। তারপর বাড়িতে এনেছে বৌ পাঁশ মাখিয়ে বাছার সময় চিলে নিয়ে যায়। আবার চিলের পা থেকে পুকুরে পড়ে যায় মাছটি। তখন একজন ছিপ নিয়ে নাড়ালে তার উদ্দেশে মাছটি একথা বলেছে।

৩২৫. তেল কুচকুচ পাতা
ফলের ধারে কাঁটা
ফলগুলো তার মধুর মিষ্টি
বীজগুলি তার গোটা। লিচু

৩২৬. মা লতা, বাবা ছাতা
দিদি হলদেমুখী দাদা ধাকুর ধুমো। কুমড়ো গাছ

৩২৭. উজু উজু উজু
ঘাস বনের জুজু। কাস্তে

৩২৮. হায় আসছে কাকা
ছুঁইয়ে দিলেই টাকা। কেম্নো

৩২৯. আমি আছি জলে তুমি আছ ডালে
এক সঙ্গে দেখা হবে উনুনশালে। মাছ ও তেঁতুল

৩৩০. ঘট পুকুরি উবুদণ্ড
পাতাটি তার খণ্ড খণ্ড। বাঁধাকপি

৩৩১ একখুঁটি চার চাল। ঘুষুনি শাক

৩৩২. পাখা নাই ওড়ে
মুখ নাই ডাকে। আকাশ

৩৩৩. ঝামরি ঝুমরি গাছটি
ফল ধরেছে বারোটি
পাকলে হয় একটি। বছর

৩৩৪. কাঁচায় কাঁচ পাখীতে খায়
পাকায় ছড়াছড়ি যায়। ডুমুর

৩৩৫. স্বামী-স্ত্রী মিলে বাইশটা কান। রাবণ-মন্দোদরী

৩৩৬. রাম বলে ওরে লক্ষ্মণ
একটী ফলের ধাঁচা
অগ্নির ভিতরেতে
তবুও ফল কাঁচা। নাভি

৩৩৭. রাবণের দশশির পড়ে আছে মাঠে
নিশ্চয় মরিবে সে রমণীর হাতে। ঝিঙে

৩৩৮. মা দিচ্ছে বাবা কচ্ছে।
মা মাটি দিচ্ছে বাবা কলসী করছে। কুমোর

৩৩৯, গুড়ুর গুইমা কাঁধে যায়
বিনা দোষে মার খায়। ঢোল

৩৪০. লম্বা বাবার পেছুটা ছান্দা। শিকা

৩৪১. হুকুড় কুজায় কুড়ে মাটি
দশ ঠ্যাং তিন ভুঁটি। একটা লাঙ্গল, দু'টা বলদ, একটি হালুয়া

৩৪২ এত সুন্দর মড়াটি
কান্দ নাই কেন ?
এত সুন্দর ফুলটি
তুল নাই কেন ?
এত সুন্দর বিছানাটি
শুয় নাই কেন ? মাছ, সূর্য, জল

৩৪৩. শিব নয় সন্ন্যাসী নয়
মাথায় আছে জটা
স্ত্রী পুরুষে দেখা নাই
কাঁখে আছে বেটা। জনার

৩৪৪. একাই একাই ফলে
একই সঙ্গে পাকে। কুমোরের হাঁড়ি তৈরী

অধ্যায়/তিন

শিশুর ছড়া ঃ রস ও সৌন্দর্যের চিরন্তন আকর

লোকসাহিত্যের কথা বললেই প্রথমে যে তিনটি উপাদানের কথা আমাদের মনে জাগে, সেগুলি হল প্রবাদ, ধাঁধা ও ছড়া। প্রবাদকে যদি বলি জ্ঞানের ভাণ্ডার তবে ধাঁধাকে বলতে পারি বুদ্ধির ভাণ্ডার। সেক্ষেত্রে ছড়াকে অভিহিত করতে হয় রস ও সৌন্দর্যের ভাণ্ডার বলে। এই তিন উপাদানের শ্রোতা, স্রষ্টা এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য। কোন অল্প বয়স্ক শিশু বা বালকের মুখে প্রবাদ বাক্য শোনা যায় না। কেননা জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে যেমন প্রবাদ সৃষ্টি সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় প্রবাদের প্রয়োগ অথবা ব্যবহার। তাই প্রবাদের স্রষ্টা পরিণত বয়স্ক মানুষ, শ্রোতাও পরিণত মনের মানুষ। ব্যবহারকারীও তাই।

ধাঁধার স্রষ্টাও কিছুটা পরিণত মনের অধিকারী মানুষ। তবে সে মানুষের সাযুজ্য বোধ প্রখর। তাই পরিচিত বিষয়কে দিব্যি অপরিচিতের অবগুন্ঠনে আবৃত করে উপস্থাপিত করা হয়। মূলতঃ যাদু শক্তি এবং লোকাচার সম্পৃক্ত হওয়ায় ধাঁধার স্রষ্টাও পরিণত বয়স্ক মানুষ এবং যাদের উদ্দেশে এগুলি প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ শ্রোতৃমণ্ডলী তারাও পরিণত বয়সের। পরবর্তীকালে ধাঁধা তার সামাজিক গুরুত্ব অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে মূলতঃ বিনোদনের মাধ্যমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই বলে ধাঁধা শিশুর আস্বাদন-যোগ্য নয়। মূলতঃ বালক এবং কিশোর-এদের দ্বারা ধাঁধা আস্বাদিত হয়, চর্চিত হয়। সেই তুলনায় ছড়া একেবারেই শিশু সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্যই শিশু সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হলেও শিশু কখনও ছড়ার স্রষ্টা নয়। তার ভূমিকা শ্রোতার, আস্বাদনকারীর, আমরা এক্ষেত্রে ব্রতের ছড়াকে বাদ দিচ্ছি। কারণ তার সঙ্গে শিশুর কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া সেগুলির চরিত্র অনেক বেশি prosaic, ঐহিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, ঐহিকতা মণ্ডিত। মূলতঃ রমণীদের কামনা বাসনার কথাতেই তা পূর্ণ। ব্রতের ছড়ায় না মেলে তেমন রসের সন্ধান, না মেলে সৌন্দর্য। আসলে কামনা বাসনা যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে সেখানে সৌন্দর্য প্রকাশের অবকাশ বড় কম!

ছড়া সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা ছড়া শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের একটু হদিস নিয়ে নিতে পারি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা উল্লেখ করব আচার্য সুকুমার সেনের বক্তব্য। তিনি কবিতা, কবিতাছত্র কিংবা কবিতা ছত্রাংশ অর্থে ছড়া শব্দটির ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাননি বলে জানিয়েছেন। সেইসঙ্গে এও জানিয়েছেন যে ছড়া শব্দের ব্যবহার না থাকলেও এর ব্যবহার এবং চল ছিল সমাজে। সাধারণ শ্রোতাকে আকর্ষণ করতো মঙ্গল গান, পাঁচালী যাত্রায় বিধৃত গান আর কবিতা ছত্র। কবিতা ছত্র বা ছত্রের অংশকে ছড়া বলে প্রয়াত আচার্য মনে করেছিলেন। অবশ্য তিনি সুস্পষ্ট, দ্বিবিধ অর্থে ছড়া শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। (ক) প্রকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত বা ছড়ানো অর্থে। (খ) গ্রথিত বা গাঁথা এই অর্থে। তাঁর ভাষায়, "গানের মধ্যে মধ্যে ছড়ানো আর পর পর গ্রথিত এই তিন ছিল তখন ছড়ার বিশেষণ। তার পরে অর্থ হল ছুটকো, ছন্দময় রচনা।" কেউ মনে করেছেন ছটা থেকে ছড়া শব্দটির উৎপত্তি। ভাষাতাত্ত্বিক ভাবে এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে কেউ দেখিয়েছেন ছটা>ছডা>ছড়া। কারো মতে ছন্দ শব্দের অপভ্রংশেই ছড়া শব্দটি এসেছে। আমরা 'ছটা' থেকেই 'ছড়া' শব্দটির উৎপত্তি বলে নির্দেশ করতে পারি। ছড়া শব্দটি কারো কারো মতে দেশজ। কিন্তু যদি সংস্কৃত 'ছটা' থেকে এর উৎপত্তি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আর দেশজ বলে ছড়া শব্দটিকে অভিহিত করা যায় না। যাই হোক ছড়া শব্দের অর্থে কেউ বলেছেন গ্রাম্য কবিতা, কেউ বলেছেন শ্লোক পরম্পরা, বিস্তৃত পদ্য বিশেষ, অথবা কোন বিষয়কে নিয়ে রচিত গ্রাম্য কবিতা। আমরা ছড়ার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি—ব্যষ্টি রচিত হয়েও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট ছন্দবন্ধ পদ সমূহ যা নাকি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত হয়ে সমষ্টির সম্পদরূপে পরিচিতি অর্জন করে, যেখানে ছন্দ নির্মিতি কৌশল এবং অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশই মুখ্য, মূলতঃ শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জনের জন্য যা মুখে মুখে রচিত এবং মূলতঃ নারী কর্তৃক ব্যবহৃত, তাকেই আমরা ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি।

প্রতিটি মানুষের মধ্যে কম বেশি সৃজনী ক্ষমতা থাকে কিন্তু ভাব বা ভাবনা থাকলেও প্রকাশ ক্ষমতা সকলের থাকে না, কিন্তু সৃষ্টির আনন্দের সাধ সকলেই পেতে চাই। সৃষ্টির ব্যাকুলতা কম বেশি সকলের মধ্যেই। তাই দেখি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সব থেকে বেশি পাঠান্তর মেলে লৌকিক ছড়ায়। বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যার দাবী রাখে। ছড়ায় যেহেতু সুসংহত ভাব প্রকাশের বাধ্য বাধকতা থাকে না তাই অনেকেই বিশেষত ব্যবহারকারিণী নারীরা নানা সময়ে প্রচলিত ছড়ার রূপান্তর ঘটিয়ে থাকেন। কখনও বা কিছু পদ সমষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে, কখনও বা বিশেষ পঙ্ক্তির পরিবর্তন করে

ব্যবহার কারিণী নারী নিজের ইচ্ছামত মনোমত পদ, ব্যাক্যাংশ বা পঙক্তি বিশেষের সংযোজন ঘটিয়ে থাকেন। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি ছড়ায় ভাব বা অর্থের ধারাবাহিকতা রক্ষার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সেই সুযোগই ব্যবহারকারী বা কারিণীরা নিয়ে থাকেন। আর এইরূপে কিয়দংশে হলেও সৃষ্টির আনন্দ লাভ করেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে তাহলে কি ছড়ার পাঠান্তরের মূলে রয়েছে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন সাধন? এমন কথা কিন্তু বলা যাবে না। সব পাঠান্তর বা রূপান্তরের মূলেই একটি কারণ দায়ী নয়। অপরাপর কারণও রয়েছে। পূর্বে যখন গৌরীদান প্রথা সমাজে চালু ছিল, তখন অল্প বয়সে বালিকা বিবাহ সূত্রে শ্বশুরালয়ে গমন করত। তখন পিত্রালয়ে শ্রুত ছড়াও নিয়ে যেত স্মৃতিতে করে। স্থান এবং কাল ভেদে এই বালিকা বধূ পরবর্তীকালে যখন জননীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজের সন্তানকে ছড়া শোনাত, তখন বিস্মৃতির কারণে বাধ্য হয়ে পাদ পূরণ করতে হত পূর্ব পরিচিত ছড়ার।

আমরা জানি বাংলাদেশের সব অঞ্চলের ভাষা সমান নয়, আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জেলার ভাষায় বিদ্যমান। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ভাষার উচ্চারণগত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই এক অঞ্চলের ছড়া যখন স্মৃতি পথে অন্যত্র বাহিত হয়ে যায় তখন সেই অঞ্চলের মানুষই ঐ ছড়ার উচ্চারণে নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন একপ্রকার নিজের অজান্তে।

লৌকিক ছড়া মূলতঃ যা শিশুদের উপভোগের জন্য রচিত, শিশুদের উদ্দেশে রচিত, সেই শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রচয়িতা অথবা আবৃত্তিকারী নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো। কোন গৃহের শিশুকে পরিবারের সব সদস্যই এক নামে অভিহিত করে না। দেখা যায় শিশু নানা নামে নানা জনের দ্বারা অভিহিত হয়। ছড়াতেও শিশুকে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর এই রূপে ছড়ার রচয়িতা বা আবৃত্তিকারী শিশুর কাছে তার পুঞ্জীভূত অপত্য স্নেহকে উৎসারিত করে দিয়েছে।

শিশুর মনোরঞ্জন ব্যতীত শিশুকে ভোলাবার জন্য, তার অপছন্দের কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়ার তাগিদে, শিশুকে অন্যমনস্ক করতে তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য, নানা অবাস্তব অতি লৌকিক প্রাণীরও উল্লেখ করা হয়। এভাবেই ছড়াগুলির ক্ষেত্রে আমরা পাঠান্তর লক্ষ্য করি। বলা হয় 'Variation is the Crucial proof of folklore'. বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রে এই Variation এর প্রাচুর্য; এতে প্রমাণিত হয় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ছড়ার ব্যবহারই সর্বাধিক। বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে যে

পদচিহ্ন অঙ্কিত রেখা দেখা যায় প্রমাণ করে এই রেখা বরাবরই অধিক সংখ্যক পথিকের যাতায়াত। যে অঞ্চল দিয়ে মুষ্টিমেয় কদাচিৎ দু'একজন যাত্রী যায় সেখানে আর যাইহোক যাত্রাপথ রচিত হয় না। অনুরূপ ভাবে আমরা দেখি আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে, কিংবা ইকিড় মিকিড় চাম চিকির, বা আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো—এইসই বহুল প্রচলিত ছড়াগুলির পাঠান্তরের সংখ্যা বেশি। অন্যান্য ছড়ার তুলনায় এগুলির ব্যবহার যে অনেক বেশি স্বতঃই তা প্রমাণিত হয়।

পাঠান্তরের প্রসঙ্গ আলোচিত হবার পর এবার আমরা ছড়ার শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে আসতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে একবার বলেছেন 'মেয়েলি ছড়া', আর একবার বলেছেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার এই যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার লক্ষ্য ছিল দুদিকে—মেয়েদের দ্বারা যে ছড়া ব্যবহৃত হয় তাই হল মেয়েলি ছড়া, অথচ মেয়েলি ছড়ার ব্যবহার যে কেবলমাত্র শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য হয়ে থাকে তাতো নয়। অনেক ব্রতের সঙ্গেও ছড়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে দেখা যায়। অর্থাৎ শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যে ছড়া তার স্রষ্টাও নিঃসন্দেহে মহিলা আবার ব্রতের ছড়ারও রচয়িতা তারা। কিন্তু বিষয় ভেদে উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা ব্রতের ছড়া চরিত্রে বহুলাংশে Prosaic। একান্তভাবে তা ঐহিকতা বিষয়ক। সেখানে কবিত্ব করার কোন অবকাশ নেই। যখন রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ার কথা বলেন তখন বোঝা যায় তিনি বিষয়বস্তুর সঙ্গে উদ্দেশ্যের কথাও মনে রেখেছেন। অর্থাৎ শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য, তাদের ভোলানোর জন্য যে ছড়া তাই হল ছেলে ভুলানো ছড়া। আমরা তাহলে তিনদিক থেকে ছড়ার শ্রেণী বিভাগ করতে পারি। বিষয়বস্তুর নিরিখে, স্রষ্টার নিরিখে এবং ব্যবহার বা উদ্দেশ্যের নিরিখে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শ্রেণী বিভাগ (প্রবন্ধের নাম অনুযায়ী) পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা তিনি ব্রতের ছড়ার প্রসঙ্গ তোলেননি। আচার্য সুকুমার সেন মহাশয় ছড়াকে শ্রোতার বয়স, বক্তার অথবা শ্রোতার অথবা উভয়ের প্রয়োজন অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—ঘুম পাড়ানি, মন ভোলানি, খেলা চালানি। আচার্য সেন তাঁর কৃত বিভাগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "ঘুম পাড়ানি ছড়া গানের মতো তাতে সুর থাকবেই এছাড়া সাধারণত একপদী, দ্বিপদী হতে বাধা নেই।"

'মন ভোলানি ছড়া' প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল এতে 'কবিতার রূপ পরিস্ফুটতর। এবং তার ভাব সংহত হোক বা অসংগত হোক পরিপূর্ণ অর্থবহ'। আচার্য সেন 'মন ভোলানী' ছড়ার মধ্যেই খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক শিশুকে খাওয়ানোর জন্য বলা ছড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া যে ছড়ার মাধ্যমে শিশুকে ভুলিয়ে শান্ত রাখা যায় তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

একথা স্বীকার করতে হবে যে আচার্য সেন কৃত ছড়ার শ্রেণী বিভাগে কিছুটা নূতনত্ব আছে। অন্তত পক্ষে নামকরণে ; যেহেতু তিনি ছেলেমি ছড়ার প্রসঙ্গেই তাঁর শ্রেণী বিভাগকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাই এক্ষেত্রে ব্রতের ছড়ার অন্তর্ভুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবু তাঁর কৃত শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে কিছু সংশয় থেকে যায়। প্রথমতঃ ঘুম পাড়ানি ছড়াতেই যে সুর যুক্ত হয় তা নয়, হয়তো এক্ষেত্রে সুর কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়। কিন্তু তাই বলে 'মন ভোলানি' কিংবা 'খেলা চালানি' ছড়া সুর বিমুক্ত এমন কথা বলা যায় না। তুলনামূলকভাবে এ দুই ক্ষেত্রের সুর প্রয়োগ কিছুটা সীমিত এই পর্যন্ত। আসলে যে কোন প্রকার ছড়াই হোক না কেন তার উচ্চারণে সুর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে পড়ে। এমনকি খেলার ছড়াতেও আমরা সুরের সাহায্য নিই। আসলে বাকশিল্পের মধ্যে লোককথা এবং ছড়া উভয়ই সুরাশ্রয়ী। দ্বিতীয়তঃ—আচার্য সেন বলেছেন 'মন ভোলানি' ছড়া কিছুটা মেয়েদের ঘনিষ্ঠ আলাপে প্রলাপে একসময় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো। এক্ষেত্রে তিনি প্রবাদের বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন। প্রবাদ এবং ছড়া যে এক নয় তা বলাবাহুল্য। তবে এক্ষেত্রেও কিছু সুরের ব্যবহার অনস্বীকার্য। তৃতীয়তঃ 'ঘুম পাড়ানি' এবং 'মন ভোলানি' এই দুটি ছড়ার নামকরণ বিষয়েও সংশয় জাগে। কেননা একদিক থেকে ঘুম পাড়ানি ছড়াও কি মন ভোলানি নয়? কারণ শিশুর মনকে অন্য সব দিক থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিদ্রার জগতে আকৃষ্ট করতে যে ছড়া আবৃত্তি করা হয় তাও প্রকারান্তরে ঘুমোতে অনিচ্ছুক শিশুর মন ভোলানোর দায়িত্ব পালন করে। অবশ্য তাঁর 'খেলা চালানি' ছড়ায় কিছু নির্দিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা চলে। যেমন— খেলোয়াড় বণ্টনের ছড়া, খেলতে খেলতে আঘাত লাগলে সেই আঘাত উপশমের জন্য ব্যবহৃত ছড়া, ক্রীড়ারত শিশুদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে সেই বিরোধ মীমাংসাকল্পে ব্যবহৃত ছড়া কিংবা বিশেষ বিশেষ খেলায় সর্বপ্রথমে বিশেষ চরিত্রে প্রথমে কে অবতীর্ণ হবে তা নির্ধারণের জন্য যে ছড়া ব্যবহার করা হয় তাকেও আমরা খেলা চালানি ছড়ার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

আচার্য সেন কৃত এই বিভাগের বাইরে আর এক শ্রেণীর ছড়া রয়ে গেছে যেগুলিকে আমরা ঐন্দ্রজালিক ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি। মূলতঃ প্রাকৃতিক জগতে অভিপ্রেত অথবা অনভিপ্রেত ঘটনাকে অনিবার্য করার উদ্দেশ্যে অথবা প্রতিরোধ করতে এগুলির ব্যবহার হয়। যেমন গ্রীষ্মের দাবদাহে বৃষ্টিপাতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যবহৃত ছড়া। শীতে কুয়াশা ভেদ করে সূর্যালোক যাতে আত্মপ্রকাশ করে সেইজন্য বলা ছড়া ; অতিবর্ষণ প্রতিরোধে যে ছড়া আবৃত্তি করা হয় ইত্যাদি। অবশ্য এই সব ঐন্দ্রজালিক ছড়া যে কেবল শিশুদের দ্বারাই আবৃত্তি করা হয় তা নয়। অনেক সময় পরিণত বয়স্ক

মানুষও এই ধরনের ছড়া ব্যবহার করে থাকেন। এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ছড়ার শ্রেণীবিভাগ করতে পারি। পরের পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট কয়েকটি ছকের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করা হলো।

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি শিশুদের জন্য যে ছড়া রচিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা অবিমিশ্রভাবে শিশুদের উপজীব্য, এগুলি বয়স্ক মানুষদের কোন কাজে লাগে না। একমাত্র মাতৃস্থানীয়ারা শিশুদের উদ্দেশে ছড়া ব্যবহার করে শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করেন। আর তাতে তাদের ঘর গৃহস্থালীর দায়িত্ব পালন সহজতর হয়। যেমনটা আমরা দীর্ঘকাল ভেবে এসেছি যে রূপকথাগুলি একান্তভাবে শিশুদের উপভোগ্য, কিন্তু এখন গবেষকরা নূতন নূতন ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন আপাতভাবে যে রূপকথা নিছক শিশুদের উপভোগ্য বলে মনে হয় তার মধ্যে আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের অনেক উপাদান নিহিত আছে। বিশেষত সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক উপাদান। অনুরূপ ভাবে ছড়া থেকেও বহু উপাদান পাওয়া সম্ভব যে উপাদানগুলির সঙ্গে শিশুদের কোন সম্পর্ক নেই। সমাজ তাত্ত্বিকেরা ছড়া থেকে সমসাময়িক সমাজজীবনের নানা নির্ভরযোগ্য উপাদান পেতে পারেন, পেয়ে থাকেন! যেমন—শুধুমাত্র কন্যাপক্ষীয় যে বরপক্ষকে পণ দেয় তা নয়, কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কন্যাপক্ষ যে বরপক্ষ থেকে পণ নিত তার প্রমাণ পাই। কন্যার বিদায়কালে তার পিতা ক্রন্দনরত হলে কন্যা পিতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে তিনি পাত্রপক্ষের কাছ থেকে প্রভূত অর্থ নিয়ে কন্যার দূরে বিবাহ স্থির করে এখন কেন কাঁদতে বসেছেন; কিংবা বিবাহে একসময় যে পালকি এই লোকযানটির ব্যবহার অনিবার্য ছিল তার হদিস আমরা ছড়াতেই পাই। বিস্মৃত হলে চলবে না শিশুদের জন্য রচিত ছড়াও সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রতিফলনে সমৃদ্ধ। এইভাবে আমরা ছড়া থেকে অতীত ইতিহাসের বহু তথ্য লাভ করি, গার্হস্থ্য জীবন রসেরও পরিচয় পাই। এমন কি নৃতাত্ত্বিক উপাদানও যে ছড়ায় লভ্য তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের একমাত্র না হলেও অন্যতম দায়িত্ব হল বিভিন্ন পাঠের মধ্যে প্রাচীনতম পাঠ (Archetype) আবিষ্কার করা। এই আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন হয় একই উপাদানের বিভিন্নপাঠের। একথা ঠিকই যে তাই বলে সব সময় প্রাচীনতম পাঠ সুনিশ্চিত ভাবে আবিষ্কার সম্ভব হয় তা নয়, এক্ষেত্রে পণ্ডিত মহলে মত পার্থক্য কম লক্ষিত হয় না। আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি। একটি অত্যন্ত প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছড়া হল—

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো বর্গী এলো দেশে
ঘুঘু পাখিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

ঘুমপাড়ানিঃ [১]
ঘুম যা ঘুম যা ঘুমেব বাছা মণি।
ঘুমের থুন উঠিলে বাছা তাই খাইও লনী॥

দোলনার ছড়াঃ [২]
খোকন আমার দোলেরে
রাজার ঘোড়া চলে রে।
ঘোড়া ছুটে পাঁই পাঁই
দোলনা দোলে সাঁই সাঁই॥

ছেলে ভোলানোঃ [৩]
আয় রে পাখি টিয়ে,
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে॥

খাওয়ানোর ছড়াঃ [৪]
খোকা আমার কী দিয়ে ভাত খাবে,
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ির বেগুন দিয়ে।

কান্না থামানোর ছড়াঃ [৫]
কিসের লেগে কাঁদ খোকা কিসেব লেগে কাঁদ,
কিবা নেই আমার ঘরে।
আমি সোনার বাঁশি বাঁধিয়ে দেব,
মুক্তা থরে থরে।

আদর করার ছড়াঃ [৬]
খোকন সোনা চাঁদের কোণা
আঁধাব ঘবে আলো,
খোকনমণি থাকতে কেন
আবাব প্রদীপ জ্বালো।

স্নান করানোর ছড়াঃ [৭]
আমার খোকন গোসল করে পানকৌড়ির ছা।
আয় রে আয় সূর্যি মামা একটু দেখ্খ্যা যা॥

কাজিয়া মীমাংসার ছড়াঃ [৮]
বিয়াল বিয়াল দুইপব
গাট্টা হাপ আজাগর
আজাগরোর আ মোটা
গাট্টা হাপ পুট্‌ পুটা।
হাপ মারি লেইঞ্জো বিষ
মোকদ্দমা টিস্‌ মিস॥

খেলোয়াড় বণ্টনের ছড়াঃ [৯]
এলাটিন ব্যালাটিন চোব
বায ফোর ডি ফোব টার্টি ফোর
এ্যাক লাটিম
চন্দন কাটিম
চন্দনের নাম দাদা
ইতিব সিজিব ফিতির খায়
প্রেজাপতি উডইয়া আয়॥

ভয় দেখানোর ছড়াঃ [১০]
যাদু ঘুমোরে ঘুমো,
শান্তিপুবে বাঘ এসেছে
দাৰুণ হুমো।

ঐন্দ্রজালিক ছড়াঃ [১১]
(বৌদ্র আবাহনেব ছড়া)
বৈদ দে বে বৈদানী
চান্দেব মাব বকেব হাত,
কলাতলায গলা জল
চচ্চ ব্যাযা বৈদ পড়।

বর্গীর হাঙ্গামা এক ঐতিহাসিক ঘটনা (১৭৪২—১৭৫১)। এই ঘটনার স্মৃতি এই ছড়ায় রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু ওপার বাংলায় এই বর্গীর হাঙ্গামা ঘটেনি। তাই ওপার বাংলার মানুষ বর্গীর হাঙ্গামা সম্বন্ধে অবহিত নয়। বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ। চট্টগ্রামে এই ছড়াটির ভিন্নরূপ পাই—

ছেলে ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী-আইল দেশে
ঘুঘু পাখিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে

প্রয়াত আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বর্গী আইল দেশে' পাঠটিকে প্রাচীনতম পাঠ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে চট্টগ্রামের মানুষ বর্গীর হাঙ্গামা সম্পর্কে অবহিত ছিল না বলে সামুদ্রিক ঝড়, যার সঙ্গে তাদের পরিচিতি আছে, সেই অর্থে 'গরকী' শব্দটি ব্যবহার করেছে বর্গীর পরিবর্তে। কিন্তু ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বলে যে সামুদ্রিক ঝড় যেহেতু বর্গীর হাঙ্গামার তুলনায় প্রাচীনতর তাই চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত পাঠটিই প্রাচীনতম! কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল নিছক সময়ের দিক থেকে প্রাচীনতর কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি একটি পাঠের প্রাচীনত্বের একমাত্র কারণ হতে পারে না সকল ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে অন্তত হয়নি বলে আমাদের বিশ্বাস বরং অপরিচিত বর্গী শব্দটির স্থলাভিষিক্ত 'গরকী' শব্দটি মূলতঃ বর্গীর ধ্বনি সাযুয্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বিকল্পভাবে একটি অর্থবহ শব্দকেও বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

সারণী—২

খেলার ছড়া

ঘরোয়া খেলার (Indoor)
(সহজ গীতিসুর যুক্ত)
আগেডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ডালমেঘর ঘাঘর বাজে
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি
কমলাপুলির টিয়েটা
হায় রঙ্গ হাটে যা
একটি পানে ভোমরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া…

বাইরের খেলার (out door)
(বীর রসের স্পর্শজাত)
চল বড্ডি এলাহি
মকদ্দমা লাগাইছি
এক বালি এন্ডা
মকদ্দমা ঠান্ডা
(এটি হাডুডু খেলায় আবৃত্তি করা হয়)

সারণী—৩

খেলা সম্পৃক্ত অন্যান্য ছড়া

(১) খেলোয়াড় বণ্টনের ছড়া	(২) কাজিয়া মীমাংসার ছড়া	(৩) আঘাত দূরীকরণের ছড়া
এজিদ ভেজিদ খেজিদ খা পরজাপতি উইড়ে যা। ইষ্টিশনের মিষ্টি ফুল আয়রে আমার গোলাপ ফুল আয়রে আমার আম লেইট	এক পইসার তাগা মহরদমা লাগা এক পইসার কিসমিস মহরদমা ডিশমিশ	কচকা কচুরি। তেল দিয়া মছুরি ।। ইন্দ্রের চাটি বরমার তেল। হাত দিতে না দিতে কচকা মিলি গেল ।।

সারণী—৪

খেলার ছড়া

ছেলেদের (হাডুডু খেলা)	মেয়েদের
ধর ধর বোল্লা কতদূরে যায় ডালিম গাছে পাইত্যা খায় ডালিম ধরে গোট গোট রক্ত পড়ে ফোঁট ফোঁট সেই রক্ত দিয়া লাগালাম বাতি বাতি গেল জাঙ্গাল গাতি জাঙ্গাল গাতি বাঘের ভয় মানুষ গরু ধইর‍্যা খায়	ইস্নি বিস্নি সোয়াগো, চাইল কারাণীর বউ গো। কার চাইল কার গো ? শিমের চাইল কারি গো। শিম আইছে খাইম্যা, ধর ছাতি নাইম্যা। ছাতির উপরে কমদফুল চরহি আইন্যা গান তুল্।

ছেলেদের (হাডুডু খেলা)	মেয়েদের
ধইর‍্যা খায়, ধইর‍্যা খায়।	ও চরহি চরহি লো মাঘের ঘাটে যাইতাম না। পান সুপারি খাইতাম না। কালা কালা কামিনী কালা ঘাস খায়, রাইত অইলে কামিনী খোড়লে যায়। আনিলাম নাপিত কামাইল চুল, এই চুলের নাম কি ? চিনি চম্পা মধ্যম ফুল।

সারণী—৫

ছড়া

বাইরের খেলার উপযোগী (মেয়েদের)	বাইরের খেলার উপযোগী (ছেলেদের)
বাজার ঘট ঘট ঝি মাইর সাথী বাইন্দা আনছি জালর সাথী।	গুড়ি গুড়ি তেলেংগা তরে লইয়া গেলাম গা। তারা মাঠে দুই ভাই কপাটি কপাটি খেলে বাই।

সারণী—৬

ছড়া

ঘরে খেলার উপযোগী (মেয়েদের)	ঘরে খেলার উপযোগী (ছেলেদের)
এলাটিং বেলাটিং তেলাটিং চোর। মাইফর্ডিফর ফোর্টি ফোর॥ এককাঠি চন্দন কাঠি	আতাল পাতাল, সাম সাঁতাল। সাম গেল বাটে, দে মা-গো চারটে ভাত। আজ গোবরের হাত, কাল দেব দুধ ভাত।

ঘরের উপযোগী (মেয়েদের)	ঘরে খেলার উপযোগী (ছেলেদের)
চন্দন বলে কা-কা,	তোমার ভাত তুমি খাও,
ইজিক বিজিক সিজিক চায়,	আমার বাড়ী আমি যাই ।*
প্রজাপতি উড়ে যায় ।	*(মেয়েরাও এই খেলা খেলতে ও ছড়া বলতে পারে ।)
মেম খায় বিস্কুট	
সাহেব বলে, ভেরিগুড ।	

*(ছেলেরাও এই খেলা খেলতে পারে ও ছড়া আবৃত্তি করে ।)

আমরা এইবার বাংলা ছেলে ভুলানো ছড়ার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করব—

ক. ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonology)
খ. ধ্বনিরূপ তত্ত্ব (Morphophonic)
গ. রূপতত্ত্বগত (Morphology)
ঘ শব্দ ভাণ্ডার কেন্দ্রিক (Lexicology)
ঙ. তাৎপর্য তত্ত্বগত (Semantics)
চ. বাক্যবিন্যাসগত (Syntax)
ছ. সন্দর্ভকেন্দ্রিক (Discourse Analysis)

ক. ধ্বনিতত্ত্বগত :

(i) অপিনিহিতির ব্যবহার : বাংলা ছড়ায়

১. আমার মণির চউক্ষের উপর বইস

'চক্ষু'র উ পূর্ব থেকেই উচ্চারিত হওয়ায় 'চউক্ষ' রূপ প্রাপ্ত হয়েছে এবং অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত হয়েছে ।

২. বাটা ভইরা পান দিমু গাল ভইরা খাইও,

'ভরিয়া'র 'ই' পূর্ব থেকে উচ্চারিত হওয়ায় 'ভইরা' অপিনিহিত হয়েছে ।

৩ দুইলা চুপী মইরা রৈছে দেখ্যা আইয়া যাও ।

'মরিয়া'র ই পূর্ব থেকে উচ্চারিত হওয়ায় 'মইরা' অপিনিহিত হয়েছে ।

৪. যমুনার জলে গিয়া তুমি ডুইব্যা মর ।

'ডুবিয়া'র 'ই' পূর্ব থেকে উচ্চারিত হওয়ায় 'ডুইব্যা' অপিনিহিত ।

(ii) স্বরভক্তির প্রয়োগ :

১. কোন্ পরাণে বলব রে ধন,
যাও কাদাতে হেঁটে ।।
প্রাণ>পরাণ

২ তারা কিসের গরব করে।
গর্ব > গরব

৩ তোঙার ঘরত জন্মিয়াছি পরবাসী হৈয়া
প্রবাসী > পরবাসী

৪ জানলা কেটে পালিয়ে যাব জনমের মতন।
জন্মের > জনমের

৫. তারি তলে কাকা আমার গেলাস দান করে
গ্লাস > গেলাস

৬ তোরা গরব করিস না।
গর্ব > গরব

৭ শুষ্‌নি শাক উঠছে যতনে,
যত্নে > যতনে

৮ সকল গুষ্টির পরাণ খান।
প্রাণ > পরাণ

(iii) যুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহারে ঝোঁক :—(Gemination)

১. জোচ্ছনায় ফটিক ফোটে
চোরের মায়ের বুক ফাটে।

২. ছক্কা ভরি লৈতে টাকা গায়ে কৈল্ল বল,

৩ তায় পল্লো মাকড় বিচিং।

৪ দিছি বিয়া শুক্কুরবারে মুলা টেহা লইয়া।

৫ তত্ত্ব দুধির ফান্না।

৬ একখানি চিড়া মুখে দিলাম শাশুড়ী মাইল ঠোক্কা,
ঘরের কাছে কানতে গেলাম ভাউরে মাইল চাক্কা।

এখানে 'জোচ্ছনায়', 'কৈল্ল', 'পল্লো', 'শুক্কুরবারে', 'ফান্না', 'ঠোক্কা', 'চাক্কা'য় যুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়েছে।

(iv) শব্দের রূপান্তর ঃ

শিশুদের উচ্চারণের অনুসরণে অথবা শিশুর প্রতি স্নেহ ভালবাসাকে উৎসারিত করতে অনেক ক্ষেত্রে শব্দের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যেমন ঃ

ক. কলা দিয়ে দুধু ভাত খায়।।

খ. খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলি মাগীদের পাড়া

গ হে'টোর নীচে দুলছে খুকুর গোছা ভরা চুল।

ঘ খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে ।।

শিশুর কারণে জুতা 'জুতুয়া' রূপ লাভ করেছে অবশ্যই গৌরবের তা। রবীন্দ্রনাথের এই প্রসঙ্গে মন্তব্যটি স্মরণীয়—'আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজের দোকান হইতে আজানুসমুখিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচমচ শব্দ করিয়া বেড়াই তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতিক্ষুদ্র কোমল চরণ যুগলে ছোটো ঘুণ্টি দেওয়া অতি ক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতো জোড়া, সেটা হইল জুতুয়া। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, জু'তার আদরও অনেকটা পদ সম্ভ্রমের উপর নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।'

কিছু শব্দ আবার ব্যবহারকারিণীর অজ্ঞতা অথবা বিকৃত উচ্চারণের ফলে বিকৃত রূপ লাভ করেছে।

ঙ. নিষুত রাতি নাইরে সাড়া।
ঢুল ঢুল ঢুল নয়নতারা
—'নিশীথ' শব্দটি 'নিষুত' রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

চ. 'বাবু পহ্নিবে পাট'
—'পরিবে' শব্দের অনুকরণে 'পহ্নিবে' শব্দটি কল্পিত হয়েছে।

ছ. গুলগুলিয়ে ধান খাইয়াছে খাজনা দিব কিসে।।
'বুলবুলি'র অনুসরণে 'গুলগুলি' কল্পিত।

জ. মণি ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল গরকী আইল দেশে।
'বরগীর' অনুসরণে 'গরকী' শব্দটি কল্পিত।

ঝ. বড় বাঁধেতে আমার ছেগলি
কে বাঁধিবা গো,
'ছাগলী' শব্দটি বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়ে 'ছেগলি' হয়েছে।

ঞ. উলকি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গা ধানের খই।
'উড়কি' এখানে 'উলকি'তে পরিণত হয়েছে।

ট. দুধের পুষ্কর্ণী দিব
সাঁতার খেলিতে ।।
'পুষ্করিণী' শব্দটিই সংক্ষিপ্ত রূপ প্রাপ্ত হয়ে 'পুষ্কর্ণী'তে পরিণত হয়েছে।

ঠ জন্ম ইস্ত্রী হয়ে আমার ঘর করবে আলো।
'এয়োস্ত্রী'র সংক্ষিপ্ত রূপ হয়েছে 'ইস্ত্রী'।

ড. বাবু যে মোর পান খাবে
তার শাশুকে বাঁধা দিয়া।
'শাশুড়ীর' সংক্ষিপ্ত রূপ 'শাশু'।

ঢ বাছারে ডাকিয়া আন দিনান্তের উপাসী।
'উপবাসী' এখানে 'উপাসী' রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

ণ. মাছ নিলে চোঁড়া সাপে।
বঁড়শি নিলে চিলে।।
'ঢোঁড়া'র অনুসরণে 'চোঁড়া' শব্দটি কল্পিত।

ত সুরু ধানের চিঁড়া দিব
'সরু' এখানে 'সুরু' হয়েছে।

থ নেপুর দিব সাথে
'নূপুর' হয়েছে 'নেপুর'।

খ. ধ্বনিরূপ তত্ত্ব :

১. এদ্দিনিতে জানলাম মুই
খোকন বড় ধন।
এত + দিন = এদ্দিন

২. হাতে না মেলাম ভাতে না মেলাম কল্লেম গঙ্গাপার।
কর্ + লেম = কল্লেম

৩. আয় রঙ্গ হাটে যাই দুখিলি পান কিনে খাই।
দুই + খিলি দুখিলি

৪. আন্না, আন্না, আন্না
আর্ + না = আন্না

৫. কলাপাতা পিনধ্যা থাকব কদ্দিন।
কত্ + দিন = কদ্দিন

৬. আপনি মলি জাড়ে।
ঠিক ঠিক দুপ্পহরে।।
দুই + প্রহরে = দুপ্পহরে

৭. সানাই বাজে জোড়া জোড়া কর্তাল বাজে রৈয়া।
কর্ + তাল = কর্তাল

৮. শিশু মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর কল্লাম খালি।
কর্ লাম = কল্লাম

৯ দাঁড়ারে বাজ বাজন্দার
বাজন + দার = বাজন্দার

গ রূপতাত্ত্বিক গত :

(i) অনুকার শব্দের প্রয়োগ

অনুকার শব্দও আসলে শব্দদ্বৈতেরই নিদর্শন। তবে আমরা সেইসব শব্দকেই অনুকার শব্দ বলতে চাই, যেগুলি নিজস্ব অর্থ গৌরবে গৌরবান্বিত নয়, অব্যবহিত পূর্ববর্তী শব্দের অর্থকেই যেগুলি পরিস্ফুট করে।

১ তোর ভাঙ্‌ব হাঁড়ি ভাঙব কুঁড়ি
ভাঙ্‌ব দুধের হোলা।

এখানে 'হাঁড়ি' শব্দের অনুকরণে 'কুঁড়ি' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে, 'কুঁড়ি' শব্দটিকে পৃথকভাবে ব্যবহার করা যাবে না, কেননা সেক্ষেত্রে তার কোনো অর্থই মিলবে না।

২. কিছু মিছু ধর শিশু মুখে দাও মুখের হোক তার।
'কিছু'র অনুকরণে 'মিছু' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে, তাই এটি অনুকার শব্দের নিদর্শন রূপে দেখা দিয়েছে।

৩ সাঁঝের প্রদীপ নড়ে চড়ে।
'নড়ে' ক্রিয়াপদের অনুকরণে 'চড়ে' ক্রিয়াপদটি কল্পিত।

৪ পটল গেছেরে খেলতে তেলি মেলিদের পাড়া
'তেলি'র অনুকরণে 'মেলি' শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে।

৫. আতা তলা বাতা তলা
তা ধিন ধিন ফুলের মালা

'আতা'র অনুসরণে 'বাতা' শব্দটি সৃষ্ট, তাই অনুকার শব্দ রূপে গৃহীত হবার যোগ্য।

৬. পরবে কত সোনা দানা, রঙ বেরঙ এর শাড়ী
'সোনা'র অনুকরণে 'দানা' শব্দটি কল্পিত হয়েছে।

৭ মাচার নীচে দুধ আছে
টেনে টুনে খেয়ো।

'টুনে' শব্দটির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই; 'টেনে'র অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই শব্দের অর্থকেই সমৃদ্ধ করেছে।

(ii) ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার :

বেশ কিছু বাংলা ছড়ায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। শিশু

শব্দের অর্থ বোঝে না, তার কাছে শব্দের ধ্বনি মাধুর্যের আকর্ষণই প্রবল। বিশেষ ক্রিয়াকে বিশেষ শব্দ প্রয়োগে কেমন মূর্ত করে তোলা হয়েছে, আমরা তার পরিচয় পাব।

ক ঘোড়া ছুটে পাঁই পাঁই।
ঘোড়ার দ্রুততালে ছোটাকে 'পাঁই পাঁই' শব্দের ব্যবহারে বিশেষিত করা হয়েছে।

খ গাল বেয়ে দুধ পড়ে টুপ টুপ টুপ
আস্তে আস্তে গাল বেয়ে দুধ পড়াকে এখানে মূর্ত করে তোলা হয়েছে 'টুপ টুপ টুপ' ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা।

গ. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাইরে ভেজে কে
'টাপুর টুপুর' বৃষ্টি পড়াকে জীবন্ত করে তুলেছে।

ঘ খিড়কি দুয়ার খুলে দেব ফুড়ুৎ করে যেয়ো।
'ফুড়ুৎ' শব্দটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঙ তসর করে খসড় মসড়
গরদ কিনে দাও
এখানে 'তসর' শব্দটি ব্যঞ্জিত হয়েছে 'খসড় মসড়' শব্দ ব্যবহারে।

চ. কুল কুল বইছে নদী
নদীর ধীর গতিতে প্রবাহিত হওয়া এখানে কুল কুল শব্দে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

ছ তোরে নাচলে কেমন সাজে
ঝুনুক ঝুনুক বাজে
নৃত্যরত অবস্থাকে 'ঝুনুক ঝুনুক' শব্দের ধ্বনি দ্যোতনায় জীবন্ত করা হয়েছে।

(iii) শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ঃ

বাংলা ছড়ায় শব্দদ্বৈতের প্রভূত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। একই শব্দ অবিকৃত ভাবে অব্যবহিতভাবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন তাকেই আমরা শব্দদ্বৈত বলে থাকি।

ক. ঠাকুর বাড়ীর ফুল গাছটি সদাই ঝুরঝুর করে,
'ঝুরঝুর' শব্দদ্বৈতের নিদর্শন।

খ খোকা খোকা ডাক পাড়ি

গ. মরুক মরুক শাক তোলা।

ঘ. দোল দোল দোলনি।

ঙ দুই দুই বাঁদি দেব
পায়ে তেল দেবে।

চ. চার চার বেয়ারা দেব
কাঁধে করে নেবে।

ছ. কৃষ্ণচূড়ার ফুল দোলে
গাছের ডালে ডালে।

জ আকাশের কোলে কোলে
মেঘ দোলে।

(iv) সমাসের ব্যবহার ঃ

ক ঘুম যায়রে ঘুম যায়রে ঘুমের লতাপাতা।
লতা ও পাতা = লতাপাতা (দ্বন্দ্ব)

খ গাছ পাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই।
গাছে পাকা = গাছপাকা, ৭মী তৎ, হাঁড়িতে ভরা = হাঁড়ি ভরা, অধিকরণ তৎ।

গ আয়রে পাখী লেজ ঝোলা।
লেজ ঝোলে যাহার = লেজঝোলা, বহুব্রীহি

ঘ. ঐ রে বাবা ছেলেধরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।
ছেলে ধরা কাজ যাহার – ছেলেধরা, বহুব্রীহি

ঙ ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ,
চাঁদে মেশামেশি।
মেশামেশি, ব্যতিহার বহুব্রীহি

চ ধন ধুলোয় গড়াগড়ি।
গড়াগড়ি = ব্যতিহার বহুব্রীহি

ছ তুমি আমার যোগীর কোশাকুশি।
কোশা ও কুশি = কোশাকুশি, দ্বন্দ্ব

জ. ওগো মাসিপিসি তোমরা কেউ করো না মানা।
মাসি ও পিসি, মাসিপিসি ; দ্বন্দ্ব

(v) সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার ঃ

ক. চার কড়া দিয়ে কিনলাম ঘুম
মণির চোখে আয়রে।

খ. একা বুড়ি দোকা বুড়ি
তেকা বুড়ির ছা।

গ ছ'কুড়ি বউ-এর নক্‌ড়ি খাটাল।

ঘ. পাঁচশো টাকার মলমলের থান
   জরির জুতো পায়।

ঙ. হাজার টাকার লাল গামছা দিব খোকার গায়ে।

চ. পঁচিশ টাকার জামা জোড়া খোকন ধনের গায়ে।

ছ. খোকা আসছে বিয়ে করে,
   সঙ্গে দুশো ঢোল।

জ. তারা বাইশ বলদে চষে।

চার, একা, দোকা, তেকা, ছ'কুড়ি, পাঁচশো, হাজার, প'চিশ, দুশো, বাইশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে মূলতঃ অতিরঞ্জিত অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। যখন বলা হয় খোকা বিবাহ করে সঙ্গে দুশো ঢোল সহ আসছে, কিংবা খোকার গায়ে হাজার টাকার লাল গামছা প্রদত্ত হবে, তখন খোকার গুরুত্ব বৃদ্ধিই যে এখানে মূল উদ্দেশ্য তা আর চাপা থাকে না।

(vi) নামধাতুর ব্যবহার ঃ

১ খাবি দাবি কলকলাবি।

২. টুনটুনিয়ে টুনটুনালো, ইন্দুরে বাজায় খোল।

৩. চড়্‌বড়িয়ে বেত মারলে পড়্‌পড়িয়ে যায়,

৪. কাকটা মরে কড়্‌কড়িয়ে, বৃষ্টি এল চড়্‌চড়িয়ে।

৫. তোর মৈষে লাদে কেমন ?

৬. তবু মেয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে চক্রোবর্ত্তীর কানে।

৭. মা গালাইছিলেন থুবরি বলিয়া।

কলকলাবি, টুনটুনালো, চড়বড়িয়ে, পড়পড়িয়ে কড়কড়িয়ে, চড়চড়িয়ে ঘুনঘুনাচ্ছে, গালাইছিলেন এসবই নামধাতুর নিদর্শন।

ঘ (i) শব্দ ভাণ্ডার কেন্দ্রিক ঃ

১. অল্‌রাইট ভেরি গুড্‌

• পাঁউরুটি বিস্কুট

অল্‌রাইট, ভেরিগুড্‌, বিস্কুট এগুলি সব ইংরেজি শব্দ কিন্তু পাউরুটি পর্তুগীজ শব্দ।

২. রেলকম ঝমাঝম
   রেল ইংরেজি, come ক্রিয়াপদটি এখানে 'কম' রূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

৩. রাঙ্গা রাঙ্গা 'টুফী' দেব
   শাশুড়ী ভুলাতে
   Toffee থেকে 'টুফী' শব্দটি এসেছে।

৪ নেবুর পাতা গন্ধ
হাইস্কুল বন্ধ
হাইস্কুল ইংরেজী শব্দ।

৫. ওপেন টি বাইস্কোপ
টান টুন টেইস্কোপ
বাইস্কোপ ইংরেজী শব্দ।

৬. পানের ভিতর মৌরী বাটা,
ইস্কাপানের ছবি আঁটা। —ইস্কাপন ওলন্দাজী শব্দ।

৭ হারমনি তবলা বাজায় গা —হারমোনিয়াম ইংরেজী শব্দ, বাজায় গা হিন্দী।

৮. জিত পট্টি জিতেঙ্গা
তগ সাথ খেলেঙ্গা—জিতেঙ্গা, খেলেঙ্গা হিন্দী।

৯. পানে আসে মৌরী বাঁটা,
ইসক্রুপে চারি আঁটা। ইসক্রুপ ইংরেজী শব্দ।

১০ পানের মৌরী বাটা,
ইসপ্রিংয়ে চাবি আঁটা, —ইসপ্রিং ইংরেজী শব্দ

১১. পানেতে মৌরী বাটা,
স্কুলেতে চাবি আঁটা। —স্কুল ইংরেজী শব্দ।

(ii) কারক, বিভক্তির ব্যবহার ঃ

অধিকরণে তে ও এ বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ ঃ

১. নিদ্রালী মাউরে, আমার বাড়ীত আইও।
'বাড়ীতে' না বলে 'বাড়ীত' ব্যবহার হয়েছে।
অধিকরণে শূন্য বিভক্তি ঃ

২ ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী আমাদের বাড়ী যেয়ো।
'বাড়ী' শূন্য বিভক্তিযুক্ত ঃ
অপাদানে হইতে, থেকে বিভক্তির লোপ ঃ

৩. তারা নুন কোথা পায় ?
অনাব্যশ্যক ভাবে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ ঃ

৪. ক. খরার নদী চলে
খ. ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু, মর্তমানের কলা
গ. আড়ারে ঘোড়া।
শিমুলের তুলা।

ঘ আমের গাছে গাছে
মুকুল দোলে।

ঙ মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুধের কুমারী।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'র' এর অবলুপ্তিঃ

৫ ক ঘুম আয়রে ঘুম আয়রে
ঘুমে লতাপাতা।

খ দত্ত বৌ পান সেজেছে এলাচ দানা দিয়ে

গ কাল মামু ঘরে মালসা পুজা।

ঘ. পুঁটি আমার মেঘের বরণ।

ঙ সারারাত খুঁজে ম'লাম গুড় হাঁড়িটা কি ?

চ ডাকাত বৌ আসে খন্তি হাতে নিয়া।

চতুর্থ বিভক্তিতে 'কে'এর ব্যবহার ঃ

৬ ক. বিলকে গেলে তাঁটগা দিমু।

খ ছোটো বউ লো জলকে যা।

গ ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী ?

ঘ ঘরকে গিয়ে মাকে বলে নিয়ে এস গে ধান !

(ঙ). **তাৎপর্য তত্ত্বগত ঃ**

(i) বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ ঃ

১. রঙ বেরঙ এর শাড়ী।

২ আগে আগে পালান কৃষ্ণ যশোমতী পাছে ;

৩. আগে যায়রে মজুমদার
পিছে যায়রে ভারী,

৪. . আনবে কত টাকা মোহর
দেশ বিদেশে ঘুরে।

৫ আগু যায় বাজনদার পিছু যায় ডুলি।

রঙবেরঙ, আগে পাছে, দেশ বিদেশে, আগুপিছু এসব বিপরীতার্থক শব্দাবলী ব্যবহারের নিদর্শন।

(ii) সহচর শব্দের প্রয়োগ ঃ

মূলত সহচর শব্দ, শব্দদ্বৈতেরই দৃষ্টান্ত, তবে আমরা অনুকার, ধ্বন্যাত্মক, শব্দদ্বৈত, বিপরীতার্থক শব্দগুলিকে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করতে প্রয়াসী। অনুকার শব্দ বলতে সেইসব শব্দ বোঝানো হয়েছে যেগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, মূল শব্দের অর্থকেই যেগুলি দেদীপ্য করে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলতে ক্রিয়া যেসব শব্দের প্রয়োগে শ্রুতিগম্য হয়ে ওঠে। শব্দদ্বৈত বলতে আমরা একই শব্দের অবিকৃত ভাবে একাধিক বার ব্যবহার বুঝিয়েছি। সহচর শব্দ বলতে আমরা সেইসব শব্দকে বোঝাতে চাই যেগুলির নিজস্ব অর্থ আছে কিন্তু কখনই একাকী ব্যবহৃত হয় না, অন্য একটি অনুরূপ শব্দের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাই বলে কোন শব্দের তা পুনরাবৃত্তি নয়।

১ খাট নাই পালঙ নাই, পিঁড়ি দিতাম
জাগা নাই।

এখানে খাটের অনুষঙ্গে পালঙ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২ ধোনা ধন ধোনা
চোত বোশেখের বেনা।

চৈত্র মাসের অনুষঙ্গে বৈশাখ মাস উল্লিখিত হয়েছে।

৩ কিনে আনগে শুকনো কাট,
পুঁটু রাঁধবে ডাল ভাত।

সাধারণতঃ 'ভাত' শব্দের ব্যবহার হয় প্রথমে, তারপরে ব্যবহৃত হয় 'ডাল' এখানে তৎপরিবর্তে প্রথমেই 'ডাল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে 'ভাত' সহচর শব্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে,

৪ তারা রূপার খাটে পা রেখে
সোনার খাটে বসে।

'সোনা'র সহচর শব্দ রূপে 'রূপা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে 'রূপা' শব্দটি প্রথমে ব্যবহৃত হওয়ায় 'সোনা' সেটির সহচর শব্দ হয়ে উঠেছে।

৫. সকলে বেচে দধি দুগ্ধ।

'দধি'র অনুষঙ্গে এখানে 'দুগ্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সচরাচর বিপরীত ব্যবহারই লক্ষ্য করা যায়।

৬ খোকামণির বিয়ে দেব
পয়সা কড়ি কৈ ?

পয়সার অনুষঙ্গে 'কড়ি' শব্দ এসেছে।

৭. রুইমাছ কাতলা মাছ
ভারে ভারে আসে ;

রুই এর অনুষঙ্গে কাতলা মাছের প্রসঙ্গ এসেছে।

৮. খাওয়ান দাওয়ান যেমন তেমন
বাজনা শোন সে।

'খাওয়ানো'র সহচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে 'দাওয়ান'।

৯. মানিক যাবে রঙ্গে
বাঘ ভালুকের সঙ্গে ।

'বাঘে'র সহচর শব্দ রূপে ভালুক শব্দটি এসেছে ।

১০. আম কাঁঠালের বাগিচা দিব ছায়াতে যাইতে ।

১১. শাল দিবে, দোশালা দিব, দিবে রূপবতী ঝি ?

১২. ঢাক ঢোল দিয়া ।
বুলবুল টিয়া, খোকার দিমু বিয়া ।

(iii) বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগ ঃ

ধাঁধার অবয়ব গঠনে প্রায়ই অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, উদ্দেশ্য শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করা, মূল সমস্যা থেকে তার দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে আনা। ছড়াতেও অনেক সময়ে অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এক্ষেত্রে শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য কার্যকর হয়নি, ছন্দের প্রয়োজনে এইসব অর্থহীন শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে ।

১. হোলই হোলই হোলই কাল বাদুড়ের ছাও

২. কেরে কেরে কেরে,
তপ্ত দুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দুদে

৩. হলি হলি হলি গো কাল বাদুড়ের ছাও ।

৪. অলি অলি অলি রে
মোর ঘুম কইলের ছা ।

৫. আয় তই, তই তই,
বিন্নি ধানের খই ।

৬. তা—তা—তা,
মামা বাড়ী যা ।

৭. টিমু টিমু টিমু
ভাষ শালিকের ডিমু ।

৮. এটি মেচি ধান টেল,
ধানের ভিতর বিলাই পৈল ।

(iv) লিঙ্গান্তর যুক্ত শব্দদ্বৈতের ব্যবহার ঃ

১. গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে কাঁদে তরুলতা
গোপ-গোপিনী বিপরীত লিঙ্গের শব্দদ্বয় ।

২. ঠাকুর বাড়ীর ফুল গাছটি সদাই ঝুরঝুর করে,
তারি তলে কিষ্ট-রাধিকা সদাই নৃত্য করে।
কিষ্ট-রাধিকা বিপরীত লিঙ্গের শব্দদ্বয়।

৩. জোলা নাচে জুলনী নাচে
নাচে জোলার নাল,
সব চরকি উইঠ্যা বলে
আমরা নাচব কাল।
জোলা-জুলুনী বিপরীত লিঙ্গের।

৪. আগে কাঁদে বাপ মায় পিছে কাঁদে পর
বাপ-মা।

৫. হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমবী
ভ্রমরা-ভ্রমরী।

৬. খোকা খুকুর চোখে ঘুম নাই
খোকা-খুকু।

৭. তারা গাই বলদে চষে
গাই—বলদ।

৮ সাইর নাচে শালিক নাচে, মাদার পুষ্প খাইয়া
সাইর – শালিক

৯ বাঘ মারি বাঘানি মারি ভৈষ ভালুকের মুণ্ডু ছিঁড়ি

১০. কোড়াল বলে কোড়ালী এবার বড় বান,

(v) অলঙ্কারের ব্যবহার ঃ

১ রূপক—তুই আমাদের খোকন সোনা
খোকন ও সোনার মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

২ যমক—চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
প্রথম চাঁদ শব্দটিতে শিশুকে বোঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় 'চাঁদ' শব্দে আকাশের চন্দ্রকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. সমাসোক্তি ঃ আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি পাড়া দিয়ে।
ঘুম এই অচেতন অবস্থার উপর সচেতন প্রাণীর গুণ আরোপিত হয়েছে।

৪ রূপক ঃ ফুল ফুট্যাছে লাখে লাখে মন ভমরা উড়ে।
মনের সঙ্গে ভ্রমরার অভেদ কল্পনা করা হয়েছে।

৫. প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা ঃ এর পরে আন্যা বাটা মুখে দিল পান,
ঘর তনে বাইর অইল পুন্নমাসীর চান।

এখানে কন্যাকে পৌর্ণমাসীর চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কন্যা ত

নয় যেন পৌর্ণমাসীর চন্দ্র, কিন্তু এই সংশয়, সংশয় বাচক শব্দ দ্বারা প্রকাশিত না হওয়ায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

৬ ব্যতিরেক : সাজিয়া পরিয়া কইন্যা রূপের পানে চায়।
চান সুরুজ লজ্জা পাইয়া আরের নীচে যায়।

এখানে উপমেয় কন্যার সৌন্দর্যের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে, উপমান চান সুরুজের তুলনায়, তাই ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়েছে

৭. লুপ্তোপমা : পটল চেরা চক্ষু খুকুর বাঁশীর মতন নাক।

এখানে উপমেয় খুকুর চোখ, উপমান পটল, সাধারণ ধর্ম দীর্ঘতা ; কিন্তু সাদৃশ্য বাচক শব্দ অনুপস্থিত ; বাঁশী উপমান, নাক উপমেয়, সাধারণ ধর্ম তীক্ষ্ণতা, সাদৃশ্য বাচক শব্দ 'মতন', তাই পূর্ণোপমা হয়েছে।

৮. লুপ্তোপমা : সোনা মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে।

সোনার মত মুখ বোঝানো হয়েছে, এখানে উপমেয় মুখ, উপমান সোনা, সাধারণ ধর্ম সৌন্দর্য, কিন্তু সাদৃশ্য বাচক শব্দ 'মত' অনুপস্থিত।

চ বাক্য বিন্যাস গত :

(i) নেতিকরণ :

১. শেজ নেই মাদুর নেই পুঁটুর চোখে বসো।

২. খাট নেই পালঙ নেই খোকার চোখে বসো।

৩ আমার বাছা ন খাইব খই ন খাইব দই
ন খাইব দুধের পুলি।

৪ সারাদিন চিঁড়া কুটলাম চিঁড়া পাইলাম না,
একখান চিঁড়া মুখে দিলাম শান্তি পাইলাম না।

৫. আড়া বনে বাড়া ভানি ঢেঁকি উঠে না,
লাল শাড়ি পর‍্যা থাকি জামাই আইয়ে না।

৬. ওঝা বৈদ্যি নাই গো দ্যাশে জীবনের নাই আশা,

৭, ঢাকাতে না আনলাম পাটা আর জুতা,
দিল্লীতে না আনলাম চিরল মেন্দির পাতা,

৮. চিঁড়া বল মুড়ি বল ভাতের সমান নাই,
মাসি বল পিসি বল মায়ের সমান নাই।

৯. মামা নয় মামা নয় মার সোদর ভাই।

১০. হাটে ঘাটে দোষ নাই,
গোরখ পোয়ার দোষ নাই।

১১. বুদ্ধি নাইরে জামাই বেটার বুদ্ধি নাইরে ধড়ে,

১২. তেও ত জামাই খায় না
বিদায় দিলে যায় না।

(ii) প্রশ্নবাচকতা ঃ

নিছক প্রশ্ন করেই দায়িত্ব শেষ করা হয়নি, প্রশ্নের যথাযথ উত্তরও প্রদত্ত হয়েছে।

ক. খোকা যাবে শ্বশুর বাড়ী
খেয়ে যাবে কি ?
লাভপুরের ময়দা আর
শিউড়ির ঘি।

খ ওখানে খোকন কি করে ?
ডাল ভাঙ্গে আর ফুল পাড়ে।

গ. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো কানাচে ঐ কে ?
ঐরে বাবা ছেলেধরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘ. খোকা আমার কী দিয়ে ভাত খাবে,
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ির বেগুন দিয়ে।

ঙ থাঁর ঝি রান্‌ছ কি ?
ইচা মাছের ঝোল।

চ বাবার জন্য কি এনেছো ?
লক্ষ টাকার ঘোড়া।
মায়ের জন্য কি এনেছো ?
মাথা বাঁধার ধড়া।

ছ. কি কর গো কন্যার চাচি, খাটের উপর বৈয়া,
তোমার ভাসুর-ঝির জামাই আইছে লাল ঘোড়া দৌড়াইয়া।
আইউক আইউক ঝিয়ের জামাই কিবা ভয় রাখি,
খাটের উপর বিছাইয়া রাখ্‌ছি সিঁতি পাইড়ের ধুতি।

জ. এল জামাই বাড়ীতে তেল নাই খারিতে,
বসতে দেব কি ?
ভাঙ্গা কুলো ছেঁড়া কাঁথা জোগাড় করেছি।

ঝ. কথা কইস্‌ না কেন বউ ।।
কথা কইলে গা জ্বলে।
কথা কইব কুন ছলে ।।

ছড়া সম্পর্কিত আলোচনার পর ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ কিছু ছড়া সংকলিত করা হল—

(১)

মুই যান ফালাকাটা
মদারী আজো কাটা

মুই যান আলিপুর
মদারী পুর হল
মুই যান ঢাকা
আমার দাড়ি ফাঁকা ।।

(২)

মাগুর মাছ, শিঙ্গি মাছ
ধরতে দিব না
ওগো আমি মন মতোন
রসিক পাইলে ছাড়িয়ে
দিব না ।।

(৩)

ওয়ান টু থ্রি
পাইলাম একটা বিড়ি
বিড়িতে নাই আগুন
পাইলাম একটা বেগুন
বেগুনেতে নাই বিচি
পাইলাম একটা শিশি
শিশিতে নাই রকেট
পাইলাম একটা পকেট
পকেটে নাই টাকা
চইল্যা গেলাম ঢাকা
ঢাকাতে নাই গাড়ি
চইল্যা আসলাম বাড়ী
বাড়ীতে নাই ভাত
পুটকি শুকে থাক ।।

অন্নহীনতাই ছড়াটিতে মুখ্য বক্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে ।

(৪)

আলুপাতা থালুপাতা
লজ্জাপাতা দই
সব জামাই খেতে এলো
মেজো জামাই কই

ঐ যে মেজো জামাই
গামছা গলায় দিয়ে
ও গামছা নেব না
মেয়ের বিয়ে দেব না
টাকা দেব ফিরিয়ে
মেয়ে আনবো ঘুরিয়ে

(৫)

কবাডি কবাডি বেল
জাড়ি কাটা নারিকেল ।।

(৬)

অগর ঢগর বন মগর
তেরে নাটি ব্যয় চোরা
বেঁজি ভেট মায়া পেট
চোরা চোর ।।

(৭)

ওপর আম আম আম
কাঁচা মিষ্টি আম
বাজার থেকে কিনতে গেলে
হাজার টাকা দাম ।।

(৮)

ওপর দশ কুড়ি তিরিশ চল্লিশ
পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি
আশি আশি মিশে গেল
প্রজাপতি উড়ে গেল
মা বলে স্কুলে যা
বাবা বলে ঘর থেকে
বের হয়ে যা
উপর দগে দোতলা বাড়ী
বৌ নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি
বৌ'র মাথায় কালো চুল
কোথায় পাব জবা ফুল
জবা ফুলের গন্ধে
জামাই আসবে আনন্দে ।।

(৯)

হলদি খ্যাতে ক্যারালো
সাম পক্ষি ডাকিলো
এতো ডাকা ডাকিস্ না
স্বামীর গলা ভাঙ্গিস না
স্বামী গেছে বিদেশে
একশো টাকা পাঠাইছে
একশো টাকায় হবে না
মেয়ের বিয়ে দিব না
মেয়ের মাথায় কালো চুল
কোথায় পাব জবা ফুল
জবা ফুলের গন্ধে
জামাই আসবে আনন্দে ৷৷

(১০)

কাঁচলা কাঁলা কেচলি
তুই কেন আমারে সেচলি
আছিয়াছি জগৎ কালো
তুই কেন আমার গাছ তটা
আমি বোন আমার রাস্তা দিয়ে যাব না
আমি কি আমার জাগামত পড়ব না ৷৷

(১১)

কায়া তোর পাকের তলায় কি
আণ্ডা হাড়াইছি
আণ্ডা করলি কি
বেঁচে ফেলাইছি
বেঁচে করলি কি
পয়সা দিয়ে পান কিনেছি
পান করলি কি
খেয়ে ফেলেছি
পেচকি করলি কি
ছোট বৌর বড় বৌর কাপড় বানাইছি ৷৷

(১২)

এক শিয়ালে রান্ধে বাড়ে
দুই শিয়ালে খায়
রাজার বেটা জগৎনাথ ঘোড়াই চড়ে যায়
ঘোড়ায় চড়ে যাইতেরে পাট কাপুড় খান পায়
পাট কাপুড় খান পাইবারে মাথায় বাঁধে শাড়ি
উমনি উমনি যাইলো চানখার বাড়ী
মায়ে বলে পুত পুত বুনো বলে শুয়া
আনি খাবি ভাপল গাছের গুয়া
ভাপল গাছের গোয়া খাইয়া
দাঁদ করিল ছোলা
চোখে মুখে কাপড় দিনু
চোখ টুলা বুলা ॥
আম খেলাম কাঁচা কুচা
কাঁঠাল খেলাম না
এই যে, দারুণ বন্যা আসলো, মাইরে
দেখলাম না ॥

(১৩)

আমি যাবো দিল্লী
টাকা দিব উল্লী
ক্লাস থ্রি
একভাই বল্টু
ডবল ডবল দুই তালা
হাকলা মুনি
সাপলা কাটে
চেরেঙ্গার চুল
কানের দুল
বাদল কি বাটকে
কানের দুল চটকে
ঐ হাম তল্লি বাঁশ
ছিকল ধরি টাড়ু নাড়ুম
ব্যাঙের বাড়ি
ওপারে যাবো না

তেলি মাছ খাব না
তেলি মাছের গন্ধ
হাইস্কুল বন্ধ
আজ আমাদের আনন্দ ।।

(১৪)

এক পিচ কাঁচাকলা
এক পিচ পাকাকলা
এল পাতা ডেল পাতা
বল ঘোড়া কিসের পাতা

(১৫)

কুত কলসী কুতের মালা
কোম্পানী কাত গাড়ী চালা
রেল গাড়ী ফেল করে
জামাইবাবু টিকিট কাটে
আম খালে আমসা
পয়রা খালে পেটব্যথা
বিড়ি খালে ক্যান্সার
হাইস্কুলের ড্যান্সার
আণ্ডার মে ডিম খায়
কাকা আসে ফিরে যায়
আমি যাবো কার সাথে

(১৬)

কাট কুটালী কাঁঠাল খায়
সেই পাখীটা মুখে চায়
রাজার বিটির বিয়া হয়
লম্বা লম্বা শাড়ি পায়
শাড়ির উপর ডোরা সাপ
চটকি কুলি কইন্যার বাপ
কইন্যার বাপের নাম কি
জল তুলা বালতি

(১৭)

ইচির বিচির চিচির চা
প্রজাপতি উড়ে যা

ষোলসা মাছের থোকা থোকা
ফুল ফুটেছে থোকা থোকা
ফুলের আগায় কড়ি
সাতঘণ্টা বড়ি
ইষ্টিশনের মিষ্টি পান
গোলাপ ফুলের মধু আম

(১৮)

হাডুডু খেলতে গিয়ে
পেলাম একটা চিঠি
চিঠির মধ্যে লেখা আছে
বুড়ো দাদুর টিকি ॥

(১৯)

ঐ পাড়াতে যাবো না
চিংড়ি মাছ খাবো না
চিংড়ি মাছ গন্ধ
হাই ইস্কুল বন্ধ

(২০)

ইন, পিন সেফটি পিন
খোকন খাবে ভিটামিন
ভিটামিনে পোকা
ডাক্তারবাবু বোকা ॥

(২১)

ভারতবাসী ভাই, করলি কিরে ভাই
আয়না কাঁকই ঘুমের বড়ি
আগের দিন আর নাই
দশ টাকা হল দুধের কেজী
খাঁটি দুধ আর নাই
হিন্দু মানুষ পুষে শুওর
কোনো জাতের বিচার নাই
কে বা মুসলিম, কে বা হিন্দু
চিনা বড় দায় ॥

(২২)

টুনটুনি পাখী
নাচো দেখি
না বাবা নাচবো না
পড়ে গেলে বাঁচবো না ।।

(২৩)

গোরী মাঝি তুলে দিয়েছে হাল
ঐ নৌকায় করে দাদা বৌ আনবে কাল ।।

(২৪)

কেউ আগে কেউ পাছে
কেউ মঙ্গল ঘাট
রাধিকা সুন্দরী জল ভরিতে যায়
জল ভরিতে গিয়ে রাধে
হার করিছে মনে
কত ফুল ফুটিয়া রয়েছে কানাই বৃন্দাবনে
কেউ তোলে আছরিয়া কেউ তোলে মুছরিয়া
রাধিকা সুন্দরী তোলে খোঁপা ভরিয়া ।।

(২৫)

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
বকরী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে
কিসের খাজনা কিসের বাদা
কিসের বারামমণ (ব্রাহ্মণ)
চতুর্দিকে ছায়া ।।

প্রচলিত এই ঘুমপাড়ানী ছড়ায় 'বর্গী' শব্দটির ব্যবহার প্রচুর, এখানে 'বকরী' শব্দটি বর্গীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ।

(২৬)

নাই জাংলার তলে লো জোড় পুতুলের বিয়ে
জোরে জোরে সানাই বাজে ঘণ্টা বাজে বয়ে
দ্যাখলো ছেড়িরে বর কতদূরে

বসন তলা কাপড় দিয়ে খুচবি জামাইয়ের মুখ
ঘি সলতা না দিয়া দেখবি জামাইয়ের মুখ
কাঁঠালের পিরিসান ঘি ঘি ম-ম করে
তারি মধ্যে বাপে বসে কন্যাদান করে
বাপে এসে নাই নাই খুড়ায় এসে ধরে
শিশুতে বিয়ে দিলে সদাই আগুন জ্বলে ।।
ছড়াটিতে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে।

(২৭)

মামাগো বাড়ী গেছিলাম
জল পাই গাছে চড়িলাম
ডুব দিতে পউছিলাম ঘাটে
মামা দেখল ধরল না
মামী দেখল ধরল না
দাদা আছে বারান্দায়
নিত্যি বাজায় হরিন্দায় ।।

(২৮)

আর গিলা রে ভাই
চিড়াকুট খাই
একখান চিড়া পড়লে পড়ে
ঘরে বসে কান্দলে পড়ে
দেওরে মারে ইঁটে
নদীর কাদায় কান্দলে পরে কুমোর মারে পিছে
কোথাও কোথাও ভাটি গাঙ্গ দিয়া
আমার ভাইরে আসবার কই ও নেয় যেন এসে
ই মাস খান থাক বুন কাপাই কুপাই দিয়ে
উ মাসে যে নিবার আসুম শাল ধান কেটে
শাল ধান বাপুর ঘুপুর ফ্যাচা আদার খায়
আমার যে বুন খান, পরের হাতে পড়ছে
পরের হাতে থাকতে থাকতে শরীর হয়ে গেছে কালা
বিধাতায় লেইখ্যা দিছে দিদির বড় জ্বালা ।

(২৯)

টৌপির মাই টৌপির মাই
মামার বাড়ী যাইস

আম দিম কাঁঠাল দিম
দুয়োতে বসে খাইস
মরা সুতো পাকে দিন
বানার হাট যাইস
না যাং মুই বানার হাট
নাও ডুবিছে
নাওয়ের উপর ঢোড়া সাপ
চটকি উঠিছে ।।

(৩০)

মাও আনিল নাড়ি মোলা
বাবা আনিল খাট
ঐ খাটেতে চড়িয়া যাব
বৃন্দাবনের হাট
বৃন্দাবনের হাটেতে পাইক বসিছে
ওকি না ঘর কায় মুছিছে
চম্পা মুছিছে
চম্পা হাততো শাঁখা সিন্দুর
ফুল ফুটিছে ।।

(৩১)

বৈচি নন্দে / তেলা কুচেগন্ধে
তেলা নড়ে, হাউই ছোটে.
তীর ধনুকের বাড়ি পড়ে ।

বৈচি খেলার ছড়া

(৩২)

ছি কুত্ কুত্ তারে নারে
টুটু ডাকে বারে বারে ।

(৩৩)

আগডুম বাগডুম সাজতে সাজতে,
রেল গাড়ি পা পিছলে,
আলো ধুম সবুজ বাদাম
গোলাপ ফুল, তা তা থুড়ি,
উনিশ কুড়ি বুড়ি ।

(৩৪)

আমি যাব আকাশে
জল খাব গেলাসে।

(৩৫)

হাড়ির মধ্যে নুন
তুইকি আমার বোন।

(৩৬)

আয়রে পাখি বয়রে ডালে,
ভাত দেব তোর সোনার থালে,
খাবি দাবি বুল বুলাবি,
মণির নিয়ে ঘুম পাড়াবি ।।

(৩৭)

কেন্দনা কেন্দনা সোনা
কাজল মুছে যাবে।
তোমার মামা গরীব মানুষ
পয়সা কোথায় পাবে ।।

(৩৮)

মনা যাবেরে কনে
কলকাতার ঐ এক শহরে,
সেখান মনা কি কাজ করে
ফুল তোলে আর খেলা করে।
ও ফুল গাঁথব থরে থরে
ও ফুল দিব নদীর চরে
মুঠো মুঠো খই
আর ঝিনুক ঝিনুক দই।
খেতে হয় খাও, না খেতে হয়,
উঠে বাড়ি যাও।

(৩৯)

মণি যাবেরে সঙ্গে
বাঘ ভালুকের সঙ্গে।
সেখান মণি কি কাজ করে
ফুল তোলে আর খেল করে ।।

(৪০)

খোকন ঘুমাইরে
মালি পাড়ারা ভাত রান্ধে
ব্যাঙ্গ ভাতে দিয়ে ।।

(৪১)

এ্যালোলো ব্যালোলো চিংড়ি মাছের খোসা
জোয়ান মেয়ের বুড়ো স্বামী নিত্তি করে গোঁসা ।

(৪২)

খোকন নাচে আলু গাছে
ঠ্যাং ধরেছে বোয়াল মাছে ।
ও ঠ্যাং তুই ফিরে আয়
মল গড়ে দেব মণির পায় ।।

(৪৩)

ওরে সোনার বুদ্ধি, / ফেলব কুয়ার মধ্যি ।
সোনা খাবে ফটিং জল ।
আমরা দেখব মজার কল ।

(৪৪)

খোকন নাচে ধিনিয়ে
কাপড় দেব বুনিয়ে,
তাতে দেব নীলের ছোপ,
পুড়ে মরবে দেশের লোক ।

(৪৫)

খোকন নাচে অঙ্গে
বাঘ ভালুকের সঙ্গে,
খোকনরে তুই বাড়ি আয়
দুধ থুইছি জুড়িয়ে ।
কলা থুইছি বিনিয়ে
খোকন খাবে দাঁড়িয়ে ।

অধ্যায়/চার

কিংবদন্তী : সত্য মিথ্যা সম্ভাবনার ত্রিবেণী সঙ্গম

কিংবদন্তী কি গুজব ? ইংরেজীতে যাকে আমরা বলি Rumour। একথা ঠিকই যে গুজব সম্পর্কে বলা হয়, যা রটে তার কিছু বটে। যতই কেন গুজবকে আমরা অস্তিত্বহীন বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি কিছুটা সত্যতা তাতে থাকে অনেকক্ষেত্রে। কিন্তু তবুও কিংবদন্তী এবং গুজব কখনও এক নয়। নয় এই জন্য যে এমন অনেক কিংবদন্তীর সাক্ষাৎ মেলে যার পিছনে পুরোপুরি বাস্তবের সমর্থন রয়েছে। আবার এমন অনেক কিংবদন্তী আছে যেগুলির সঙ্গে হয়ত বাস্তবের কোনই সম্পর্ক নেই।

কেউ কেউ বলেছেন কিংবদন্তী হল লিজেন্ড। লিজেন্ড বলতে আমরা ইতিকথাকে বুঝিয়ে থাকি, যে ইতিকথার সঙ্গে অনেক সময়ে ঐতিহাসিক চরিত্রের যোগাযোগ ; কোন গোষ্ঠীর উপকারী ব্যক্তির অথবা ভোজনের সময় যে মাহাত্ম্য কথা কীর্তিত হয় তাকে লিজেন্ড পদবাচ্য করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে কিংবদন্তী এবং লিজেন্ড কখনও সমগোত্রীয় নয়। তবে কি কিংবদন্তী মিথের সঙ্গে তুলনীয় ? মিথ বলতে আমরা বুঝি লোকপুরাণ। বিভিন্ন নৈসর্গিক পরিণতির কারণানুসন্ধান করতে গিয়ে মিথের উদ্ভব। তাই মিথকে বলা হয়েছে Primitive science ; যেহেতু সেখানে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু কিংবদন্তীতে তেমন কোন কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হয় না। অতএব লিজেন্ড, রিউমার কিংবা মিথ কারো সঙ্গেই কিংবদন্তীর তুলনা চলে না। তবে চরিত্রে কিংবদন্তী লোককথাধর্মী। অবশ্য লোককথা এবং কিংবদন্তী কিছুটা সমলক্ষণাক্রান্ত হলেও দুই অভিন্ন এমন কথা বলা যাবে না। পার্থক্যটা কি রকম দেখা যাক—লোককথা আকৃতিতে মোটামুটি ছোটগল্পের তুল্য। খুব বড় নয় বা খুব ছোট নয়। কিন্তু কিংবদন্তী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রাকৃতির। লোককথা পরিপূর্ণ রূপে গল্পের লক্ষণাক্রান্ত হলেও কিংবদন্তীতে গল্পরস পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর। লোককথায় যেমন কাহিনী কাঠামো থাকে ; একটি বিশেষ উপস্থাপন ভঙ্গি অনুসৃত হয়, সেক্ষেত্রে কিংবদন্তীতে দেখি একটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত হতে। সেখানে কাহিনী

কাঠামো তেমন ভাবে লক্ষিত হয়না। কিংবদন্তীতে শ্রোতার কৌতূহল জাগে, কিন্তু লোককথার মতো আকর্ষণ, লোককথার গতিশীলতা, ধারাবাহিকতা কিংবদন্তীতে অনুপস্থিত। লোককথায় মানুষ অথবা মনুষ্যেতর প্রাণীর একাধিক চরিত্র বিদ্যমান। লোককথার একটা পরিণতিও লক্ষিত হয়। কিন্তু কিংবদন্তীতে অনেক সময় চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না। অথবা মিললেও এক বা সীমিত সংখ্যক মেলে। কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে পরিণতির কোন প্রশ্নই নেই। তবে লোককথা যেমন গদ্যে রচিত, কিংবদন্তীও তাই। লোককথা যেমন স্মৃতিনির্ভর, শ্রুতি নির্ভর কিংবদন্তীও সেই ধর্মাশ্রিত। লোককথায় রচয়িতার সন্ধান যেমন মেলেনা কিংবদন্তীরও রচয়িতার সন্ধান মেলা ভার।

কেউ কেউ ভাবতে পারেন কিংবদন্তী এবং লোকবিশ্বাস বুঝি বা সমগোত্রীয়। একথা ঠিকই যে কিংবদন্তী টিঁকে থাকে লোকবিশ্বাসের উপর। কিন্তু তাই বলে লোকবিশ্বাস এবং কিংবদন্তী কখনই এক নয়। এক যে নয় আমরা তার প্রমাণ স্বরূপ কিছু যুক্তির উল্লেখ করব। লোকবিশ্বাস সংহত সমাজের মানুষের দৈনন্দিন আচার আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, গৃহ থেকে নিষ্ক্রমণের ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সংগ্রহ এবং অপরকে দানের ক্ষেত্রে। প্রাকৃতিক কিছু কিছু ঘটনা সংগঠিত হবার সঙ্গে এবং অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে লোকবিশ্বাস জড়িত। কিন্তু কিংবদন্তী সংহত সমাজের মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের কোন ভূমিকা পালন করেনা। দ্বিতীয়তঃ মূলতঃ আচার-আচরণ সম্পর্কিত হওয়ার ফলে লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গটি একান্তভাবে সীমাবদ্ধ যেমন যাত্রার সময় হাঁচি পড়লে যাত্রা করতে নেই। কিংবা তিন ব্রাহ্মণে যাত্রা নিষেধ। অথবা জল খেতে গিয়ে বিষম খেলে ধরা হয় অন্য কেউ তার নাম করছে। কিন্তু কিংবদন্তী কোন ঘটনা, কোন স্থান নাম, বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর উৎপত্তি অথবা তাদের আক্রোশ বা করুণা বিতরণ, নদনদী বৃক্ষের উদ্ভব বা তাদের নামকরণ সম্পর্কিত কাহিনী। অশরীরী বিভিন্ন শক্তিদের ক্রিয়া কলাপ-সংক্রান্ত বিষয় মূলতঃ কিংবদন্তীর উপজীব্য। তৃতীয়তঃ লোক বিশ্বাসের মূলতঃ দুটি দিক—কোন কিছুকে মানলে ভালো ফল লাভের সম্ভাবনা কিংবা না মানলে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। মূলতঃ আমাদের ঐহিক ভালোমন্দের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের সম্বন্ধ। কিন্তু কিংবদন্তীর সঙ্গে আমাদের ঐহিক ভালোমন্দের সম্পর্ক থাকে না।

কিংবদন্তীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সন্ধান করা যেতে পারে। ইতিহাস সত্য নির্ভর, পাথুরে প্রমাণকে অবলম্বন করেই ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসে অনুমানের কোন স্থান নেই। বিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু কিংবদন্তীতে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান লভ্য হলেও তাই বলে কিংবদন্তী ও ইতিহাসকে অভিন্ন বলা যাবে না। ইতিহাস কিংবদন্তী থেকে অনেক উপাদান

গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কিংবদন্তীর মধ্যে অনেক অতিরঞ্জন থাকে। লোক মুখে কথা ও বিশ্বাস ছড়াতে ছড়াতে অনেক সময় তা এমন একটা রূপ নেয় যার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এমন কি অবিমিশ্র কল্পনার সন্ধানও মেলে কিংবদন্তীতে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে বিশেষভাবে স্থানীয় ইতিহাস রচনায় কিংবদন্তীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যেমন —বৌড়ুবির খাল যে কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে টিঁকে আছে, তা থেকে এই সত্য আমরা জানতে পারি যে এক সময় স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াতের ব্যাপারে নৌকা এই যানটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 'ঠেঙাড়ে বট' এর মত কিংবদন্তী থেকে বোঝা যায় বিশেষ অঞ্চলে একসময় ঠেঙাড়েদের বিশেষ উপদ্রব ছিল। বর্তমানে ঠেঙাড়েদের তুলনায় অনেক ঘৃণ্য অসামাজিক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু ঠেঙিয়ে মারার অমানবিক পদ্ধতি বর্তমামে প্রায় অন্তর্হিত। নদনদী বিশেষ বিশেষ লৌকিক দেবদেবী বা মন্দির, বিশেষ স্থানের নাম ইত্যাদির ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সংগত কারণেই বলা হয়েছে, "আমাদের বহু গ্রাম বিল, ঝিল, মাঠ-ঘাট, নদনদী, খাল-দীঘি, মন্দির মসজিদ ইত্যাদির নামের সঙ্গে বহু কিংবদন্তী এবং কাহিনী জড়িত আছে, স্ব স্ব গ্রাম, মাঠ ঘাট ইত্যাদির ঐতিহ্যের প্রতি যদি সমগ্র দেশবাসী সচেতন হন তবে আমাদের অনেক ইতিহাস ও কাহিনী সংগৃহীত হইতে পারে।"

বিষয়ববস্তু অনুসারে আমরা কিংবদন্তীকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করতে পারি। (ক) অবিমিশ্রভাবে সত্য ঘটনা ভিত্তিক —এই ঘটনা বিশেষ স্থান অথবা চরিত্র অবলম্বনে গঠিত হতে পারে।

(খ) সত্য এবং কল্পনাকে মিশ্রিত করে সৃষ্ট কিংবদন্তী।

(গ) একান্তভাবে কাল্পনিক চরিত্র বা ঘটনা কেন্দ্রিক।

এতো গেল চরিত্র (`pii:) অনুযায়ী কিংবদন্তীর সাধারণ বিভাগ। এবার আমরা বিষয়বস্তু অনুযায়ী কিংবদন্তীগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যেমন—

(ক) ঐতিহাসিক চরিত্রকেন্দ্রিক।

(খ) ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রিক।

(গ) একান্তভাবে স্থানীয় ঘটনাকেন্দ্রিক।

(ঘ) বিশেষ বিশেষ লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক।

(ঙ) অশরীরী চরিত্রকেন্দ্রিক।

(চ) বৃক্ষ, নদনদী, খাল, স্থানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট কিংবদন্তী।

(ছ) পৌরাণিক ঘটনা বা দেবদেবী কেন্দ্রিক কিংবদন্তী।

এবার আমরা কিংবদন্তীর কিছু বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে নির্দেশ করব। যদিও ইতিপূর্বে কিংবদন্তীর সঙ্গে ইতিহাস, লোককথা, লিজেণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে কিংবদন্তীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। (ক) সচরাচর কোন এক বিশেষ স্থানে কোন এক বিশেষ সময়ে কোন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় কিংবদন্তী।

(খ) কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত চরিত্র বা স্থানের নিজস্ব এবং প্রত্যক্ষ একটি পরিচয় ছিল বলেই সাধারণ মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে থাকে। সবসময় যে বাস্তব চরিত্র বা বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে কিংবদন্তী উদ্ভূত হয় তা নয়, অনেক সময় অলৌকিক চরিত্র বা ঘটনা অবলম্বনেও কিংবদন্তী সৃষ্ট হয়। কিন্তু সর্বোপরি কিংবদন্তীর চরিত্র লৌকিক। কেননা তা না হলে লোকসাধারণের দ্বারা তা গ্রাহ্য হয়না। লোকসাধারণের অন্তরে তা শিকড় গাড়ে না। যতই কেন অলৌকিক চরিত্রের করুণা কিংবা নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি হোক, সর্বোপরি যা লোকমুখে লোকসাধারণের দ্বারা গৃহীত হয়ে প্রচার লাভ করে, তাকে তো লৌকিক বলে স্বীকার করতেই হবে।

(গ) কেউ কেউ এমন কথা বলেন অলৌকিক ঘটনাবলী এর উপজীব্য। কিন্তু আমরা পূর্বে কিংবদন্তীর যে শ্রেণীবিভাগ করেছি তাতে অলৌকিক বিষয়ের সঙ্গে লৌকিক বিষয় নির্ভর কিংবদন্তীও উল্লিখিত হয়েছে, কিংবদন্তী যে সকল ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বকে আশ্রয় করে তা কিন্তু নয়।

(ঘ) কিংবদন্তী যে কেবল অতীতের ব্যাপার তাও নয়। বর্তমানের সঙ্গেও তার যোগ। এই যোগ দ্বিবিধ ভাবে। একদিকে অতীতের কিংবদন্তী বর্তমান প্রজন্ম বিশ্বাস করে আসছে সে দিক দিয়েও বটে। তা ছাড়া যে কোন ঘটনা বা ব্যক্তি বিশেষের আচরণ মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে, যে ঘটনা মানুষ যুক্তি দিয়ে সব সময় ব্যাখ্যা করে উঠতে পারে না, সেগুলি শেষপর্যন্ত কিংবদন্তীর রূপ নেয়।

কিংবদন্তীর সংজ্ঞা দান করা সহজ কথা নয়। একজন গবেষক কিংবদন্তীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে—"ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে লৌকিক কথা সাহিত্যের রূপ ধারণকারী লোককাহিনীকে কিংবদন্তী বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তবে Folklore এর পরিভাষায় একে স্থানিক কাহিনী বলা সংগত।" এখানে কিংবদন্তীকে ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণ বলে বলা হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে তাকে লোককাহিনী হয়ে উঠতে হবে। নতুবা তা কিংবদন্তীর মর্যাদা প্রাপ্ত হবে না। কিন্তু আমরা আমাদের পূর্ব বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলতে চাই যে কিংবদন্তী মানেই তা ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে রচিত হবে তা নয়। আমরা এক্ষেত্রে ইতিহাস বলতে বাস্তব ঘটনাকে নির্দেশ করতে চাইছি।

অবিমিশ্র বাস্তব চরিত্র বা ঘটনা অবলম্বনে যে কিংবদন্তী গড়ে ওঠে, ক্ষেত্র বিশেষে তাতে অতিরঞ্জন যুক্ত হলেও সর্বক্ষেত্রে যে অতিরঞ্জিত হবেই অর্থাৎ কল্পনামিশ্রিত হবেই এমন কথা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ স্থানিক কাহিনী রূপে কিংবদন্তীকে অভিহিত করা যায় কিনা সেটি একটি বিবেচ্য বিষয়। আমরা কাহিনী বলতে তাকেই বুঝি যা বাস্তবে সংঘটিত হয়। অথবা যে ঘটনার কথা কল্পিত হয়। মোটের উপর কাহিনীর একটা ধারাবাহিকতা থাকা আবশ্যক। ঘটনাকে আশ্রয় করে কাহিনী গড়ে উঠলেও সব সময় ঘটনা কাহিনী হয়ে ওঠে না। যেমন কোন কোন ব্যক্তি বিশেষ একটি বটবৃক্ষের শাখায় রজ্জু বন্ধন করে আত্মহনন করায় সেই গাছটির নাম হয়ে উঠল 'গলায় দড়ে বট', এটি একটি ঘটনা ছাড়া কাহিনী নয়। এইবার এই গলায় দড়ে বটের তলদেশ দিয়ে যেতে গিয়ে কোন ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনাকে আশ্রয় করে যে অতিরঞ্জিত রূপ আত্মপ্রকাশ করে তাই হল কাহিনী। মুহম্মদ ফরিদ উদ্‌দীন তাঁর 'কাহিনী—কিংবদন্তী' গ্রন্থে (১৯৮৬) বলেছেন, 'যুগের পর যুগ যেসব সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে সেইসব লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা কাহিনী-কিংবদন্তী বা জনশ্রুত কাহিনী। কে-কি-কেন-কবে-কোথায় এ সবের উত্তর এই জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীতে অনুপস্থিত'। মুখে মুখে ত বাক্‌কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির সব কিছুই চলে আসছে, তাই বলে কি সে সবই কিংবদন্তী? আর অনেক কিংবদন্তীতেই কবে, কখন কোথায় ইত্যাদির উত্তরও প্রদত্ত হয়। মুহম্মদ ফরিদ উদ্‌দীন অন্যত্র বলেছেন, 'ঐতিহাসিক কোনো ঘটনার উপর ভিত্তি করে স্মৃতিপটে বিজড়িত হয়ে যখন মানুষের মনের রং তুলিতে একটা কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে যায় তখনই তাকে কাহিনী কিংবদন্তী বা জনশ্রুত কাহিনী বলে আখ্যায়িত করা যায়।' তার মানে অলৌকিক ঘটনা বা চরিত্র কেন্দ্রিক যা তাকি কিংবদন্তীর পর্যায়ভুক্ত নয়? নিছক বাস্তব ঘটনা বা চরিত্রই কি কিংবদন্তীর বিষয়? আমরা আমাদের মতো করে তাই কিংবদন্তীর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হবো। বিশেষ অঞ্চলে সংঘটিত কোন ঘটনা অথবা কোন চরিত্র কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র আখ্যান যখন সেই অঞ্চলের মানুষ প্রজন্ম পরম্পরায় মনে রাখে এবং বিশ্বাস করে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার উত্তরাধিকারীত্ব রেখে যায়, লোককথার লক্ষণাক্রান্ত ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট মূলতঃ আচারাদির সঙ্গে অসম্পৃক্ত এবং ঐতিহাসিক মর্যাদালাভে বঞ্চিত বিষয়কেই আমরা কিংবদন্তী বলে অভিহিত করতে পারি।

আমরা এবার কিংবদন্তীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করব।

(ক) **বারুণীর কপালমোচন তীর্থঃ** মেদিনীপুরের তমলুকে রয়েছে। পৌষপার্বণের দিন এখানে বিরাট মেলা হয়। গঙ্গাসাগরের মেলায়

যাওয়ার আগে সবাই এখানকার পুকুরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নেয়। লোক মুখে শোনা যায় ভগবান বিষ্ণু এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ছিল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ। বিষ্ণু ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। হাত দিয়ে তিনি কপালের ঘাম মুছে ঝেড়ে ফেললেন। এই ঝেড়ে ফেলা ঘাম থেকে সৃষ্টি হল এই পুকুরের। কপালের ঘাম মুছে ফেলা থেকে এর সৃষ্টি তাই এই পুকুরের নাম কপাল মোচন তীর্থ।

এই কিংবদন্তীতে আমরা অলৌকিকত্বের প্রাধান্য দেখছি। বিষ্ণুর কপালের ঘাম থেকে একটি পুকুর সৃষ্টির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য বাস্তবতার দিক দিয়ে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য না হলেও কিংবদন্তীর রাজ্যে দিব্যি তা গৃহীত হয়েছে। এখানে এই বিশেষ জলাশয়ের নামকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে কাহিনীটি কল্পিত হয়েছে। এতে গল্পরস অবশ্য তেমন দানা বাঁধেনি।

(খ) **মস্তারাম বাবাজির আখড়া**—মুর্শিদাবাদ জেলার বড় নগরের সাধক বাগে মস্তারাম বাবাজির আখড়া অবস্থিত। কথিত আছে রাণী ভবানীর কন্যা তারা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, একদিন তিনি স্নান সেরে বড়নগরের প্রাসাদের উপরে চুল শুকাচ্ছিলেন। প্রাসাদের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভাগীরথী। সেই সময় ভাগীরথীতে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছেন। হঠাৎ নবাবের নজরে এলো প্রাসাদের উপরে সুন্দরী তারা। সিরাজ তারার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করার জন্য কতকগুলি লোক পাঠালেন। রাণী ভবানী চিন্তিত হয়ে রাম উপাসক মস্তারাম বাবাজির সাহায্য প্রার্থনা করেন। মস্তারাম বাবাজী তপস্যা বলে হাজার হাজার সৈন্য সৃষ্টি করেন। সিরাজ তারাকে হরণ করার আর সাহস দেখালেন না। মস্তারাম বাবাজির আখড়ার নিয়মিত পুজোদি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কিংবদন্তীতে কিছু ঐতিহাসিকতার ছাপ ফেলার চেষ্টা হয়েছে। সিরাজদ্দৌল্লা কিংবা রানী ভবানী ঐতিহাসিক চরিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু মস্তারাম বাবাজি কর্তৃক তপস্যা বলে হাজার হাজার সৈন্য সৃষ্টির বিষয়টি অলৌকিকতা প্রসূত। বেশ বোঝা যায় এই কিংবদন্তীর উদ্দেশ্য হল মস্তারাম বাবাজীর মাহাত্ম্য প্রচার।

(গ) **কিরীটেশ্বরীর মন্দির**ঃ মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীর তীরবর্তী একটি স্থান কিরীটি কণা। কিংবদন্তী আছে দক্ষ যজ্ঞের সময় অনুপস্থিত শিবের নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করলে শিব সতীর দেহ নিয়ে তাণ্ডব করতে থাকেন। খণ্ড বিখণ্ড দেহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। সতীর কিরীটির একটি কণা এখানে পড়ে। তাই জায়গাটির নাম কিরীটি

কণা। কিরীটি কণার মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী কিরীটেশ্বরী। অত্যন্ত জাগ্রত দেবী।

এখানে পৌরাণিক ঘটনাকে আশ্রয় করে কিংবদন্তীটি গড়ে উঠেছে। সতীর দেহত্যাগের ঘটনা নিয়ে নানা কিংবদন্তী নানা স্থানে প্রচলিত আছে। বিশেষত সতীর দেহের বিভিন্ন অংশ যে যে স্থানে পড়েছিল বলে অনুমিত হয় সেই সেই স্থানে তীর্থ গড়ে উঠেছে। এখানে সেইভাবে কিরীটেশ্বরীর মন্দির ও দেবীর প্রসঙ্গটি কিংবদন্তীতে স্থান পেয়েছে।

(ঘ) **মা মহামায়ার মন্দির ঃ** বাঁকুড়ায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। প্রতিদিন এখানে সন্ধ্যারতি ও পুজো হয়। মন্দিরের পাশে একটি পুকুর রয়েছে। শোনা যায় একজন শাঁখারি এখানে মেয়েদের শাঁখা পরাতে এসেছিলেন। সেই সময় একটি মেয়ে শাঁখা পরে বলে মন্দিরে তার পুজারী বাবা আছেন। তিনিই শাঁখার দামটা দিয়ে দেবেন। শাঁখারি মন্দিরে গিয়ে পুজারীর কাছে শাঁখার দাম চাইল। পুজারী অবাক হয়ে জানালেন তার মেয়ে নেই। তখন শাঁখারি ও পুজারী তাড়াতাড়ি পুকুরের কাছে গেলেন। যেদিকে শাঁখা পরে মেয়েটি গিয়েছে। পুকুরের জলে দৃষ্টি পড়তে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। দেখলেন পুকুরের জলে দশহাত তুলে দিয়ে শাঁখাগুলি দেখাচ্ছেন স্বয়ং মহামায়া। শাঁখারি এরপর দামতো চাইলই না, উপরন্তু প্রতি পুজোর সময় বিনা পয়সায় মহামায়াকে শাঁখা পরিয়ে দিয়ে যায়। সেই শাঁখারির বংশধররা আজও দীর্ঘদিন ধরে সেই রীতি অনুসরণ করে চলেছে।

একটি সম্পূর্ণ অতিলৌকিক ঘটনাকে অবলম্বন করে বর্তমান কিংবদন্তীটি গড়ে উঠেছে। অলৌকিক ঘটনা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস নির্ভর। মহামায়ার মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে। আর শাঁখারি বংশের মানুষ আজও বিশ্বাস করে বিনা পয়সায় শাঁখা পরিয়ে দিয়ে যায়। এই ঘটনার সত্যতাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি না। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ এই ঘটনা বিশ্বাস করে। নইলে এই কিংবদন্তী আজও টিঁকে থাকত না। প্রসঙ্গত শাঁখা পরার ঘটনা অবলম্বনে একাধিক কিংবদন্তী একাধিক অঞ্চলে প্রচলিত আছে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনাটি অবলম্বন করে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান রচিত হতে দেখা গেছে।

ঙ **পাসলীর পেটকাটা দুর্গা ঃ** মুর্শিদাবাদে রঘুনাথগঞ্জের পাশে গদাইপুরের পাসলায় পেটকাটা দুর্গার অধিষ্ঠান। এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রতা। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস একজন এখানে মানত করে মানতের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি, তাই তার ছেলেকে দুর্গা গিলে ফেলেন। তখন দুর্গার পেট

কেটে ছেলেকে বের করা হয়। বিশেষ করে এখানে নাকি পাগল ভালো হয় মানত করলে।

এটিও একটি অলৌকিক ঘটনা নির্ভর কিংবদন্তী। প্রতিমার সন্তান গিলে ফেলে প্রতিশোধ গ্রহণ, খুবই বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নেই। আসলে মানত করলে যাতে মানুষ তা রক্ষা করে সে ব্যাপারে ভয় দেখানো হয়েছে পাগল ভালো হওয়ার বিষয়টিও একান্তভাবে বিশ্বাসের বিষয়।

চ) **ক্ষ্যাপার দরগা** : নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে বাণিয়ায় রয়েছে ক্ষ্যাপার দরগা। এমন জাগ্রত দরগা নাকি আর দুটি নেই। যে কোন কাজেই ভক্তি করে ক্ষ্যাপাকে ডাকলে বা মানত করলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস প্রচলিত। প্রতি ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবার এখানে বিরাট মেলা বসে। এই উপলক্ষে এখানকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। কথিত আছে ক্ষ্যাপারা ছিল দুই ভাই। ক্ষ্যাপা ছোট। ক্ষ্যাপার দাদা মাঠে চাষ করে। একদিন দাদা জোর করে ক্ষ্যাপাকে মাঠে পাঠায় ধান পাহারা দিতে। বাবুই এসে যাতে ধান না খেয়ে ফেলে তা দেখার জন্য। ক্ষ্যাপা মাঠে গিয়ে দেখে বাবুই পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে ধান খাচ্ছে। সে বাবুইদের তাড়ায় তো না উপরন্তু ধান খেতে খেতে যদি বাবুই-এর গলার ধান আটকে যায় তাই ক্ষেতের চারপাশে ভাঁড়ে করে জল এনে রেখে দেয়। ক্ষ্যাপার দাদা এসে দেখে ক্ষেতের ধান প্রায় সব শেষ। রাগে দাদা ক্ষ্যাপাকে জোয়াল দিয়ে মারে। ক্ষ্যাপার খুব দুঃখ হয়। মাঠে ধান ছিল বড়ই কম, কিন্তু খামারে তোলার সময় ক্ষ্যাপা তার দাদাকে বলল, নাও যতখুশি ধান। ক্ষ্যাপার দাদা গোলায় ধান তুলছে তো তুলছেই আর শেষ হয়না। গোলা ভর্তি হয়েও দেখে তখনও প্রচুর ধান পড়ে রয়েছে। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ক্ষ্যাপা মারা যায়। জনশ্রুতি এই যে ক্ষ্যাপার দরগার পাশে পথ হারিয়ে ফেললে ক্ষ্যাপা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। এই অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ গাছের প্রথম ফল এই দরগায় দিয়ে তবেই তা ভক্ষণ করে।

ধর্মসংক্রান্ত কিংবা দেবদেবী ফকির দরগাকে কেন্দ্র করে সর্বদা অলৌকিক কাহিনী বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একটাই তা হল বিশেষ দেবদেবী, পীর ফকিরের মাহাত্ম্য প্রচার। ক্ষ্যাপার অলৌকিক প্রভাবে প্রচুর ধান লাভের ঘটনায় ক্ষ্যাপার মাহাত্ম্যই সূচিত হয়েছে। অন্য অনেক কিংবদন্তীর মতো এক্ষেত্রেও অলৌকিকত্ব যাচাই করার কোন উপায় নেই। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষ কিন্তু তাদের সহজ সরল মনে ক্ষ্যাপার অলৌকিক ক্ষমতাকে গভীর শ্রদ্ধাসহ বিশ্বাস করে থাকে।

(ছ) **বাবা ভুতেশ্বরের মন্দির** : কাঁথির জ্যামুয়ার বাবা ভুতেশ্বর অত্যন্ত জাগ্রত। তিনি নাকি অনেকেরই মনোবাসনা পূর্ণ করেন বলে বিশ্বাস।

শোনা যায় জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি পুকুর কাটার বন্দোবস্ত করেছিলেন। পুকুর কাটার সময় বহুনীচে একটা পাথরে কোদালের আঘাত পড়ে। পাথরটা তুলে ফেলার জন্য যত মাটি খনন করা হচ্ছিল তত গভীরে যেন পাথরটির মূল প্রোথিত ছিল। ক্লান্ত হয়ে সবাই ফিরে যায়। রাত্রে যারা কাজ করে-ছিল তারা এবং যিনি পুকুর তৈরী করালেন তাদের সবাইকে ভূতনাথ স্বপ্ন-দেখান যে কোদালের আঘাতে তাঁর মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঐ স্থানে যেন মন্দির নির্মাণ করা হয়। স্বপ্ন দর্শনে ভূতেশ্বর মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে বলে বিশ্বাস প্রচলিত।

এখানে আমরা বিশেষ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার কারণ জানতে পারি। যুক্তির বিচারে এই কারণটির গ্রহণযোগ্যতা যাই থাক না কেন সংহত সমাজের মানুষ কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ব্যক্ত কারণটির প্রতি অবিচল ভাবে বিশ্বাস রক্ষা করে চলেছে।

(জ) **ঘোষপাড়ার এঁদো পুকুর :** নদীয়ার বার্ণিয়ায় (দেবগ্রাম) ঘোষপাড়ার এঁদো পুকুর সম্বন্ধে স্থানীয় অঞ্চলের মানুষদের ভয় মিশ্রিত ভক্তি রয়েছে। জনশ্রুতি এই বিহার থেকে মহিষের দল চরাতে আসে দুই ভাই শম্ভুনাথ ও ভূতনাথ। শম্ভুনাথ এক বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে দেয়। শুরু করে চাষ বাস। একবার ভালো ধান তাদের হয়নি। গোলার ধান শেষ হয়ে গেলে পাছে অসুবিধায় পড়তে হয় তাই শম্ভুনাথের বউ আগে থেকেই আলাদা আরেকটি গোলায় কিছু ধান রেখেছিল বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। শম্ভুনাথের বউ সেই গোলা থেকে ধান আনতে গিয়ে দেখে গোলার উপরে স্বয়ং লক্ষ্মী পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। লক্ষ্মী জানালেন যে গোলার ধান যেন কখনই নামিয়ে নেওয়া না হয়। তাতে তাদের ক্ষতি হবে। শম্ভুর বউ কাউকে এই ঘটনার কথা বলেনি। কিন্তু বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে তাদের প্রচুর ধান ফলেছে। শম্ভু তাই কিছু ধান বিক্রি করে দেবে বলে ঠিক করে। বউ বাড়ী না থাকা অবস্থায় শম্ভু পুরানো গোলার ধান বিক্রি করে দিল। কিছু দিনের মধ্যে শম্ভুর বউ ও তার ভাই-এর ছেলে মারা গেল ; শম্ভুদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠল। এখন কেবল শম্ভুর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ও পুকুরটি রয়েছে। এখানে কেউ নামেনা। আজও দেখা যায় প্রতি অমাবস্যার রাত্রে একটি কালো মেয়ে উঠে আসে। তাকে দেখতে কালীর মতো।

একটি পরিবারের ধ্বংস প্রাপ্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে কিংবদন্তীটিতে। লক্ষ্মীর নির্দেশ অমান্য করার ফলেই এই বিপর্যয় ঘটেছিল বলে কিংবদন্তীটিতে বলা হয়েছে।

(ঝ) **কুমারপুরের রাধামাধবের মূর্তি ঃ**

মুর্শিদাবাদের নবাব নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর নির্মিত মোতিঝিলের পূর্বপাশে কুমারপুরে রাধামাধবের মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত আছে। জনশ্রুতি রয়েছে মন্দিরের প্রতিদিন ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি নবাব নওয়াজেস খাঁকে খুব বিরক্ত করতো। পুজো বন্ধ করার হুকুম দিলে কোন খারাপ প্রভাব পড়তে পারে, তাই নবাব কৌশল করে মুসলমানী খাদ্য রান্না করে পুরোহিতের কাছে পাঠান। পুরোহিত খাবারের ঢাকনী উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গ দেখেন যুঁই ফুলের মালা। নবাব বিশ্বাস করতে না পেরে নিজ হাতে মুসলমানী খাদ্য নিয়ে এলেন এবং পুরোহিতকে দিলে আগের মতোই খুলে দেখা যায় যুঁই ফুলের মালা। এর পব নবাব আর সেই পুজো বন্ধ করার চেষ্টা করেননি।

এখানেও অলৌকিকত্ব লক্ষিত হয়। মুসলমান নবাবের মন্দ প্রয়াস কিরূপে ব্যর্থ হল তা দেখানো হয়েছে আর তার মাধ্যমে রাধা-মাধবের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে।

(ঞ) **দারিয়াপুরের শিবলিঙ্গ ঃ** বঙ্কিম-স্মৃতি বিজড়িত দারিয়াপুর। রসুলপুর নদীর মোহনায় যেতে দারিয়াপুরে একটি শিবলিঙ্গ আছে। এর প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি জনশ্রুতি আছে।

এক গৃহস্থ —আত্মারাম পালের কয়েকটি গরু ছিল। গরুগুলি দেখার দায়িত্ব ছিল তার এক কর্মচারী রাখালের। সে প্রতিদিন বনে গরু চরাতে যায়। গরু ছেড়ে দিয়ে সে গাছতলায় বসে থাকে। গরুর পেট ভরলে আবার বাড়ী নিয়ে আসে।

এর মধ্যে একটা গাভীর দুধ প্রতিদিন কম হয়। পেট ভরে ঘাস খাওয়ানো হয় অথচ দুধ কম। গৃহস্থের সন্দেহ হল রাখাল হয়তো বনে গিয়ে গাভীর দুধ দোহন করে খেয়ে ফেলে। এই নিয়ে রাখালকে বকাঝকাও করা হল।

এদিকে রাখালের মনেও সন্দেহ, সত্যিই তো গরু পেট ভরে ঘাস খায় অথচ দুধ হয় না। ব্যাপারটা জানার জন্য সে একদিন বনে সব গরু ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র সেই গাভীর প্রতি নজর রাখলো। দেখল, গাভীটা ঘুরতে ঘুরতে একটা বটগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। আর অবাক কাণ্ড, সেখানে দাঁড়াতেই গাভীর বাঁট থেকে আপনা-আপনি দুধ পড়তে লাগলো। রাখাল ছেলেটি ব্যাপারটা দেখে গৃহস্থসহ আরো অনেককে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল। সবাই আশ্চর্য হয়ে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করল, তারপর তার কাছে গিয়ে দেখা গেল যেখানে দুধ পড়ছে সেখানে কালচে পাথরের মতো কি একটা দেখা যাচ্ছে। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখা গেল সেটা একটা শিবলিঙ্গ। অসতর্ক কোদালের কোপে শিবলিঙ্গের কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়।

এখনো শিবলিঙ্গটির একটা জায়গায় একটুখানি ভাঙা রয়েছে। প্রতিবছর এখানে মেলা হয়।

শিবলিঙ্গটির আত্মপ্রকাশ কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে স্পষ্টতই শিবলিঙ্গটির মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে।

(ট) মসনদ-ই-আলা / হিজলী শরীফ / বাবা সাহিবের দরগা :

দারিয়াপুরে যেখানে সমুদ্রে রসুলপুরের নদী এসে মিশেছে তার কাছেই হিজলী শরীফ মসনদ-ই-আলা বা বাবা সাহিবের দরগা। মসনদ-ই-আলা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী লোকের মুখে শোনা যায়। হিজলী শরীফের প্রাচীনত্ব সহজেই চোখে পড়ে। তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করে হিজলী শরীফটি নির্মাণ করেছিলেন। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত মসজিদটির সামনে রয়েছে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার মাজার। এই মসনদ-ই-আলা আবার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে এসে প্রার্থনা করে—এমন কোন জেলে সম্প্রদায় নেই যারা এখানে প্রার্থনা না করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়।

রাজা তাজ খাঁ রাজত্ব—বৈভব-বিলাসিতা ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং সিদ্ধিলাভ করে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। ভক্তি করে যে তাঁকে স্মরণ করে তারই সহায় হন তিনি. মাঝিরা তাঁকে স্মরণ করলে ঝড়ের ঝাপটা তাদের গায়ে লাগে না। একবার জলোচ্ছ্বাসে আশপাশ সব ডুবে গেলেও, সমুদ্রের তীরে হওয়া সত্ত্বেও হিজলী (হিজল গাছের আধিক্যের জন্য এ নাম হয়েছে) গ্রামে বাবা সাহিবের নির্দেশে জল ঢোকেনি বা কোন ক্ষয় ক্ষতি হয়নি। তাঁর এমন অনেক ক্ষমতার জন্য সাধারণ মানুষের মনে তিনি অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। প্রতিবছর চৈত্রমাসে এখানে একটা বিরাট মেলা বসে ও ধর্মালোচনা হয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানের সমাগম ঘটে। সমুদ্রপথে হাজার হাজার বাংলাদেশীও আসেন মেলায় যোগ দিতে।

বাবা সাহিবের দরগার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে তাজ খাঁর রাজত্ব ত্যাগ ও আধ্যাত্মিক পথের পথিক হওয়ার মত ঘটনা।

(ঠ) আশাবরী—মসনদ-ই-আলার মাজারের এক পাশে রয়েছে একটা লোহার রড—আশাবরী। এটা নিয়েও রয়েছে জনশ্রুতি।

তাজ খাঁর ছোট ভাই সিকন্দর ছিলেন অত্যন্ত বলশালী। কিন্তু আত্মভোলা। বিষয় আশয় সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ময়ূরভঞ্জের রাজকুমারসহ বহু বলবানকে তিনি মহাযুদ্ধে পরাভূত করেছেন। তাঁর হাতে সব সময় থাকতো লোহার রড. এটা দিয়ে বাঘ তাড়াতেন।

তাজ খাঁর বিশেষ স্নেহের আত্মভোলা আদরের ভাইটিকে সহ্য করতে পারতেন না তাঁর এক মহিষী। ষড়যন্ত্র করে সিকন্দরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তাজ খাঁ এই পরিকল্পনার কথা জ্ঞাত হয়ে মহিষীকে জানালেন তিনি পারলে যেন ছোট ভাইকে হত্যা করেন। তাজ খাঁর বিশ্বাস ছিল, সিকন্দরকে কেউ হত্যা করতে পারবে না। একদিন তাজ খাঁর মহিষী নির্জন বেলাভূমিতে অনুশীলনরত সিকন্দরকে হত্যা করতে ঘাতক দল পাঠালেন। সিকন্দর তাদের উদ্দেশ্য কি জানতে চাইলে তারা জানালো, তাজ খাঁ তাদের পাঠিয়েছেন তাঁকে হত্যা করতে। সিকন্দর একটু মুচকি হেসে অবিশ্বাসের সুরে বললেন, হত্যা কর আমাকে।

ঘাতকরা এরপর একাধিকবার সিকন্দরের গলা কেটে ফেললেও কিছুক্ষণের মধ্যে আবার গলা পুনরায় স্থাপিত হয়ে যায়। সিকন্দর এরপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে মারতে সত্যি সত্যিই কি দাদা পাঠিয়েছে ? ঘাতকরা জানালো, মহিষী তাজ খাঁর সম্মতিতে তাদের পাঠিয়েছেন। সিকন্দরের বড় অভিমান হল। বললেন, ঠিক আছে এবার গলা কেটে ফেল ঠিক কেটে যাবে—আর জোড়া লাগবে না। ঘাতকরা তাঁকে হত্যা করল। তাজ খাঁর মাজারের পাশে এখনো লোহার রডটি বর্তমান। —এই সামান্য লোহাটা তুলতে পারবো না—এমন আত্মগর্বী ভাব যে দেখায়, সে যতবড় শক্তিশালীই হোক না কেন, সেটি মাটি থেকে তুলতে পারে না, আবার একেবারে দুর্বল—এমন কি বাচ্চা ছেলেও, আত্মগর্বীভাব না দেখালে অনায়াসে সেই লোহার দণ্ডটি তুলতে পারে।

এই কিংবদন্তীটিতেও অলৌকিকত্বকে স্থান দেওয়া হয়েছে, সিকন্দরের গলা কেটে ফেললেও তা পুনরায় জোড়া লেগেছে। তবে কাহিনীর মানবিক দিক হল দাদার প্রতি সিকন্দরের অভিমান।

(ড) **ভীমেশ্বর মন্দির**ঃ হিজলী শরীফ থেকে খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না ভীমেশ্বর মন্দির। এটিও ছিল সমুদ্রের পাশে। সুদৃশ্য এই মন্দিরটি আজ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বছর দশ বারো আগেও মন্দিরটির অস্তিত্ব ছিল। মোটামুটি আজ যারা তরুণ-তরুণী, তাদের স্মৃতিতেও আজ জ্বল জ্বল করছে মন্দিরটি।

ভীমেশ্বর মন্দিরের দেবতা ছিলেন অত্যন্ত ভক্ত বৎসল। তাঁর আশ্রয়ে অনেকের অনেক মুশকিল আসান হয়েছে, একবার এক নিঃসন্তান মহিলা মন্দিরে গিয়ে মানত করে সন্তান। কামনা করে পরে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু পূর্ব প্রতিশ্রুত মানত আর দেয় না। ছেলেটির বয়স যখন ১৫-১৬ হয়েছে, তখন একবার বৃষ্টির সময় মন্দিরের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে, সঙ্গে

সমবয়সী একটি ছেলে। মন্দিরের ভেতরে একজন পুরোহিতও ছিলেন। সেই সময় মন্দিরে বাজ পড়ে। তাতে ছেলেটির সমবয়সীর বা পুরোহিতের কিছু না হলেও ছেলেটি মারা যায়।

আবার সেই দিনই গভীর রাতে মন্দিরের ভেতর থেকে অনেকে একটা স্পষ্ট আহ্বান শুনতে পেল, "গঙ্গা এদিকে আয়।"

পরের দিন সকালে সবাই দেখলো সমুদ্র মন্দিরের অনেক কাছে চলে এসেছে। এবং ক্রমশঃ মন্দিরটিকে গ্রাস করে নিল।

ভীমেশ্বর মন্দিরটির সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার কারণটিকেই কিংবদন্তীটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(চ) রামনগরের রামচণ্ডী মন্দির : মেদিনীপুর উড়িষ্যার সীমান্তের কাছে রামনগরে রয়েছে রামচণ্ডীর মন্দির। মন্দিরের ভেতরে একটা শিলাখণ্ড রয়েছে। তিনিই দেবীচণ্ডী। তিনিও অত্যন্ত জাগ্রতা দেবী, তাঁর পাশ দিয়ে যারা যায় তারা প্রত্যেকে তাঁকে ভোগ নিবেদন করে তবে যায়। এখনো প্রতিদিন অন্তত ৫০-৬০টা করে ভোগ তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত হয়।

কথিত আছে, রামচন্দ্র যখন রাবণ-নিধন করতে যাচ্ছিলেন তখন রামনগরের জঙ্গলে একরাত্রির জন্য অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।

পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে একটি মন্দির নির্মাণের ঘটনাকে এখানে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

(ণ) নদীয়ার চাঁদের কুমীর হওয়া :

নদীয়ার চাঁদ নামে এক চাষীর সন্তানের ইচ্ছে হল মন্ত্র শিখে নানা ধরনের খেলা দেখাবে। মন্ত্র শেখার উদ্দেশ্যে সে গেল কামাখ্যায়। সেখান থেকে মন্ত্রবিদ্যা শিখে এলো। একটা মন্ত্রের বলে সে কুমীরের বেশ ধারণ করতে পারতো।

একদিন নদীয়ার স্ত্রী দেখল শাশুড়ী বাড়ী নেই বেড়াতে গেছে। কেবল তার স্বামী নদীয়া বাড়ীতে রয়েছে। তার সাধ জাগলো স্বামীর কুমীর হওয়া দেখবে। বায়না ধরল কুমীর হতে। নদীয়া রাজি হয়না। কারণ তার স্ত্রী ভয় পাবে। স্ত্রী হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ জানালো সে ভয় পাবে না। অগত্যা নদীয়া রাজি হল। একটা গ্লাসের মধ্যে মন্ত্রপূত জল রেখে জানালো, কুমীর হওয়ায় পরে জলটা তার গায়ে ছিটিয়ে দিলেই সে আবার মানুষ হবে। আর জল না দিলে সেই কুমীর যদি কুমীরের খাদ্য মাছ খায় তাহলে আর সে আগের রূপ ধারণ করতে পারবে না।

নদীয়া অবশেষে কুমীরের রূপ ধারণ করল। নদীয়ার বউ ভয়ে চিৎকার করে ঘর থেকে পালাতে গিয়ে গ্লাসের মন্ত্রপূত জল মাটিতে ফেলে দিল। কুমীররূপী নদীয়া তিনদিন পর্যন্ত ঘরের মধ্যে কাটিয়ে ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে সামনের মধুমতী (বর্তমানে বাংলাদেশে) নদীতে নেমে মাছ শিকার করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। আর সে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে না।

এদিকে নদীয়ার চাঁদের মা বাড়ী ফিরে দেখে ঘর ফাঁকা। প্রতিবেশীদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মধুমতী নদীর পারে গিয়ে ছেলেকে আকুল ভাবে ডাকতে থাকে। এবং মায়ের ডাকে কুমীররূপী নদীয়াও সাড়া দিয়ে নদীর জলে ভেসে ওঠে। মা প্রতিদিন খাবার নিয়ে ডাকে -সে আসে। খেয়ে আবার চলে যায়।

একদিন তার মা কুমীররূপী নদীয়াকে ডাকলে যে মাঝ নদীতে ভেসে উঠে সাড়া দিল। ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা জাহাজ যাতে ছিল কয়েকজন ইংরেজ শিকারী। জাহাজের সামনে এই রকম একটা কুমীর দেখে লোভ সামলাতে না পেরে এক ইংরেজ শিকারী বন্দুক দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হল। নদীয়ার মা চীৎকার করে না মারার অনুরোধ করলো, কিন্তু সেই চীৎকার শিকারীর কানে পৌছায়নি। গুলি করলে জলের রং মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে গেল, কুমীররূপী নদীয়াকে আর কোনদিন দেখা যায়নি, কেবল তার মায়ের বুক ফাটা চীৎকার গভীর রাতে মধুমতীর আকাশ বাতাসে এখনও অনুরণিত হয়।

এই কাহিনীটির একটি কাব্যিকরূপ বয়স্কদের মুখে শোনা যায় -

নদীয়ার চাঁদ কামাখ্যায় গেল
- মন্ত্র বিদ্যা শিখে এলো হায়
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়

ইতিহাসে নাই একথা আছে পল্লী কবির মর্মে গাঁথা গো····
মধুমতীর বুকের কথা লেখা পল্লীর গায়···
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়।

আমার শাশুড়ী মা বাড়ীতে নাই
এমন সুযোগ আর না পাই গো···

তোমার পায়ে ধরে মিনতি জানাই
ঠেলো না আমায়
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়।

কুমীর হতে চাইল সে চাঁদ বউকে বিশ্বাস করে
একটি পাত্রে জল পড়ে হায় দিল তার করে
বলে, পরাণ প্রিয়া আমার
তোমার হাতে জীবন আমার গো…
আমি ধরব আবার মানুষ আকার …
এই দিলে গায়।
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়।

কুমীর হয়ে আসলো সে চাঁদ ঘরে ধেয়ে ধেয়ে
ও তার ঘরের ঐ রমণী ভীরু পালায় তার ভয়ে,
ঘরের ভিতর না খেয়ে ক'দিন থাকা চলে
তিনদিন পরে নামলো গিয়া সে
মধুমতীর জলে।
তার মা ডাকিলে উঠতো ভেসে
খাবার খেত কুলেতে এসে
একদিন শিকারী একসাহেব এসে
মারল অভাগার গায়
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়।

প্রফুল্ল কয় গভীর নিশায়
আজো সেই ঘাটে কেহ যদি যায় গো
করুণ একটি সুর শোনা যায়
আয়রে নদে আয়…
প্রাণ গেল তার নারীর মন্ত্রণায়।

কামাখ্যায় একসময়ে নানা বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র ছিল বলে প্রচলিত ধারণা, বিশেষত যে বিদ্যায় মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে কিংবা

অন্যের ক্ষতি সাধন করতে পারে। এই কিংবদন্তীতে নদীয়ার চাঁদের কুমীরের রূপান্তরিত হওয়ার অলৌকিক কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। কিংবদন্তীটির পরিণতিটি করুণ রসের।

(ত) গাজীর মেলা / রাজার গড় / গাজীর থান ঃ

চাকদার শ্রীরামপুরের কুটির মাঠে প্রতি বছর সরস্বতী পুজোর পরের দিন গাজীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দূর দূরান্ত থেকে আগত লোকের ভীড় এই মেলার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মেলাটা যাকে ঘিরে হয়, তাহল একটা শান বাঁধানো থান। থানটি মুসলিম দরবেশ গাজীর।

লোকমুখে শোনা যায়, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতা মুকুট রায়ের কুঠি বাড়ী ছিল শ্রীরামপুর—কুঠির মাঠে -মরালী নদীর নিকটে। মাঝে-মাঝেই সপরিবারে রাজা এই কুঠি বাড়ীতে এসে থাকতেন। রাজার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল —চম্পা। চম্পার রূপে মুগ্ধ রাজার স্থানীয় সেনাপতি ভিনধর্মী কালু। চম্পাও কালুর প্রেমে পড়ে—দুজনের গোপন প্রেম অভিসার নিয়মিত চলতে থাকলো।

কালুর এক দাদা ছিল। দরবেশ গাজী। গাজী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতো। অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বাঘকে বশীভূত করার মন্ত্র যেমন জানতো তেমনি নিজেও বাঘের রূপ ধারণ করতে পারতো। আর পারতো গরু-ছাগলের অসুখ নিবারণ করতে। সাধারণতঃ বাড়ী বাড়ী ঘুরে গরু-ছাগল কিভাবে ভালো থাকবে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে নিজের অন্নের সংস্থান করতো।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে গাজী ভাই কালুর সঙ্গে দেখা করতে রাজার গড়ে এলো। দূর থেকে দেখলো তাঁর ভাই আর রাজকন্যা চম্পা বাগানে বসে প্রেমালাপে নিমগ্ন। পরে গাজী ভাই কালুকে বলল চম্পাকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু কালু জানায় সে সামান্য সেনাকর্মচারী মাত্র। রাজার কানে এ প্রস্তাব গেলে তার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত গাজী স্বয়ং রাজার কাছে গেল ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। রাজা শুনে রাগে ক্রোধে হতভম্ব। তিনি গাজী এবং তার ভাই কালুকে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, গাজীও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। সে কালু আর চম্পাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে রাজার সেনাদের বিরুদ্ধে অভিনব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলো। দুর্গের আশে পাশের অঞ্চল ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেখানে ছিল বাঘেদের আস্তানা। প্রতিদিন রাত্রিবেলা গাজী মন্ত্রের সাহায্যে বাঘেদের নিয়ে এসে স্বয়ং বাঘের

বেশ ধারণ করে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী এবং রাজার সেনাদের হত্যা করতে থাকলো। কিন্তু এত কিছু করেও রাজাকে জব্দ করতে পারে না। কারণ রাজার ছিল একটি কুয়ো। সেই কুয়োর জল প্রাণ সঞ্চারক—মৃত সঞ্জীবনী। মৃতের গায়ে এক ফোঁটা কুয়োর জল ছিটিয়ে দিলেই মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতো।

রাজার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে গাজী একদিন একখণ্ড গো-মাংস সেই কুয়োতে ফেলে দেয়। কুয়োর জল অপবিত্র হয়ে যায়। কুয়োর জল আর জীবন-সঞ্চার করে না। একে একে প্রায় সমস্ত সেনা হারিয়ে রাজা এই স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে যান।

গাজী এর পর কিছুদিন জঙ্গলে অবস্থান করে আবার দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় মেলায় যারা আসে তারা সবাই গাজীর থানে দুধ-কলা-বাতাসা এবং মাটির ঘোড়া দিয়ে মানত করে যায়। আগে কেবল গরু বাছুর যেন ভালো থাকে—গৃহস্থরা এই কামনাই জানাত। এমনকি গরুর বাছুর হলে গাজীর থানে প্রথমে দুধ না দেওয়া পর্যন্ত তারা দুধ খেতনা। এখন আবার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নীরোগ থাকার জন্য মানত করা হয়। আর এই গাজীর থানে যারা মানত করতে আসে বা মেলায় আসে তার শতকরা ৯৯ ভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের। একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান থানে গরু বাছুর বা সন্তানের নীরোগ কামনা করছে।

দুর্গের চার পাশের পরিখা এখনো বর্তমান। আছে কয়েকটা পুকুর। তার মধ্যে একটা রাণীর পুকুর বলে খ্যাত। সেই পুকুরের মধ্য থেকে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র কিছুদিন আগেও পাওয়া গেছে, পাঁচ-সাত বছর আগে সেখানে খনন করতে গিয়ে সোনার মোহরও পাওয়া যায়।

গাজীর মেলা বা থানের জনপ্রিয়তা ও উদ্ভবের কারণ এই কিংবদন্তীতে উল্লিখিত। মূলতঃ গাজীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রসঙ্গটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য কুয়োর জলের মৃত সঞ্জীবনী শক্তির অধিকারী হওয়াতেও অলৌকিকত্ব বিদ্যমান। মুকুট রায়ের প্রসঙ্গকে যুক্ত করে কিংবদন্তীটিকে কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব দানের প্রয়াস লক্ষণীয়।

(থ) ডিমরিয়া ভাঙ্গার মাঠ :

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে সুবর্ণরেখা নদী ছিল খুবই সংকীর্ণ। এই নদীর তীরে ছিল একটি প্রকাণ্ড ডুমুর গাছ। গাছটিতে সুস্বাদু ফল ধরতো। ফলের লোভে বিভিন্ন পাখী তার ডালে আশ্রয় নিত। গাছটিও যেন তার অকৃপণ হস্তে তার ফল বিতরণ করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

গাছের নীচে বাস করা পাখীদের বীভৎস চিৎকার স্থানটিকে ভৌতিক করে তুলত। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষ জন ওই স্থানে যেতে ভয় পেত। একদিন দুই দুঃস্থ কৃষক রাতের অন্ধকারে কাজের খোঁজে অন্য গ্রামে যাত্রা করেছে। হঠাৎ তারা যেন দেখতে পায় নাচের দৃশ্য এবং শুনতে পায় ডমরুর শব্দ। কিছুক্ষণ তারা বেশ আনন্দ সহকারে নৃত্যের দৃশ্য ও ডমরুর শব্দ উপভোগ করে। তারপর হঠাৎ-ই একজন অজ্ঞান হয়ে যায়। অন্য লোকটি অজ্ঞান ব্যাক্তিটিকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হয়। বাড়ীতে লোকটি সমস্ত খুলে বলে এবং কিছু দিনের মধ্যে মারা যায়। এরপর বাড়ীর আত্মীয় স্বজনেরা মৃত ব্যাক্তিটিকে ওই ডুমুর গাছের কাছে কবরস্থ করে। কারণ তাদের বিশ্বাস ভোলা মহেশ্বরের অপূর্ব নৃত্য দেখে যেহেতু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে সেই হেতু মহেশ্বরই আবার তাকে বাঁচিয়ে তুলবেন। এই ঘটনা চারিদিকে প্রচার হওয়ার ফলে এল বড় বড় সন্ন্যাসীর দল। তারা তাদের সাধন-ভজনের দ্বারা স্থানটিকে তীর্থক্ষেত্র করে তুলল। কিন্তু কালের গতিতে সমস্ত কিছুরই উত্থান পতন আছে। এই উত্থান পতনের গতিকে লঙ্ঘন করতে পারেনি সন্ন্যাসী দল। তাদের কয়েকজন সেখানে মারা যায় অন্য সন্ন্যাসীরা স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। সেই দিন থেকে জায়গাটি লোকালয় থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। আবার গ্রীষ্মের সময় নদীতে জল না থাকায় জায়গাটি চাষ বাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ বিরাজ করছে, এই জন্য স্থানীয় লোকেদের কাছে এটি ডিমরিয়া ডাঙ্গার মাঠ নামে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

এক ব্যক্তির বিশেষ একটি গাছের তলায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার রহস্যকে নিয়েই কিংবদন্তীটি গড়ে উঠেছে।

(দ) বাহিরির মন্দির:

কাঁথির মারিশদার কাছে মন্দিরটির অবস্থান। বড় মন্দির। ভীমসেন মহাপাত্র নামে জনৈক ক্ষুদ্র রাজা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শোনা যায়, কোন এক রাজা ঘোষণা করেছিলেন, যে এক রাত্রের মধ্যে একটা দেউল, চারটি পুকুর আর চারটি টিকরি (উঁচু পাহাড়ের মতো স্তুপ) নির্মাণ করতে পারবে, তার সঙ্গে রাজার মেয়েকে বিয়ে দেবেন।

ভীমসেন মহাপাত্র এইসব নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। এবং অর্ধেক রাত্রের মধ্যেই চারটি পুকুর, চারটি টিকরি তৈরি করে মন্দির নির্মাণ করে মূর্তিও তৈরী করে ফেলেছেন। কেবল মূর্তির চোখ নির্মাণ বাকী আছে।

এদিকে রাজা দেখলেন, ও তো সত্যি সত্যিই সব নির্মাণ করে তার মেয়েকে বিয়ে করার দাবী করবে। তাই রাজার নির্দেশে তার এক কর্মচারী মাঝ রাত্রে

কাকের বাসায় ঢিল মারলে কাক কা-কা কার ডেকে উঠলো। ভীমসেন ভাবলেন ভোর হয়ে গেছে এখনো কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। রাজা তো নিশ্চয় তার এবার গর্দান নেবেন। ভয়ে ভীমসেন পালিয়ে গেলেন পাশের উড়িষ্যা রাজ্যে। দেউলের মূর্তিতে আর চোখ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

টিকরি আর পুকুরগুলি মন্দির থেকে বেশ দূরে দূরে অবস্থিত। তার মধ্যে বিশেষ একটা পুকুর--ভীমসাগর নিয়েও জনশ্রুতি রয়েছে। ভীমসাগরের পারে একটা বটগাছ রয়েছে। কোন বাড়ীতে বিয়ে বা কোন অনুষ্ঠান হলে কেউ যদি একটা কাগজে তার কতগুলি হাঁড়ি কড়াই বাসনকোসন দরকার তা বটগাছে ঝুলিয়ে রাখে, তবে পরের দিন দেখা যেত পুকুর পারে সেগুলি পড়ে রয়েছে। কাজ হয়ে গেলে সেগুলিকে আবার ভালো করে ধুয়ে সেখানে রেখে আসতে হত। একবার একজন হাঁড়ি কড়াই বাসন-কোসন নিয়ে ভালো করে না ধুয়ে এঁটো সমেত ফিরিয়ে দিয়েছিল, এর পর থেকে আর কিছু পাওয়া যায় না। এখনো বট গাছটা বর্তমান। পুকুরের এক পাশে বাজার অন্য পাশে একটা স্কুল।

এই কিংবদন্তীটিতে ভীমসেনের প্রয়াস কিরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল তাই বর্ণিত হয়েছে। বাসনের প্রসঙ্গে অবশ্য অলৌকিকত্ব যুক্ত হতে দেখা গেছে।

(ধ) বারাকপুরের পনের হাত উচ্চ কালী পূজা :

স্বাধীনতার সময় কালের ঘটনা। ঢাকা জেলার একটি গ্রামে সপরিবারে বাস করতেন দেবেন্দ্রচন্দ্র দে নামে জনৈক ব্যক্তি। তার গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুরে মাছ, অগাধ ধন সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না। সন্তান হয়েই মারা যায়। এমন করে তিনটি সন্তান হারিয়ে যাওয়ায় দেবেনবাবুর স্ত্রী উম্মাদিনী, দেবেনবাবু হতবাক।

কালের নিয়মে আবার গর্ভবতী হন তাঁর স্ত্রী এবং একটি ছেলে সন্তান জন্ম নেয়—বিশ্বনাথ।

একদিন অমাবস্যার নিশুতি রাতে ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখেন—মহাকালী তাকে বলছেন, আমাকে পুজো দিস্ তোর বিশ্বনাথের মঙ্গল হবে। পরে স্বামীকে স্বপ্নের কথা বললে দেবেনবাবু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পুজোর আয়োজন করতে থাকেন।

কিন্তু পুজো আর দেওয়া হয় না। কারণ দেশ বিভাগের দাবানলে জ্বলছে সারা দেশ। দে পরিবারও আক্রান্ত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু স্রোতের সাথে ভেসে এলেন এ পারে বারাকপুরে, সরকারী সাহায্যে মাথা গোঁজার ঠাঁই হল কোন-ক্রমে। অবশেষে অনেক চেষ্টায় মাসিক ১৮ টাকা বেতনে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার নিযুক্ত হলেন। কোনক্রমে দিন চলে। মায়ের পুজো

দেওয়া হল না। এই ভাবেই দিন চলছিল ; কিন্তু একদিন রাত্রে ভয়াল রূপিনী মহাকালী দেবেনবাবুর স্ত্রীকে স্বপ্নে আদেশ করেন, ভুলে গেছিস তোর প্রতিজ্ঞা ? আমায় পুজো না দিলে তোর সন্তানকে অচিরেই হারাবি, স্বপ্নেই মা কেঁদে উঠে প্রতিজ্ঞা করেন, বিশ্বনাথের যত বছর বয়স হয়েছে তত হাত মূর্তি গড়িয়ে পুজো দেবেন। স্বামীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তখন ছেলে বিশ্বনাথের বয়স ছিল ১৪ বছর। ১৪ হাত দীর্ঘ মূর্তি গড়িয়ে পুজো দেওয়া হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিমার উচ্চতা আরো এক হাত বৃদ্ধি করে প্রতি বৎসব পুজো করে আসছে।

স্বপ্নকে আর যাইহোক অলৌকিক ঘটনা বলা যাবে না, অতএব এই কিংবদন্তীটি অন্ততপক্ষে অলৌকিকত্ব বিযুক্ত।

(ন) **শীতলা কালীবাড়ী ঃ**

ফালাকাটা থানা সংলগ্ন শীতলা কালী বাড়ীর সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি রয়েছে। থানার পাশে যখন শীতলা কালীমন্দির তৈরী হচ্ছিল, তখন পুলিশ এই মন্দির তৈরীর কাজে বাধা দেয়। কিন্তু নিষেধ অমান্য করে মন্দিরের কাজ চলতে থাকায় পুলিশ অসংখ্য হাতী নিয়ে সেই মন্দির ভাঙতে গেল, কিন্তু কোন হাতীই মন্দিরটিকে ভাঙতে পাবে না। উল্টে তারা মন্দিবেব উদ্দেশে প্রণাম জানালো।

এই ঘটনায় পুলিশ এবং জনতা হতচকিত হয়ে যায় এবং অনুমতি দেয় মন্দিরটি তৈরী করবার, অবশেষে মন্দিরটি তৈরী হয় এবং পুজো শুরু হয়, সেই পুজা বর্তমানেও প্রবহমান।

একটি মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তীটি রচিত হয়েছে।

প **পাষাণ কালী বাড়ী ঃ**

ফালাকাটা থানার পূর্বদিকে আর এক মন্দির পাষাণ কালী বাড়ী সম্বন্ধেও কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। এখানকার একটা মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জনৈক ব্যক্তি বেনারস থেকে কালীমূর্তি নিয়ে আসার সময় কালীমূর্তির একটা হাত ভেঙে যায়, তখন সেই মূর্তিটির ভাঙা হাত মাটি দিয়ে জোড়া লাগিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার পর দেখা যায় মূর্তির হাত ভাঙার কোন চিহ্ন নেই।

দেবী প্রতিমার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করেছে ভাঙ্গা হাতের কোনো চিহ্ন না থাকায়—কিংবদন্তীটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এটিই।

(ফ) **জোড়গাছা নামের পিছনের কিংবদন্তী ঃ**

জোড়গাছা নামের পেছনে যে কিংবদন্তীটি রয়েছে, সেটি হল এইরকম—অতি

প্রাচীনকালে এখানকার লোকেরা কামরূপ কামাখ্যায় যাতায়াত করত। শোনা যায় কামরূপে ছেলের তুলনায় মেয়ে বেশী। তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার মেয়েদের প্রবণতা ছিল যে, যে সব লোকেরা সেখানে যেত তাদেরকে বিয়ে করে সেখানে ধরে রাখার। তাই সেখানে কোন লোক গেলে তার ফিরে আসাই বড় কঠিন হয়ে পড়ত। সে সময় মন্ত্র শক্তির ব্যাপারটি খুব প্রচলিত ছিল এবং বিশেষ করে সেখানকার মেয়েরা মন্ত্রশক্তির ব্যাপারটি বেশ ভালভাবেই আয়ত্ব করেছিল। শোনা যায় এই মন্ত্র শক্তির প্রভাবেই তারা গাছকে চালনা করতে পারত। অর্থাৎ এক দেশ থেকে জীবন্ত গাছকে তুলে নিয়ে অন্য দেশে নিয়ে ফেলত। তাই এখানকার লোকেরা যারা কামরূপে গিয়ে আটকা পড়ে যেত তারা তখন চেষ্টা করতে লাগল কিভাবে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসা যায়। এবং অবশেষে তারা গাছ চালনা করার মন্ত্র তাদের কাছে শিখে নিয়ে একদিন রাতারাতি দুটি বড় অশ্বত্থ গাছকে চালনা করে নিয়ে এসে ফেলল এই জোড়গাছায়। এবং শোনা যায় নাকি এই গাছ দুটি রাতারাতি ভাণ্ডারদহ বিলের দুই তীরে জোড় বেঁধে যায়। অর্থাৎ বিলের এ পাড়ে একটি গাছ ও ওপাড়ে আর একটি গাছ লেগে যায়। এবং সকাল বেলায় এখানকার লোকেরা এই ব্যাপারটি দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এবং আরও শোনা যায় যে এক সাধু রাতে এপারের গাছ থেকে ওপারের গাছে খড়ম পায়ে দিয়ে বিলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করত। এখন অশ্বত্থ গাছদু'টির কোনটিই নেই। রাতারাতি এই গাছ দুটি জোড় লেগে গিয়েছিল বলে এই জায়গাটির নাম হয়েছে জোড়গাছা।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে এই 'জোড়গাছা' গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রাম, যেটির পাশ দিয়ে এই ভাণ্ডারদহ বিল প্রবাহিত।

(ব) পিলখানা নামের পেছনের কিংবদন্তী :

মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম এই পিলখানা। এটি বেলডাঙ্গা স্টেশন থেকে প্রায় ১০-১২ কিমি. দূরে অবস্থিত। এটিও ভাণ্ডারদহ বিলের তীরে অবস্থিত।

একসময় এখানে পিলখানা বলে কোন গ্রামের অস্তিত্বই ছিল না। এবং এখানে তখন কোন জনবসতিও ছিলনা। বন জঙ্গলে ভর্তি ছিল এই স্থানটি সে সময়টি ছিল নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর সময়। ঐদিক দিয়ে অর্থাৎ এখানকার রাস্তা দিয়ে নবাবের হাতি চলাচল করত। এবং চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় তারা তাদের হাতী বেঁধে রেখে সেদিনের মত সেখানে আশ্রয় নিত। এইরকমভাবে কয়েকটি জায়গায় তাদের হাতীশালা

গড়ে উঠেছিল। সেই রকমই একটি হাতীশালা গড়ে উঠেছিল এই স্থানে। আগে এখানে জনবসতি না থাকলেও পরবর্তীকালে দেখা গেল এখানে জনবসতি গড়ে উঠতে, যেহেতু এখানে হাতি বাঁধা হত তাই এখানকার নাম ছিল হাতী-শালা, কিন্তু এখানে জনবসতি গড়ে ওঠার পর নামটি পরিবর্তন করা হল। 'হাতীশালা' নামটি শুনতে একটু খারাপ লাগে বলে এই নামের পরিবর্তে পিলখানা নাম রাখা হল। হাতির আর এক নাম হল 'পিল'। তাই হাতী-শালা বাদ দিয়ে একটু মার্জিত করে রাখা হল পিলখানা। সেই থেকে এই গ্রামটি 'পিলখানা' নামেই পরিচিত হয়ে আসছে।

এখানে যে হাতি বাঁধা হত তার প্রমাণ হিসাবে হাতির অনেক নমুনা পাওয়া গেছে। যেমন, হাতির শিকল, হাতির চোয়াল মাথা প্রভৃতি। তাই হাতী-শালা থেকে 'পিলখানা' নামের উৎপত্তি একেবারে অস্বীকারযোগ্য নয়।

এই কিংবদন্তীটির ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বতঃই প্রমাণিত।

ভ) কালীতলা নামের উৎপত্তির কিংবদন্তী :

এই গ্রামটিও মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ভাণ্ডারদহ বিলের তীরে অবস্থিত একটি মাঝারি গ্রাম। 'কালীতলা' নামের আগে এই গ্রামের নাম ছিল মহাতাপনগর। আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে।

এই গ্রামের পাশ দিয়ে যে ভাণ্ডারদহ বিলটি প্রবাহিত, সেটি বর্তমানে স্থির জলযুক্ত হলেও পূর্বে এটি ছিল খরস্রোতা। তবে বর্তমানে বর্ষার সময় জল বাড়লে এখনও স্রোত বইতে থাকে। আমরা জানি স্রোতের দ্বারা অনেক জিনিসই বাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। এবং নীচে পলি পড়তে থাকে। এই বিলের কোথাও গভীর আবার কোথাও অগভীর। যেমন কালীতলার এই জায়গাটি অগভীর। তাই এখানে সব সময় জল থাকে না। তাই এক সময় জল যখন সম্পূর্ণ কমে গিয়ে ভাটা পড়ে গেল, তখন একদিন এখানকারই একজন ব্যক্তি (নাম জানা যায়নি) দেখতে গেল কালো মতন পাথরের মত একটি কি জিনিস মাটির ভিতরে থেকে কিছুটা বেরিয়ে আছে, তখন কাছে এসে মাটি খুঁড়ে সে দেখতে পেল একটি কালীমূর্তি। এই ঘটনা গ্রামের সবাই জানলো। তখন এই এলাকার বাবু অর্থাৎ জমিদার ছিলেন জীবনকালী চক্রবর্তী। তাঁকে জানানো হল ব্যাপারটি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এসে লোক দিয়ে জায়গাটি আরও খুঁড়তে বললেন, এবং দেখা গেল আরও ছোট ছোট কালীমূর্তি। এবং এটি একটি অলৌকিক ঘটনা মনে করে তিনি তার জায়গাতেই একটি মন্দির তৈরী করে দিয়ে সেই কালীমূর্তিগুলিকে সেখানে প্রতিস্থাপিত করলেন। এই মূর্তিগুলি অদ্যাবধি বিদ্যমান। এবং তখন গ্রামের লোক এই কালী মূর্তির

কারণে মহাতাপনগর গ্রামের পরিবর্তে কালীতলা নাম রাখলেন। আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে।

এই কালীমূর্তিকে এখন প্রত্যেকদিন পূজা করা হয়। এই গ্রামেরই ঠাকুর আশিস কুমার ওঝা প্রত্যেকদিন শনি, মঙ্গলবারে পূজা করে থাকেন। এবং সবাই এখানকার ঠাকুরকে খুব জাগ্রত বলে মনে করেন এবং নানারকম মানত করেন, এমনকি এখানে পাঁঠা বলিও হয়।

বিশেষ বিশেষ দেবতা বা দেবীকে কেন্দ্র করে স্থান বিশেষের নামকরণ একটি অতি সাধারণ ঘটনা। এই কিংবদন্তীটিতে কালী মূর্তি লাভের ঘটনাকে যুক্ত করতে দেখা গেছে।

(ঘ) 'খোঁড়ার গাছতলা' নামের কিংবদন্তী :

'খোঁড়ার গাছতলা' এটি কালীতলা গ্রামেরই একটি স্থানের নাম। এই স্থানটির নাম 'খোঁড়ার গাছতলা' হল কেন ?

গোবর্ধন মণ্ডলের পিতা ছিলেন রসরাজ মণ্ডল এবং রসরাজের পিতা অর্থাৎ গোবর্ধন মণ্ডলের যিনি দাই হচ্ছেন যার নাম ছিল রামলাল মণ্ডল তিনি ছিলেন খোঁড়া। ইনি এই জায়গাটিতে দুটি গাছ লাগিয়েছিলেন। একটি বট ও আর একটি অশ্বত্থ। গাছ দুটি এখন মহীরূহে পরিণত হয়েছে। প্রায় ১৫০ বছর আগেকার ঘটনা। তিনি এই গাছ দুটি লাগিযেছিলেন বলে এই জায়গাটির নাম হয়েছে খোঁড়ার গাছতলা। সে খোঁড়া আর বেঁচে নেই কিন্তু তার স্মৃতি নিয়ে এই গাছ দুটি এখনও বেঁচে রয়েছে। এবং পরবর্তীকালে এর পাশ দিয়ে যে পাকা রাস্তা হয় তার স্টপেজ কিন্তু এই খোঁড়ার গাছতলার নামানুসারেই হয়েছে।

এখানেও কিংবদন্তীটি নামকরণ সম্পর্কিত এবং বাস্তবতা বিযুক্ত নয়।

(ঘ) 'রাধানগর' নামের পিছনের কিংবদন্তী :

এটিও একটি ছোট্ট গ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত নাম রাধানগর।

পূর্বে রাধানগর বলে এখানে কোন গ্রামের নাম ছিল না। তখন 'জাফরাবাদ' নামে একটি মৌজা ছিল, এই মৌজার অন্তর্গত ছিল এই গ্রামটি। তখন ছিল জমিদার-জোতদারদের বাস। তখন এখানে জমিদার ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলারই কেদার চাঁদপুর গ্রামের রাধাসুন্দর মুখার্জী। এসব জায়গার সবই তাঁদের ছিল। এই জমিদারের বিভিন্ন মৌজা ছিল, তার মধ্যে এই জাফরাবাদ মৌজা একটি। শোনা যায় নাকি এঁর ভাগ্নে জীবনকালী মুখার্জীকে তিনি এই মৌজাটা পত্তীন দেন। পত্তনি মানে হল দেখাশুনা করা অর্থাৎ মৌজার যাবতীয় আয়, ব্যয়, খরচ সব এখন থেকে তার ভাগ্নে দেখবে। তখন

থেকে তাঁর ভাগ্নে এই মৌজাটি দেখাশুনা করতে থাকে। তাঁর মামার স্মৃতি রক্ষার্থে যেহেতু তাঁর মামা তাকে এটি পত্তনি দিয়েছেন তাই মামার নাম অনুসারে ভাগ্নে জীবনকালী মুখার্জী এই মৌজাটির নাম রাখেন রাধানগর। সেই থেকে রাধাসুন্দর মুখার্জীর স্মৃতিতে এখানকার নাম হয়ে আসছে রাধানগর।

কিংবদন্তীতে উপস্থাপিত ঘটনাটি সত্যমূলক বলেই মনে করা যেতে পারে।

'র' 'চিঁড়েভিজে' নামের পিছনের কিংবদন্তী ঃ

এই জায়গাটি একটি ছোট্ট জায়গা। নাম চিঁড়ে ভিজে। এটি কাজীসাহা নামক গ্রামের অন্তর্গত। এটি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা স্টেশন থেকে প্রায় ৬ কিমিঃ পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট্ট জায়গা, এখানে একটি বাস স্টপেজও আছে। গ্রামটির এই জায়গাটির নামের পিছনের ইতিহাস এইরূপ।

চিঁড়ে ভিজে জায়গাটির নামকরণের পিছনে দুটো কাহিনী শুনতে পাওয়া যায় একটি হল—বহুদিন আগে এই কাজীসাহা গ্রামেরই পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম নাম বেগুনবাড়ী সেখানে দু'জন স্বামী-স্ত্রী বসবাস করতেন। তারা কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু তারা দুটি স্মৃতি রেখে যান। এনারা দু'জনেই দু'জায়গায় অর্থাৎ স্বামীটি বেগুনবাড়ীতে এবং স্ত্রীটি এই কাজীসাহাতেই দুটো পুকুর খনন করে যান। তাদের নামানুসারেই নাকি দু'জায়গায় পুকুর দুটির দুই রকম নামে হয়। স্বামীর নাম ছিল মুলুক। তার নামানুসারেই বেগুনবাড়ীর পুকুরটির নাম হয় মুলুক পুকুর এবং স্ত্রীর নাম ছিলো চিঁড়ে, তার নামানুসারেই নাকি এই জায়গাটির নাম হয় চিঁড়েভিজে। এইভাবে নাকি চিঁড়েভিজে নামের উৎপত্তি।

আবার আর একটি কাহিনীও এই চিঁড়েভিজে নামের পিছনে শোনা যায়। সেটি হল—বহুদিন থেকে এখানে যে একটি পুকুর রয়েছে সেই পুকুরের জলটি খুব ভাল ছিল। বর্তমানেও ভাল জল। ঐ পুকুরের পাশেই একটি বটবৃক্ষ রয়েছে। শোনা যায় দূর-দূরান্ত থেকে লোকে এখানে এসে এই পুকুরের জলেই চিঁড়ে ভিজিয়ে খেত এবং ঐ বটগাছের ছায়ায় বসত। শোনা যায় নাকি ঐ পুকুরের জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাওয়ার ফলে তাদের শরীরের রোগ, ঘা, ফোঁড়া প্রভৃতি যা থাকত তা ভাল হয়ে যেত। সেই থেকে এখানে এই পুকুরের জলে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাওয়ার প্রবণতা লোকের রয়েছে এই বিশ্বাসে যে শরীরের বিভিন্ন রোগ ভাল হয়ে যাবে। তবে বর্তমানে লোকের চিঁড়ে ভিজিয়ে খাওয়ার প্রবণতা একটু কম বলেই মনে হয়। এই পুকুরে চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়ে শরীরের রোগ সারত বলেও এই জায়গাটির নাম পরবর্তীকালে চিঁড়েভিজে হয়ে থাকতে পারে। এবং এখানে আগে কোন

বসবাস ছিল না কিন্তু বর্তমানে প্রায় অনেক চালাবাড়ীই এখানে নির্মিত হয়। এই হল চিঁড়েভিজে নামের ইতিহাস।

প্রথম কাহিনীটির তুলনায় দ্বিতীয় কাহিনীর গ্রহণযোগ্যতা অধিকতর। তবে রোগ সারানোর ব্যাপারটি সম্ভবত পরবর্তীকালে আরোপিত।

(ল) 'বেগুনবাড়ী' নামের সূত্র :

'বেগুনবাড়ী' গ্রামটি খুব ছোটও নয় আবার খুব বড়ও নয়। মাঝারি। এটিও মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। বেলডাঙ্গা রেল/স্টেশন থেকে বাসে দশ মিনিট আসলেই এই গ্রামে এসে পড়া যায়। এই গ্রামটির নামের পিছনের কাহিনী হল—এই গ্রামটিতে বর্তমানে যে অনেকগুলি পুকুর (৭টি পুকুর) দেখা যায়, সেগুলি আসলে আগে পুকুর ছিল না। এই পুকুরগুলি একত্রে মিলিত হয়ে একটি 'দারা বা বিল' মত হয়েছিল এবং শোনা যায় সাবেক ভাগীরথীর সঙ্গে নাকি এই দারার যোগসূত্র ছিল। এবং এই দারা দিয়ে অনেক নৌকার যাতায়াত ছিল। অর্থাৎ জল পথে বাণিজ্য চলত। পরে অবশ্য এখানে বাড়ী-ঘর হয়ে যাওয়ায় এই দারাটি কতকগুলি পুকুরে পরিণত হয়ে গেছে। এই গ্রামের সাবেক নাম ছিল 'বস্ত্রবাটী'-এরপর নামের অপভ্রংশের ফলে নাম হয়েছে বেগুনবাড়ী। এই হল একটি কাহিনী।

অপর কাহিনীটি হল—এই গ্রামে নবাবদের যাতায়াত ছিল। মোটামুটি ইংরেজদের সময় বলা যায়। এখানে 'পাতাবিল' বলে একটি বিল ছিল, বর্তমানে বিলের প্রবাহের গতি মোটামুটি রুদ্ধ অগভীরতার জন্য। নবাবরা এই পাতাবিলে আসতেন শিকারে। কেননা এই পাতাবিলে বিভিন্ন রকম মাছ, বক প্রভৃতির আনাগোনা ছিল। এইগুলি শিকার করার জন্য মাঝে মাঝে নবাবরা এখানে আসতেন এবং শোনা যায় নাকি তাঁরা তাঁদের বেগমদেরও শিকারের সময় নিয়ে আসতেন এবং এখানে থাকতেন। নবাবরা তাঁদের বেগমদের নিয়ে এখানে আসতেন বলে এখানকার নাম হয়েছিল বেগমবাটী। পরবর্তীকালে নামের অপভ্রংশের ফলে নাম হয়েছে 'বেগুনবাড়ী'। এই হল 'বেগুনবাড়ী' নামের পিছনের ইতিহাস।

নামকরণের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে কিংবদন্তী দু'টিতে।

(ব) বসন্ততলার ইতিবৃত্ত :

বহরমপুর স্টেশন থেকে প্রায় ২ কিমি. পশ্চিমের দিকে এলে গঙ্গা নদী পড়বে। সেখানে যে ব্রিজ রয়েছে তার নাম রাধার ঘাটের ব্রিজ। এই ব্রিজটি

পার হলেই বাঁদিকে একটি সরু ইঁটের রাস্তা পড়বে। সেই রাস্তা বরাবর কিছুটা গেলেই একটি বিরাট বটগাছের নীচেই এই বসন্ততলা বা শীতলা মা'র মন্দির চোখে পড়ে। ব্রিজ না পার হলেও অবশ্য নৌকো পার হয়েও এখানে আসা যায়। তবে সেক্ষেত্রে সময়টি কমই লাগে। আবার আর একটি রাস্তাও রয়েছে, সেটি গঙ্গা পার হয়ে বাঁয়ে যে ইঁটের রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তায় না গিয়ে আর একটু গেলেই বাঁয়ে ঢুকে গেছে একটি পাকা রাস্তা। সেই পাকা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলেই রাস্তার ডান দিকে চোখে পড়বে এই শীতলা মায়ের মন্দির বা বসন্ততলা। এই স্থানটি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত বাজারপাড়া নামক একটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানটির মাহাত্ম্য হল শুধু কাছের মানুষই নয়, বহু দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ এখানে পুজো দিতে আসে। বেশীর ভাগ পুজোই মানতের পুজো। শোনা যায় যে বহুজনের বসন্ত, কলেরা হাম যা ওষুধ খেয়ে সারেনি তা এখানকার মা শীতলাকে মেনে এখানকার মাটি গায়ে মেখে ঐ সব রোগ ভাল হয়ে গেছে। বসন্ত হয়ে অনেকের চোখ খারাপ হয়ে গেলে এখানকার মায়ের মন্দিরের মাটি ঐ চোখে বোলালে সে চোখও নাকি ভাল হয়ে গেছে। শুধু পুজোই নয়, মানত হিসাবে অনেকে পাঁঠাবলিও দিয়ে থাকেন এখানে, এই স্থলের মা হলেন শীতলাদেবী। তাঁকে কেন্দ্র করেই কিংবদন্তীটির অবতারণা।

অনেক অনেক দিন আগে এখানে বাঁশ বেত ও খড়ের বন ছিল। এবং তখন সেখানে বাঘ, শিয়াল প্রভৃতি জন্তুর বাস ছিল। তখন বিশেষ ঘর-বাড়ী ছিল না। পাশেই চাঁইদের বাস ছিল বেশী। একদিন গয়ানাথ চাঁই এখানকার একটি জমির মাটি কোদাল দিয়ে কোপাচ্ছিল। কোপাতে কোপাতে তার কোদালে খট্ করে আওয়াজ হল। তখন সে দেখলো যে একটি পাথর। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পাথরের যে জায়গায় কোদালের আঘাত লেগেছিল, সেখান থেকে দরদর করে রক্ত বেরোতে লাগল। তাই দেখে সে ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ী চলে আসে। তারপর বাড়ীতে শুয়ে স্বপ্ন পেল যে এই পাথরটি আসলে পাথর নয়, সে হচ্ছে শীতলা মা। এই শীতলা মা তাকে স্বপ্নে বললেন, 'তুই আমার গায়ে আঘাত করলি। আমার রক্ত বের করলি। যাক্ তার জন্য তোর কোন ভয় নেই। আমি এখানে থাকতে চাই, তুই আমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা কর'। তখন এই স্বপ্ন পেয়ে গয়ানাথ চাঁই জমি থেকে তুলে এনে মাকে পাশেই একটি বটগাছের নীচে স্থাপন করে। কিন্তু যেহেতু সে অনার্য, পুজা দেওয়ার অধিকার তার নেই, তাই সে সেখানকার 'বন্যাশ্বর' নামে এক ঠাকুরকে ঠিক করে মায়ের পুজা করার জন্য। কিন্তু বন্যাশ্বর ঠাকুরের একটি দোষ ছিল সে প্রচুর মদ খেত। তাই 'মা' আবার চাঁই-কে স্বপ্ন দিলেন যে যেহেতু ঐ ঠাকুর মদ খায় তাই

ঐ ঠাকুরের পুজো তিনি গ্রহণ করবেন না। ঠাকুর পালটাতে হবে। তখন চাঁই, বন্যাশ্বরকে বাদ দিয়ে গোয়ালযানের (পার্শ্ববর্তী গ্রাম) ঠাকুর উমানাথকে রাখল। তখন থেকে বংশ পরম্পরায় এখানে ঠাকুরমশাইরা পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। উমানাথের পর পুজো করেন নির্মল ভট্টাচার্য এবং নির্মল ভট্টাচার্যের পর কিছুদিন পুজো করেন শুভেন ভট্টাচার্য কিন্তু বর্তমানে শুভেনের পরিবর্তে তাঁর কাকা দিলীপ ভট্টাচার্য পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং তখন থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রোগ, যেমন—হাম, কলেরা বিশেষ করে বসন্ত ভাল হয়ে যেতে লাগল এবং লোকে শীতলামায়ের কাছে পুজো দেওয়ায় বিশ্বাসটা আরও প্রগাঢ় হতে থাকল। এইভাবে এই স্থানটি 'বসন্ততলা' নামে পরিচিতি লাভ করল।

অপর কাহিনীটি নিম্নোক্তরূপ—ক্ষেতু মোড়ল (মণ্ডল) মাটি কোপাতে গিয়ে এই মায়ের মূর্তিটি উদ্ধার করে।

এই ক্ষেতু মোড়ল একদিন কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে কোপাতে দেখে যে তার কোদালটি হঠাৎ একটি পাথরের গায়ে আঘাত করে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে যে সেটি একটি পাথরের মূর্তি। কিন্তু এই দেখে সে আরও আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তার কোদাল পাথরের মূর্তিটির যেখানে আঘাত করেছিল (কপালের এক পাশে আঘাতটি লেগেছিল), সেখান দিয়ে ঝর ঝর করে মানুষের মত রক্ত বেরোচ্ছে। এত রক্ত ঝরছে যে ঐ রক্তের যেন আর বেগ কমছে না। তখন তাই দেখে সে বিস্ময়ে ভীত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল নিজ বাড়ীতে। শোনা যায় নাকি ঐ মূর্তিটির পাশ দিয়ে যেই গিয়েছে তাদের হাতে যাইই থাকুক না কেন (যেমন দুধ জল প্রভৃতি) তারা তা ঐ মূর্তিটির মাথায় ঢালতে থাকে। এদিকে বাড়ীতে এসেও কিন্তু ক্ষেতুর মনে শান্তি নেই। এই কথাই তার মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবং রাত্রে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখল, 'আমি মা শীতলা। তুই আমার কপালে আঘাত করেছিস; আমার লেগেছে তবে আমার কোন ক্ষতি হয়নি, আমি এখানেই থাকতে চাই, আমাকে জায়গা দে।' এখানে তখন অনেক বাড়ী হয়েছিল। কোন বন ছিল না। এই স্বপ্ন পেয়ে ক্ষেতু মোড়ল বাজার পাড়ার মাঠে একটি বড় পাকুড় গাছ ছিল, সেই গাছের নীচেই মাকে স্থাপন করল। এবং যথারীতি ফুল, ফল প্রভৃতি দিয়ে তাঁর পুজো হতে থাকল। কিন্তু হঠাৎই একদিন দেখা গেল সেই মায়ের মূর্তি গাছতলায় নেই। শোনা গেল যে এক সাধু ঐ মূর্তিটি চুরি করেছে। ঐ মূর্তি আগুনে পোড়ালে নাকি সোনা পাওয়া যায়, তাই লোভে পড়ে ঐ সাধু মায়ের মূর্তিটি চুরি করেছে। চারিদিকে যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছে সেইসময় ক্ষেতু মোড়ল আবার স্বপ্নে দেখল

যে মা তাকে বলছেন, 'এক সাধু আমাকে চুরি করে এনে পার্শ্ববর্তী এক গ্রাম বিলপাড়ের একটি শিশু বাগানের মধ্যে এক ছাইগাদা রয়েছে সেখানে, ছাই-গাদার মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রেখেছে। এখানে আমি থাকতে পারছি না, তুই আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল'। এই স্বপ্ন পেয়ে ক্ষেতু আবার তাকে নিয়ে আসল। কিন্তু বাজার পাড়ার যে মাঠে তাকে আগে রাখা হয়েছিল, সেখানে কিন্তু আর রাখা হল না। এখন বর্তমানে যেখানে মা অবস্থান করছেন সে জায়গাটি ছিল একটি পটলের জমি। তখন ৬ টাকা করে বিঘা প্রতি দাম ছিল জমির। সেই জমিটিই চাঁদা তুলে সকলে মিলে ৬ টাকা দিয়ে কিনে সেখানেই মাকে প্রতিষ্ঠা করা হল। এখানে এখন যে বিশাল বটবৃক্ষ দেখা যাচ্ছে তা কিন্তু আগে থেকেই সেখানে ছিল না, মাকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করার পরে লাগানো হয়েছিল যা এখন বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য মায়ের মন্দিরটি ভাল ভাবে করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের যে ছোট্ট মন্দিরটি করা হয়েছিল, সেটির অস্তিত্ব এখনো কিছুটা রয়েছে তবে সেটি বটবৃক্ষের গর্ভেই মোটামুটি বিলীন হতে চলেছে বলা যায়। তা যাই হোক এখানে প্রতিষ্ঠা করার পর যথারীতি আবার পূর্বের মত মায়ের পুজো হতে লাগল। এবং লোকের হাম, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ভাল হতে লাগল এই শীতলা মায়ের কৃপায়। তাই আস্তে আস্তে এই স্থানটি গ্রামে বসন্ততলা বা শীতলা তলা নামে পরিচিতি লাভ করল। বর্তমানে বসন্ততলা নামেই সকলে জানে। বর্তমানে মন্দিরটির সংস্কার হয়েছে। অর্থাৎ নতুন করে মায়ের মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছেন এই বহরমপুরের গোরাবাজার নিবাসী দেববাহাদুর শাহ (জমিদার) ও গোরাবাজারেরই গোবিন্দ সাহা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে যে আগের ভাঙা মন্দিরটি রয়েছে তাতে দেখা গেল একটি ছোট্ট শিবের মূর্তি গলা এবং হাত-পা কাটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ সম্পর্কে জানা যায় এই মূর্তিটি একজন মানতকারী পুরোহিতকে দিয়ে বলেগিয়েছিলেন যে এই শিবের মূর্তিটিরও যেন পূজা করা হয়, তার জন্য যা খরচ হবে তা তিনি দিয়ে দেবেন। কিন্তু হয়ত পূজার খরচ ঠিকমত পুরোহিত পাননি, তাই তার আর বোধহয় মায়ের কাছে জায়গা হয়নি। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে যে, কোদালের কোপ মায়ের কপালে লেগেছিল সেই দাগটি এখনও নাকি রয়েছে। তবে বর্তমানে সিঁদুরের দ্বারা স্থানটি ঢাকা পড়ে গেছে। এবং আরও জানা যায় যে, বর্তমানে জায়গাটির পরিবেশ খুব দূষিত হয়ে গেছে তাই মা এই দূষিত, নোংরা পরিবেশে এখানে সব সময় থাকেন না। শনি এবং মঙ্গলবারে থাকেন। আর বাকী দিনগুলি স্থানীয় এক গ্রাম জালালপুরে থাকেন। একথা নাকি ভরে বলে দিয়েছেন।

এইবার 'বসন্ততলা' সম্পর্কিত তৃতীয় কাহিনীটি উল্লিখিত হল—

এক চাঁই মণ্ডল এখানকার মাটি কোপাতে কোপ'তে একটি পাথরের গায়ে কোদালটির আঘাত লাগায় সে পাথরটি ভাল করে না দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কোপানো হয়ে গেলে বাড়ী ফিরে আসে। কিন্তু বাড়ী এসে সে স্বপ্ন দেখল যে, যে পাথরটি সে ফেলে দিয়েছে, সেটিতে একটি শীতলা মায়ের মূর্তি আছে। ঐ মাই তাকে স্বপ্নে বলছেন, 'আমার মাথায় তুই আঘাত করেছিস, তুই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিস। আমি মা শীতলা'। তখন সে মাকে বলেছে, 'আমি কি করে বুঝব যে তুমিই মা শীতলা। ওরকম কত পাথরতো আমি ফেলে দিই'। তখন মা বলেন, 'দেখবি আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আমার শীঘ্র ব্যবস্থা কর। আমাকে একটি জায়গায় স্থাপন কর এবং আমার পুজোর ব্যবস্থা কর'। তখন তার উত্তরে চাঁই বলে, 'আমি কি করে তোমার পুজোর ব্যবস্থা করব, আমি যে চাঁই'। মা তখন ঐ বিশ্বেশ্বর ঠাকুরের কথা বলেন, যিনি ঘোড়ায় চেপে কবিরাজি করে বেড়াতেন। তখন চাঁই মার ইচ্ছানুসারে ঐ বিশ্বেশ্বর ঠাকুরকেই মার পূজা করার জন্য বললেন। শুভ্রাংশুভূষণ ছিলেন তখন জমিদার। তখন এ এলাকা ছিল তাঁরই হেফাজতে। তাঁরই দান করা জায়গায় তিনি মাকে স্থাপন করলেন। তখন থেকে মায়ের পুজো চলতে লাগল। বিভিন্ন মানতের রুগীও এখানে ভাল হয়ে গেছে। বিশেষ করে বসন্ত রোগের রুগীরা বেশী মাত্রায় ভাল হওয়ায় এখানকার স্থানটি বসন্ততলা নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মারা যাওয়ার পর যদুনাথকে পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ তাকে বাদ দিয়ে তার ছেলে অমরনাথকে এই পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এবং অমরনাথের পর তার ছেলে দিলীপ ভট্টাচার্য এখানকার পুরোহিত নিযুক্ত হন। বর্তমানে ইনিই এখানকার পুরোহিতগিরি করে থাকেন।

বোঝা যায় বসন্ততলার পরিচিতি বহুধা বিস্তৃত, তাই তিন তিনটি কিংবদন্তী একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শীতলার অলৌকিকত্বকে যুক্ত করা হয়েছে তাঁর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে।

(শ) বুড়ীমা তলা নামের পিছনের কিংবদন্তী :

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত এই 'বুড়ীমা তলা' স্থানটি বেলডাঙ্গা স্টেশন থেকে প্রায় এক দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রায় ৩২৪-২৫ বৎসর আগেকার ঘটনা, তখন এখানে বুড়ীমা তলা বলে কোন জায়গা ছিল না। এই এলাকাটা ছিল মহারাজার এলাকা, আগে এখানে নদীপথের ওপর দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। তবে ক্রমশঃ

নদীপথের মাঝে মাঝে' চর পড়ে গিয়ে বিভিন্ন গ্রাম গড়ে ওঠে। এই রকম একটি গ্রাম হল এই বেলডাঙ্গা। তবে বলাবাহুল্য যে পূর্ব থেকেই কিন্তু এই বেলডাঙ্গা নাম ছিলনা। বিলডাঙ্গাচর তা থেকে বিলডাঙ্গাগড় —বেলডাঙ্গা হয়েছে। তা যাইহোক্, চারদিকে চর ও মাঝে জলাশয় যুক্ত এই জায়গায় কিন্তু রাজাদের সৈন্য সামন্ত থাকত। এই জায়গাটিরই একস্থানে মা-এর পুজো হত। তখন কিন্তু এই মায়ের নাম বুড়ী মা ছিলনা ; তখন নাম ছিল 'খ্যাপা মাতলা'। প্রকৃত 'বুড়ীমা তলা' নাম কিন্তু ছিল এই বেলডাঙ্গারই বাগ্দীপাড়ার কালীমায়ের থানের। এখনও কিন্তু অনেক স্থানের মানুষ 'বুড়ীমা' বলতে ঐ বাগ্দীপাড়ার মাকেই বুঝে থাকে। এবং এর নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম হালাইপুর, সেখানকার কালীমার নাম ছিল 'পাগলীমা'। বলাবাহুল্য সেই সময় এইরকম সব নামে মাকে ডাকা হত। কাশিমবাজার মহারাজার কাছ থেকে যে চিঠি আসত তা কিন্তু বুড়ীমা তলার নামে আসত না, তা আসত খ্যাপামা তলার নামে। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় পূর্বে এ স্থানটি 'খ্যাপামা তলা' নামেই পরিচিত ছিল। এই কালী প্রথমে নিম্নবর্ণের আরাধ্যা দেবী ছিলেন। পরে ষোড়শ শতাব্দী থেকে উচ্চবর্ণের লোকেদের কাছেও তিনি পুজো পেতে থাকেন। রামকৃষ্ণ বামদেব এঁরাই নিয়ে এলেন এই কালীকে উচ্চবর্ণে। পূর্বে এখানে বাঁশ, বেত প্রভৃতির গভীর বনজঙ্গল ছিল। লোকালয় বলতে বিশেষ ছিলনা, পরে দীর্ঘদিন পরে বন কেটে লোকালয়ের আত্মপ্রকাশ ঘটল। তারপর রাণী ভবানী যিনি নাটোরের রাজমহিষী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরই জায়গাটি ছিল. তিনি তাঁর সম্পত্তির ৪ থেকে ৫ শতক দেবতাকে দান করে দিয়েছিলেন। এবং এই খ্যাপা মার পুজোর জন্য একাদশ পুরুষ হিসাবে বর্ধমানের পাটুলী থেকে নিয়ে আসলেন এক ব্রাহ্মণকে, নাম শিবরাম চট্টোপাধ্যায়। এই শিবরামই তখন এখানকার পুজো করতে থাকেন। এরপর প্রায় দীর্ঘদিন পরে একটি ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। তখন ছিল বিনিময় প্রথার যুগ। এই যুগে ত্রৈলোক্য পাল নামে এক বেনিয়া (প্রায় ১২৫ বৎসর আগে) বিভিন্ন জিনিস যেমন কাঁসা-পিতল, পাট, রেশম প্রভৃতি মাথায় করে ফেরি করে বেড়াত। তখন মানুষের এটাই ছিল উপজীবিকা। তখন রেশমের কাপড় তৈরী হত রেশমের চাষও হত। ত্রৈলোক্য পাল ব্যবসা করতে করতে রাঢ় অঞ্চলের দিকে গেছেন। বাড়ী ফেরার পথে হঠাৎ একটি ৬ থেকে ৭ বছরের মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তার পরনে ছিল লাল পেড়ে শাড়ী। দেখা হতেই সে ত্রৈলোক্যকে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার ওখানে নিয়ে যাবে ? আমি তোমার সঙ্গে যাব'। ঐ বাচ্চা মেয়েকে দেখে ত্রৈলোক্য জিজ্ঞাসা করে যে তার বাড়ীতে কে কে আছে ? তার উত্তরে সে

বলে যে তার সঙ্গে কেউ নেই, সে একা থাকে। এই কথায় ত্রৈলোক্য তাকে নিয়ে যেতে রাজি হয় না। কিন্তু সে এমনই নাছোড়বান্দা যে সে তার সঙ্গে যাবেই। সে বলল, আমি যাব আর চলে আসব। অগত্যা ত্রৈলোক্য পাল কি করবে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল। কিছুক্ষণ পর পিছন ফিরে দেখল যে মেয়েটি নেই। সে ভাবল হয়ত মেয়েটি পালিয়েছে। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পর সে যেই আর একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছে অমনি দেখতে পেল সে তার পিছন পিছন হেঁটে আসছে। এবং যেই ত্রৈলোক্য পাল 'খ্যাপা মা তলায়' পেঁছিল তখন দেখল যে সে মেয়েটি আবার কোথায় হারিয়ে গেছে। এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করেও পেল না, তখন সে ভাবল যে বাচ্চা মেয়েটি হয়ত ভয়ে বাড়ী চলে গেছে। এরপর সন্ধ্যাবেলা যখন সে খেয়েদেয়ে শুয়েছে, তখন সে একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখতে পেল। স্বপ্নটি হল সেই বাচ্চা মেয়েটি তাকে স্বপ্নে বলছে, "আমি তোদের আরাধ্য দেবী. তুই আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। তোদের এই গাছের নীচে (এখানে গাছ বলতে খ্যাপামা আর বটগাছের কথা) আমার রোজ পুজোর ব্যবস্থা করবি। আর একটি কথা, তোর কোন সন্তান হবে না ; তবে চিন্তার কারণ নেই আমি তোর সন্তানের ঝাজ করব।" এই স্বপ্নের কথা পরের দিন ত্রৈলোক্য পাল সকলকে জানিয়ে দিল। এবং এখানকার পুরোহিতকেও জানাল। সকলে মায়ের ঘটা করে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলল। এর ব্যয় ভার অবশ্য তখন থেকে ত্রৈলোক্য পাল নিজে বহন করতে লাগল। তখন থেকে অবশ্য এটি 'বেনিয়াদের কালী' নামে পরিচিত হতে থাকল। এবং তখন থেকে মূর্তি গড়িয়ে পুজো শুরু হয়ে গেল। কার্তিক মাসের দীপান্বিতার দিন থেকে এই পুজো আরম্ভ হল এবং রথের দিন পর্যন্ত মূর্তি পুজো চলতে থাকল। আগে বছরে একবার মূর্তি গড়িয়েই পুজো হত। বর্তমানে প্রায় ২০ বছর ধরে প্রত্যেকদিন মূর্তি গড়িয়ে পুজো হয়ে থাকে। ঐ দীপান্বিতা থেকে রথের দিন পর্যন্ত। বলাবাহুল্য যে তখন ঐ মায়ের মূর্তি এত বীভৎস প্রকৃতির ছিল যে লোকের ভয়েই ভীত আসতে থাকল। কেমন যেন বুড়ীর মত চুল-উসকো খুসকো। মায়ের চেহারা দেখেই হোক, বা যে কোন কারণেই হোক ঐ 'খ্যাপা মা তলা' নাম বাদ দিয়ে তখন থেকে 'বুড়িমা তলা' নামেই পরিচিতি লাভ করতে থাকল। এই বুড়ীমার মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অনেক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক রুগী (হাসপাতাল ফেরৎ) মাকে মানত করে ভাল হয়েছে। বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি লাভ, সন্তান লাভ, কুকুরে কামড়ানো ভালো হয়ে যাওয়া প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। এমনকি শোনা যায় রাঁচীতে এক ভদ্রলোক কোন এক অফিসে চাকুরী করতেন। হঠাৎ কোন কারণে

ক্যাশিয়ার হিসাবে তার টাকা চুরির বদনাম হয়ে যায়। তাকে বরখাস্ত করা হলে তিনি তার আত্মীয় বাড়ী এই বেলডাঙ্গায় চলে আসেন এবং এখানকার মাকে একদিন তিনি বলেন, মা তুই যদি আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করিস তাহলে আমি তোর ঘটা করে পুজো দেবো। এরপর ঠাকুর বিসর্জনের পরের দিন দেখা গেল তার নামে টেলিগ্রাম এসেছে যে সে যেন তাড়াতাড়ি সেখানে ফিরে গিয়ে চাকুরীতে Join করে। টাকা পয়সার কোন নয়ছয় হয়নি। তখন তিনি সেখানে গিয়ে চাকুরীতে join করলেন এবং তাঁর Promotion ও হয়ে গেল। এই দেখে তিনি আবার এখানে এসে ১০৮ ঢাক দিয়ে বেশ ঘটা করে মায়ের পুজো দিলেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল আশিস ব্যানার্জী। এই রকম সব বিভিন্ন কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে এই 'বুড়ীমা তলা' সম্পর্কে, দিন দিন এখানে পুজোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

'বুড়ীমা' কে নিয়ে কিংবদন্তীটি গড়ে উঠেছে। দু'একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকেও আনা হয়েছে। 'বুড়ীমা'র মাহাত্ম্যজনক ঘটনাগুলি এখানে উপস্থাপিত।

যে ডুমনী তলার মা'র বৃত্তান্ত ঃ

একটি ছোট্ট গ্রাম নপুখুরিয়া ছিল মুর্শিদাবাদ জেলারই অন্তর্গত, এই গ্রামেরই এক স্থানে ডুমনী মাতার মন্দির অবস্থিত। নপুখুরিয়ার প্রচলিত নাম ন'পুকুর। অনেকের মতে ন'টি পুকুরের সমাহারের ফলে ন'পুখুরিয়া নামের উৎপত্তি। 'অতীতে কোন এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রামবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করেন। এই নতুন (নইয়া--নও) পুষ্করিণীর নাম থেকে গ্রামের নাম হয়েছে নওপুখুরিয়া। যাই হোক এই নওপুখুরিয়ারই একস্থানে এক বটবৃক্ষের নীচে বাঁধানো চাতালে এই 'মা ডুমনি' নামক লৌকিক দেবীর অধিষ্ঠান দেখা যায়। বলা যায় বেলডাঙ্গা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই 'ডুমনী তলার' মায়ের মন্দির। বেলডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে আসতে গেলে বহরমপুর থেকে রাধানগর ঘাটের যে রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এলে বেলডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া বলে একটি পাড়া পড়বে। তারপর সেখান থেকে ডানদিকে একটি রাস্তা ঢুকে গেছে দেখা যাবে। ঐ রাস্তা বরাবর কিছুদূর গেলেই একটি গ্রাম পড়বে, এই গ্রামেরই শেষ প্রান্তে 'ডুমনী দহ' বলে একটি দহ আছে। সেই দহটি নৌকা যোগে পার হলেই দেখা যবে ওপারে বটগাছের নীচে মা ডুমনী দেবীর মন্দির।

বহু বহু বছর আগে এর পাশ দিয়ে ভাগীরথীর ধারা প্রবাহিত ছিল। এবং এই নদীর দুই তীরে বিস্তীর্ণ বনভূমি অঞ্চল পরিলক্ষিত হত। জন-মানব বলতে হয়ত দু' চারঘর বসবাস করত। বর্তমানে অবশ্য সে প্রবাহ দূরীভূত হয়ে সেখানে দহের সৃষ্টি হয়েছে যেটিকে ডুমনীদহ বলা হয়। তবে পূর্বে এই নদীপথে অনেক রাজা-রাজড়া সওদাগররা বাণিজ্য করতে আসতেন। সেইরূপ এক রাজা বাণিজ্য করতে বেরিয়ে নদীপথে এখানে এসে উপস্থিত হন। এবং এখানে নোঙর ফেলে বনের মধ্যে শিকারের জন্য ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক অপরূপা সুন্দরী কন্যাকে। এই বনমধ্যে অপরূপা সুন্দরীকে দেখে রাজার ভালবাসার উদ্রেক হল এবং তিনি তাকে বিবাহ করার মনোবাসনা পোষণ করতে লাগলেন। বনমধ্যে একা এই অপরূপ সুন্দরী নারীকে দেখে তিনি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, এখানে কোথায় থাক? এখানেতো কোন লোকালয় দেখছি না! তোমার সঙ্গে আর কে কে আছেন? তার উত্তরে সুন্দরী হাত ইসারা করে তার কুটীর দেখালেন এবং আরও জানালেন যে তিনি একাই থাকেন। এই কথা শুনে রাজা (ব্রাহ্মণ যুবক) বললেন, তোমার মত সুন্দরী একজন মেয়ে কেন বনমধ্যে একা পড়ে আছ। এখানে তুমি কি সুখ পাও? তাছাড়া এই শ্বাপদ সংকুল এলাকায় তোমার অনেক বিপদ আসতে পারে। এবং যুবকটি বা রাজাটি তার মনের বাসনার কথা বলে তাকে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। এতে সুন্দরী রাজী হলে সেখানেই দু'জনে মালা বদল করে আকাশ, নদী ও বনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করলেন। তাদের কয়েক মুহূর্ত বেশ সুখেই কাটল। কিন্তু এত সুখ বুঝি সুন্দরীর কপালে সইল না। হঠাৎই দেখা গেল আকাশে মেঘের ঘনঘটা এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, তার সঙ্গে ঝড় এবং বৃষ্টি দেখা দিল। প্রবলবেগে ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অবশেষে একসময় থেমে গেল এই ঝড়, বৃষ্টির তাণ্ডব। এদিকে মাঝিমাল্লা সকলেরই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাবে কিভাবে? রান্নার যাবতীয় জিনিস আছে কিন্তু রান্না করবে তার উপায় নেই, সমস্ত কাঠ গেছে ভিজে। জ্বাল দেবে কি দিয়ে, সকলেই ভাবতে থাকে কি দিয়ে জ্বাল দেবে। কাছাকাছি কোন বাজার আছে কিনা তাও এই অন্ধকারে বোঝা যায় না। সুতরাং এরাত্রির মত সকলকে উপোস করে মরতে হবে, তা ছাড়া আর গতি নেই। এই যখন অবস্থা, সবাই যখন চিন্তিত সেই সময় সেই সদ্য বিয়ে করা সুন্দরী অর্থাৎ ডুমনী মা বলে উঠলেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। এ সমস্যার সমাধান আমি এখনই করে দিতে পারি, আমাকে যদি খান কয়েক কাঁচা বাঁশ এনে দেন। তার কথা শুনেতো সকলে অবাক। কাঁচা বাঁশ দিয়ে কিভাবে আগুন জ্বালাবেন। যাক,

অগত্যা তার কথা মত তাকে কয়েকটি কাঁচা বাঁশ এনে দেওয়া হল, তখন সবাই দেখলো যে তিনি তার কোমর থেকে একটি তীক্ষ্ন ছুরি বের করে এক বিশেষ দক্ষতায় বাঁশের চটা তুলতে লাগলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁশের চটার পাহাড় জমে গেলে তা দিয়ে রান্না করে সকলে তৃপ্ত সহকারে সকলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করল। কিন্তু এই ব্যাপার লক্ষ্য করে রাজার মনে ক্রমশঃ সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকল। তাঁর মনে সন্দেহ হতে লাগল যে তবে কি তিনি শেষ পর্যন্ত ডোমের মেয়েকেই বিয়ে করলেন। একমাত্র ডোমরাইতো বাঁশ ও বেতের কাজ করে থাকে। ক্রমে ক্রমে আর সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে সেখানে ফেলে চলে যাওয়া উচিত মনে করলেন। এবং মেয়েটি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই সময় তাকে সেখানে ফেলে রেখে রাজা চলে গেলেন। পরে যখন রমণীর ঘুম ভাঙল তখন দেখলেন যে তিনি একা। তাকে ফেলে রাজা চলে গেছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর দুঃখে আপনি চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। এবং শোনা যায় যে তাঁর চোখের জলেই নাকি এই দহের সৃষ্টি। এবং কাঁদতে কাঁদতে তিনি ক্রমে পাষাণের মূর্তিতে পরিণত হন।

প্রায় তিনশ বছরের কাহিনী এটি, এখানে বিভিন্ন জায়গাকার লোক এসে পুজো করে যায়। এখানে যে মন্দিরটি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সেটি পরে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু মন্দির তৈরী করলেও দেবী কিন্তু মন্দিরের মধ্যে নেই। তিনি বাইরেই রয়েছেন। তিনি নাকি স্বপ্ন দেন যে তিনি মন্দিরের বাইরেই থাকবেন।

উপরিউক্ত কাহিনী ছাড়াও ডুমনীদেবী সম্পর্কে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হল এই রকম—এখানে তখন নমঃ শূদ্র, ডোম, প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের বাস ছিল। এই নিম্নবর্ণেরই একটি জাতি ডোম জাতির মধ্যে এক ডোম পরিবারে মা জন্ম নিলেন তাদের মেয়ে হয়ে। মেয়েটি প্রথম থেকেই ছিল খুব দুরন্ত। তবে মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। এবং ঐ ডোম পরিবারের ঐ মেয়েটি ছাড়া আর অন্য কেউ ছিল না। তাই স্বাভাবিক কারণেই মেয়েটিকে তারা খুব ভালবাসত। তবে মেয়েটি মা-বাবাকে খুব জ্বালাতনও করত। মা-বাবার একবার ঘাড়ে, একবার পিঠে উঠত এই রকম করত প্রত্যেকদিন। একদিন তার বাবা খাটা-খাটুনী করে যখন বাড়ী এসেছে, তখনও মেয়েটি ঐ রকম করছে। মানুষের মেজাজতো সব সময় ভাল থাকে না। সেদিন তার মেজাজটা এমনিতেই ভাল ছিল না, তার ওপর সেদিন বেচা-কেনাও ভাল হয় নি। তাই আরও তার মেজাজটা খুব খারাপ ছিল। এই সময় মেয়েটিও তাকে খুব জ্বালাতে থাকে। তখন তার মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে সে তার মেয়েকে অনেক

কটু কথা বলে ফেলে। বলে, 'হতচ্ছাড়ি মেয়ে একটু সুখ দেয় না তুই যা যেখানে যাবি! তোকে দরকার নেই।' এই কথা শুনে মা'র মনে সত্যিই রাগ হল, তার মন খালি বলতে লাগল যে বাবা এই কথা বলতে পারল? তাই সে মনের দুঃখে বাড়ীতে আর থাকবে না ঠিক করে তেল, গামছা ও ঘড়া নিয়ে নদীতে এল চান করতে এবং আর ফিরবে না ঠিক করল। হঠাৎ সে এই সময় এক শাঁখা বিক্রেতাকে দেখতে পেল যে এই পথেই আসছে। তার ইচ্ছা জাগল সে শাঁখা পরবে, এবং তখন সে শাঁখারীকে দুই হাতে দুটি শাঁখা পরিয়ে দিতে বলল। তখন শাঁখারী দুই হাতে দুটি শাঁখা পরিয়ে দিলে সে তাকে বলল, আমাদের বাড়ী গিয়ে বাবাকে বল যে কুলুঙ্গিতে একটি কৌটার মধ্যে টাকা আছে দিতে। তার কথা মত সে তার বাড়ী এসে তার বাবাকে বলাতে তার বাবাতো অবাক। এখনই তো আমার মেয়ে বাড়ীতেই ছিল এবং সে কখনইবা তার শাঁখা পরল। তাকে এদিক ওদিক খুঁজে দেখল, কিন্তু তার মেয়েকে সে পেলনা, তার কথামত কুলুঙ্গিতে কৌটোর মধ্যে টাকাও খুঁজে পেল। এতে সে আরও অবাক হয়ে গেল, সে তো কোনদিন এখানে টাকা রাখেনি তবে কি করে এল এখানে টাকা? তার সন্দেহ হল এবং সে দেখতে চাইল যে সত্যিই তার মেয়ে শাঁখা পরেছে কিনা। এবং দু'জনে নদীর ঘাটে গিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই, তখন শাঁখারীকে সে বকতে থাকে যে, আমার মেয়ে কখনো হতেই পারে না। শাঁখারী মহা সমস্যায় পড়ে যায়, সে তখন কাকুতি মিনতি করে সেই মাকে দেখা দিতে বলে। এমন সময় তারা দেখে যে জল থেকে দু'টি হাত উপরে উঠে এল এবং সেই হাত দুটিতে দেখলো শাঁখা পরানো। এই দেখে দুজনেই অবাক হয়ে গেল এবং তৎক্ষণাৎ মায়ের বাবা শাঁখারীকে টাকা দিয়ে দিল। এবং সেদিন থেকে সে বুঝতে পারল যে, যিনি মেয়ে হয়ে জন্মেছিলেন তিনি হচ্ছেন সকলের মা। এবং রাতে স্বপ্নও পেল যে আমি এখানেই থাকব, এখানে আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। স্বপ্ন পেয়ে তার পরদিন থেকেই মায়ের পুজো করতে থাকে। এবং সেই থেকে এখানে আজও পুজো হয়ে আসছে এই মায়ের নামে। এবং যেহেতু তিনি ডোমের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন তাই সকলে এজায়গাটিকে 'ডুমনী তলার মা' নামে চিহ্নিত করল। সেই থেকে এটি 'ডুমনীতলা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে।

কিংবদন্তীটি থেকে যে মূল বিষয়টি জানা যায় তা হল সম্ভবত উচ্চবর্ণের মানুষ কর্তৃক সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণী অত্যাচারিত হয়ে অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে শেষে উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা দেবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

(স) দীঘির মেলা ঃ

আরামবাগ থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত গড়বাড়ী গ্রাম। বিখ্যাত রাজা রণজিৎ রায় সেখানে বাস করতেন।

শোনা যায় জমিদার রঞ্জিত রায় বাল্যকাল থেকেই শক্তির আরাধনা করতেন। পরে গুরুর কৃপায় শব-সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মায়ের সাক্ষাৎ পান। এবং জগন্মাতাকে কন্যারূপে পাবার জন্য বর প্রার্থনা করেন। মা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং তাঁকে বলেন, 'আমি যাই যাই বললে তুমি বিরক্ত হলে আর তোমার গৃহে থাকব না।' তারপর জগন্মাতাকে কন্যারূপে পেয়ে রণজিৎ মহানন্দে কালাতিপাত করেন। বায়ড়া গ্রামে (গড়বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত) যখন তিনি দীঘি খনন করান, সেই সময় একদিন দীঘিতে যাবার জন্যে তাঁর কন্যা তাঁকে বারংবার বিরক্ত করতে থাকেন। রণজিৎ রায় তখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় বিরক্ত হয়ে অন্যমনস্কভাবে 'যাবি মা' বলে কন্যাকে বিদায় দেন। পিতার নিকট বিদায় নিয়ে কন্যা দীঘির পাড়ে যান, সেখানে এক শাঁখারীর কাছে থেকে শাঁখা পরেন এবং পিতার কাছ থেকে টাকা নেবার জন্যে তাকে বলে স্নানের জন্যে দীঘির জলে নামেন. তারপর শাঁখারীর কাছে সংবাদ পেয়ে রণজিৎ তৎক্ষণাৎ দীঘির দিকে ছুটে যান। কিন্তু কন্যাকে দেখতে না পেয়ে বরদানকালীন মহামায়ার শেষ কথাগুলি স্মরণ করে আকুল ভাবে কাঁদতে থাকেন, তিনি চীৎকার করে বলতে থাকেন—দেখা দে মা—দেখা দে! কেমন শাঁখা পরেছিস একবার দেখিয়ে যা মা—দেখিয়ে যা!' তাঁর কাতর ক্রন্দনের শেষে জগন্মাতা দীঘির মধ্যে থেকে শাঁখা পরা হাত দুটি রণজিৎকে দেখিয়ে মুহূর্তে অন্তর্ধান করলেন। অবশেষে একদিন মহামায়া ভক্ত রণজিৎ রায়কে স্বপ্নে জানান যে বারুণীর দিনে দীঘির জল গঙ্গাজলের সমান হবে এবং ঐ জলে যে স্নান করবে সেই গঙ্গাস্নানের ফল পাবে। সেই থেকে প্রতি বছর বারুণীর দিন দীঘিতে বহুলোকের সমাগম হয় এবং ঐ উপলক্ষ্যে দীঘির ধারে মেলা বসে। আজও তা চলছে।

দেবীর শাঁখা পরাকে কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তী চলিত আছে। এখানেও একটি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

(হ) ঠুঁটামারি ঃ

দ্বারকেশ্বর নদীর পশ্চিম তীরের বাঁধ প্রতি বছর বন্যায় ভেসে যেত এবং প্রতিবছরই তা মেরামত করা হ'ত। বাঁধ কিছুতেই বেঁধে রাখা যেত না, তারপর দহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী নরবলি দেবার প্রত্যাদেশ করেন। কিন্তু

বলির জন্যে কোনও ব্যক্তি পাওয়া যায়নি, অবশেষে বহু চেষ্টার ফলে একজন অঙ্গহীন ঠুঁটা ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাকে বলি দেওয়া হয়। কতকাল পূর্বে যে বলি দেওয়া হয়েছিল তা কেউ বলতে পারেনা, সেই থেকে এই স্থানের নাম হয়েছে 'ঠুঁটামারি'।

নর বলিদানের প্রথা উল্লিখিত হওয়ায় বোঝা যায় কিংবদন্তীটি সুপ্রাচীন।

(ড়) মলকে পুকুর :

তারকেশ্বর রেল স্টেশন থেকে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত শোঙালুক গ্রাম। পুড়শুড়া থানার অন্তর্গত। তারকেশ্বর থেকে বাসে শোঙালুক যাওয়া যায়, অবশ্যই দামোদর নদ পার হতেই হবে। কিংবদন্তী আছে যে, শোঙালুক বা শ্যামলোক গ্রামে প্রাচীনকালে দেবী সিংহ নামে একজন হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর একমাত্র কন্যার নাম মল্লিকা। দেবী সিংহ জলের সুব্যবস্থার জন্যে ঐ গ্রামে একটি বড় পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ঐ পুকুর দেবী সিংহের কন্যা মল্লিকার স্মৃতি যুক্ত হয়ে 'মলকে পুকুর' বলে খ্যাত হয়েছে। গ্রামবাসীগণের মতে, ঐ পুষ্করিণীর উত্তরদিকে রাজা দেবীসিংহের প্রাসাদ ছিল ; কিন্তু আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই।

এই কিংবদন্তীতে কোন অলৌকিকতা নেই। বরং খুবই স্বাভাবিক ও বাস্তব ঘটনা উপস্থাপিত।

ঢ়) বিশালাক্ষ্মীর মুক্ত স্থানে অবস্থান :

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামের পাশেই আনুড় গ্রাম, ব্রাহ্মণ প্রাধান্য গ্রাম, বি, এড কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশালাক্ষ্মী দেবীর পুজো হয়, দূরে দূরান্ত থেকে লোকজন আসেন পুজো দিতে। কোনো মন্দির নেই। মুক্ত আকাশের নীচে দেবীর অবস্থানের কারণ নিম্নরূপ—

দেবীর প্রিয় সঙ্গী ছিল ঐ গ্রামের রাখাল বালকেরা, গরু চরাতে চরাতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিত ঐ জায়গাতে ; অর্থাৎ প্রত্যেক বছরই মূর্তি তৈরী হ'ত এবং তা থাকত একটা গাছের নীচে, যেখানে ঐ রাখাল বালকেরা গান করত, গল্প করত, বনফুলের মালা দিয়ে দেবীকে সাজাত, খেলা করত আবার মাঝে মধ্যে কোনো পথিক পয়সা, ফল বা মিষ্টি দিলে রাখালগণ তা নিজেরাই গ্রহণ করত। তারপর একদিন জনৈক ধনীর অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় তিনি দেবীর জন্যে ইঁটের নির্মিত মন্দির নির্মাণ করে দেন এবং সেই মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই মন্দিরে পুরোহিত পুজোর পর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে চলে যান, ফলে রাখালগণ দেবীর উদ্দেশে দেওয়া পয়সা বা মিষ্টান্ন থেকে বঞ্চিত হয়। একদিন তারা মায়ের কাছে

আকুলভাবে তাদের মনের ব্যথা জানায়, হঠাৎ-ই একদিন দেখা গেল মন্দির দারুণভাবে ফেটে গিয়েছে ; সকলের ধারণা রাখাল বালকদের কাতর ডাকে সাড়া দিয়ে মা নিজেই একাজ করেছেন। তখন চাপা পড়ার ভয়ে পুরোহিত দেবীকে পুনরায় মুক্ত আকাশের নীচে স্থাপন করেন। স্বপ্নাদেশ হয় মন্দিরে আবদ্ধ থাকা আমার অভিপ্রায় নয়, বালকদের সঙ্গে আনন্দের মধ্যে থাকাতেই আমার আনন্দ ; এর বিপরীত কিছু ঘটলে সর্বনাশ হবে। সেই থেকে আর কেউ মন্দির নির্মাণের কল্পনা করেন না। দেবীকে রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্যে সামান্য একটা আচ্ছাদন দেওয়া আছে। এই মন্দিরটি শ্মশানের উপর অবস্থিত।

মন্দিরটির বিদীর্ণ হওয়ার কারণকে দেবীর রাখাল বালক-প্রীতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মন্দিরের এমনতর ঘটনা সম্বলিত কিংবদন্তী গ্রামে গঞ্জে অন্যত্রও সুলভ যেখানে বিভিন্ন দেব-দেবী উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করছেন, বিগ্রহ মন্দির মধ্যে অবস্থান করার বিরোধী এইরূপ জনশ্রুতির কারণে।

(য়) 'বিন্দুবাসিনী তলা' :

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার 'মহিষমারা' নামক গ্রামে অবস্থিত এই 'বিন্দুবাসিনী তলা', এটি এখানকার ভাণ্ডারদহ বিলের তীরেই গড়ে উঠেছে এই 'বিন্দুবাসিনী তলা' নামের পিছনে একটি কাহিনী রয়েছে।

অতি প্রাচীনকালে মুঘল রাজত্বের সময়ে এখানে জনবসতি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল বিশাল বনভূমি। এবং এই বনভূমিতে বিভিন্ন রকম জন্তু এমনকি বাঘেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই সময় (এই গাছতলায় এই বিন্দুবাসিনীর তলা, বেদী দিয়ে বাঁধানো একটি গাছ যেটির নাম কেউ এখনো বলতে পারে না ; বর্তমানে বেদীটি ভেঙে গেছে) বসে একজন সাধু সাধনা করতেন। এই সাধুর নাম 'আসমান গিরি', যিনি প্রায় ৩০ বছর ধরে সাধনা করার পর সিদ্ধিলাভ করেন। আসমান গিরির আগে আরও ছয়জন সাধু এখানে বসে সাধনা করে গেছেন, কিন্তু কেউই সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। আসমান গিরি ছাড়া সবাই ছিলেন বিবাহিত। আসমান গিরির সাধনার মূল ব্যাপারটাই ছিল 'বিন্দুরূপে' সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ বিন্দুরূপে পরম প্রকৃতি বিন্দুবাসিনীর উৎপত্তি এইভাবেই হয়। তিনি বিন্দুরূপে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিজের দেহ থেকেই মাকে (পার্বতী) সৃষ্টি করেন এই জন্যই এখানকার নাম হয় বিন্দুবাসিনী তলা ; ইনি প্রায় ১২৭ বছর বেঁচে ছিলেন এবং এঁদের সমাধিও এখানেই করা হয়। এই হচ্ছে 'বিন্দুবাসিনী তলা' উৎপত্তি হওয়ার ইতিহাস।

তবে এই 'বিন্দুবাসিনী তলা' সম্পর্কে আরও একটি কাহিনীর কথাও শোনা যায়। সেটি হল স্বামী নিন্দা শুনে পার্বতী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলে, তখন মহাদেব পার্বতীর দেহ নিয়ে প্রলয়কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলেন। দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ সতীর দেহ তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। এবং দেহের বিভিন্ন খণ্ড বিভিন্ন জায়গায় পড়ায় সেইসব জায়গার বিভিন্ন নামও শুনতে পাওয়া যায়। সেইরূপ নাকি এখানেও এক বিন্দু রক্ত এসে পড়েছিল, তাই সেই থেকে এখানকার নাম হয়ে যায় বিন্দুবাসিনী তলা।

তা যাই হোক এই বিন্দুবাসিনীকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনী বা ঘটনার কথা শুনতে পাওয়া যায়। এখানে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘোড়ায় চেপে আসতেন এবং তিনি এই সাধুর কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন। এবং এখান থেকেই নাকি তিনি তাঁর বিখ্যাত গান 'বন্দেমাতরম্' রচনা করেছেন বলে আঞ্চলিক ভাষায় এই জায়গাটিকে অনেকে বন্দেমাতলা বা বন্ধুমাতলা বলে থাকেন। তবে জায়গাটিকে সকলে জাগ্রত জায়গা বলে মেনে থাকেন। এখন এখানকার অবস্থা বড়ই করুণ। যে গাছটির নীচে বসে আসমান গিরি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সেটিকে কেন্দ্র করে যে মন্দির গড়ে দেওয়া হয়েছিল সেটি এখন প্রায় ভেঙেই গেছে বলা যায়। আসমান গিরির দুইজন পরিচারিকা থাকতেন। যোগমায়া এবং ব্রজমায়া। পরবর্তীকালে যোগমায়ার একটি ছেলে হয় তার নাম রাখাল ঠাকুর। এই রাখাল ঠাকুরকেই সাধু মরার আগে এখানকার সমস্ত ভার অর্পণ করেন।

পরবর্তীকালে রাখাল ঠাকুরের দুই ছেলে হয়। একজন সৃষ্টি ধর ঠাকুর এবং অপরজন শঙ্কর ঠাকুর।

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনীকে আশ্রয় করে—'বিন্দুবাসিনীতলা'র কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে।

(২) আদমতলা ঃ

'আদমতলা' মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন 'বেলডাঙ্গা' থানার অন্তর্গত মানিকনগর গ্রামে বেলডাঙ্গা স্টেশন থেকে প্রায় ২০ কি.মি. ভিতরে অবস্থিত।

মানিকনগরের পাশ দিয়ে একটি 'বিল' প্রবাহিত, যেটির নাম হচ্ছে ভাণ্ডারদহ বিল। পুরাকালে এই ভাণ্ডারদহ বিল দিয়ে বিভিন্ন জিনিস চালান যেত কলকাতায়। এখানে উল্লেখ্য ঐ বিলের সঙ্গে গঙ্গা নদীর যোগ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়, যার ফলে এই বিল দিয়ে যে কোন জিনিস কলকাতায় নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হত না। এবং এইসব জিনিসের মধ্যে একটি হল

শাল গাছের কাঠ। বড় বড় শাল গাছের কাঠ এই বিল দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত।

এগুলি কোন নৌকোতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত না। এগুলি নিয়ে যাওয়ার এক বিশেষ পদ্ধতি ছিল। পদ্ধতিটি হল 'কলার ভেলা' যেমন অনেকগুলি কলাগাছকে বেঁধে তৈরী করা হয় এবং তার ওপর চেপে অনায়াসেই কোন বৈঠা বা বাঁশের বাতা দিয়ে বেয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেইরূপ অনেকগুলি শালগাছকেও একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর তিন চারজন চেপে হাত বৈঠা দিয়ে বেয়ে বেয়ে নিয়ে যেত। (তাছাড়াও আমরা জানি যে যেকোন জিনিসের জলে তার ওজন কমে যায়)। সুতরাং এইভাবে নিয়ে যাওয়াটা বিশেষ অসুবিধার হত না। এই ব্যবস্থাকে তখনকার ভাষায় বলা হত 'শালকাঠের বাহাদুর।' তো এইরকমভাবে একদিন একটি দল শালকাঠের বাহাদুর নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় এই ভাণ্ডারদহ বিলে ভাসিয়ে। কলকাতাতো আর এখানে নয়। বহু দূরে অবস্থিত। তাই এইভাবে যেতে যেতে তাদের প্রায় জায়গায়ই ঠেক নিতে হত। প্রায় ৪-৫ দিন লেগে যেত তাদের কলকাতায় পেঁছিতে। এইভাবে আসতে আসতে ঐ দলটিরও একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেলে। তাই ঐ দিনের মত তাবা আশ্রয় নিল একটি জায়গায়, জায়গাটির নাম হচ্ছে 'পীড়তলা' এই জায়গাটি চাঁদপুর নামক একটি গ্রামের একটি জায়গার নাম। এবং এই গ্রামটিও মানিকনগর গ্রামটির বিপরীত পাশে অবস্থিত অর্থাৎ ভাণ্ডারদহ বিলের এপারে মানিকনগর ও ওপারে চাঁদপুর গ্রাম অবস্থিত। এই চাঁদপুরের 'পীরতলা' নামক জায়গায় তারা রাত্রের মত আশ্রয় নিল ঐ শালকাঠের বাহাদুরকে রেখে। এর মধ্যেই ঘটে গেছে অলৌকিক ঘটনা। তারা যখন সকালে 'শালকাঠের বাহাদুর' নিয়ে রওনা হতে যাবে তখনই দেখতে পেল যে ঐ শালকাঠের বাঁধনটি আলগা হয়ে গেছে এবং তারা গুণে দেখলো যে একটি শালকাঠ নেই। তখন তারা হন্যে হয়ে ঐ শালকাঠটি খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও সেটিকে খুঁজে পেল না। খুঁজতে খুঁজতে সারাদিনটি তাদের চলে গেল। এবং সেদিনের মতও তারা সেই পীড়তলায় রাত্রিটা কাটানোর জন্য রয়ে গেল। এবং সেই দলের সর্দার স্বপ্ন দেখলো যে ঐ শালকাঠটি বলছে যে তারা যেন তাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা না করে, কেননা সে আর যাবে না সে এখানেই থাকবে। এই স্বপ্ন দেখার পর তারা সেই শালগাছটি আর না খুঁজে কলকাতার দিকে রওনা হল। এদিকে আবার আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার ঘোষ পরিবার তথা ৺ক্ষিতীশ ঘোষ যার পিতা হলেন সতীশ ঘোষ, নামকরা পরিবার, তিনি স্বপ্ন পেলেন যে ঐ শালকাঠটি যেন তাকে বলছে আমি মানিকনগরের বিলের অমুক জায়গায় রয়েছি

তুই আমাকে তুলে দুধ গঙ্গাজল দিয়ে 'আদম' বা শিব হিসাবে পূজা কর। তখন সেই স্বপ্নের কথা শুনে ঘোষ পরিবার পরেরদিনই এসে লোকজনের সহায়তায় তাকে জল থেকে তুলে দুধ গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করলেন এবং তাকে রাখার জন্য একটি পূজার বেদী তৈরী করে দিলেন। এবং তখন থেকেই ঐ জায়গাটির নাম হয়ে গেল আদমতলা। এবং সেই থেকেই ঐ গাছকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর আদমপূজা হয়ে থাকে। আদমপূজাঅনুষ্ঠিত হয় ১লা বৈশাখে। এছাড়াও ৩০ তারিখে তাকে জল থেকে উঠিয়ে মানিকনগরের মণ্ডপে পূজা করা হয় এবং পূজার ২৪ ঘণ্টা পরেই আবার তাকে জলে রাখা হয় তার গায়ে তেল হলুদ মাখিয়ে। অর্থাৎ প্রায় ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬৫ দিনই সে জলে অবস্থান করে। এবং এতদিন জলে থাকা সত্ত্বেও তার গায়ে কোন শেওলা বা শামুক গুগলি লাগে না। এছাড়াও আর একটি কিংবদন্তীও শোনা যায় এই আদমতলাকে কেন্দ্র করে। এই কিংবদন্তীটি হল এইরকম।

একদা একসময়ে এখানে প্রচুর বনজঙ্গল ছিল। এবং ঐ বনজঙ্গলের ভিতর শাল গাছও ছিল একটি। একদিন ঘটনাচক্রে ঐ বনে আগুন লাগে এবং সমস্ত গাছপালা পুড়তে থাকে, সেই সঙ্গে শাল গাছটি পুড়তে থাকে। কিন্তু পোড়ার সময় শালগাছটি এমন শব্দ করছিল যে মনে হচ্ছিল যে চিঁ-চিঁ করে আওয়াজ করে কেঁদে বলছিল আমাকে বাঁচাও। ঐ সময় ঐ বেলডাঙ্গার বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের একজন ঐদিক দিয়ে যেতে যেতে ঐ শব্দ শুনে বনে গিয়ে দেখেন যে ঐ শালকাঠটি থেকে ঐ রূপ আওয়াজ হচ্ছে। তখন তার কাছে ছিল এক বালতি 'দুধ' ঐ দুধ ঢেলে সে ঐ গাছটিকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে গাছটি তাকে বলে, তুই যখন আমাকে বাঁচালি তখন তুই আমাকে প্রতি বছর আদম বা শিব হিসাবে পূজা করবি তাহলে তোর কোনদিন অভাব হবে না। সেই থেকে ঐ ঘোষেরা প্রতি বছর পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং সব আগে ঐ ঘোষ পরিবারের 'দুধ' না হলে পুজো হবে না। আগে ঐ ঘোষ পরিবারের পুজো হবে তারপর অন্যদের পুজো। এইভাবেও ঐ আদমতলার সৃষ্টি রহস্য শোনা যায়।

আদমতলার উৎপত্তি নিয়ে কিংবদন্তীটিতে অলৌকিকত্ব কিছুটা আছে লক্ষিত হয়। তবে সেইসঙ্গে শাল কাঠ কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার যে বিশেষ পদ্ধতির কথা উল্লিখিত হয়েছে তা বাস্তবানুগ। একটি শাল কাঠের অন্তর্ধান ও স্বপ্নদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ কিংবা জ্বলন্ত শাল গাছের আর্তির বর্ণনায় আতিশয্য লক্ষিত হয়।

(৫) রঞ্জিত রায়ের দীঘি :

আরামবাগ থেকে ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত গড়বাড়ী নামক জায়গায় বাস

করতেন রঞ্জিত রায়। তিনি ছিলেন গড়বাড়ীর জমিদার। দেবতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে এক বিরাট পুকুর কাটিয়েছিলেন, তার একমাত্র আদরের মেয়ে, বয়স মাত্র ছয়-সাত। খুব ছোট বয়সেই মাকে হারিয়েছিল, কাজেই বাবার বড় আদরের মেয়ে। ছোট বয়স থেকেই প্রায়ই বাবাকে বলত, বাবা, আমি যাব? কিন্তু কোথায় যাবে, কেন যাবে তার কোন সদুত্তর পাওয়া যেত না। একদিন বেলা ১০টা-১১টার সময় রঞ্জিত রায় জমিদারীর কাজে খুবই ব্যস্ত, তেমন সময় মেয়েটি বাবার কাছে গিয়ে বলল, বাবা, আমি যাবো? রঞ্জিত বিরক্তির সঙ্গেই উত্তর দিলেন, যাও। মেয়েটি চলে গেল সেই স্থান ছেড়ে। সোজা গিয়ে সেই পুকুরের ঘাট দিয়ে জলে নামল। জলে ডুব দিয়ে আর উঠল না। সেই খবর রঞ্জিত রায়ের কানে পেঁছিল। রঞ্জিত রায় পুকুরের ঘাটে এসে অনেক ডাকাডাকির পর পুকুরের মাঝ থেকে দুটি হাত তুলে দেখাল, আবার জলে ডুবে গেল। সেই থেকে চৈত্র মাসে ঐ দিনটিতে আজও দীঘির মেলা হয়।

স্বপ্নাদেশে পুকুর খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহ স্থাপন কিংবদন্তীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'রঞ্জিত রায়ের দীঘি'ও তেমনি স্বপ্নাদেশে কর্তিত হয়েছিল। তবে রঞ্জিত রায়ের মাতৃহারা কন্যার সলিল সমাধির বিষয়টি কিংবদন্তীটিতে নূতন মাত্রা যোগ করেছে।

(ঃ) মুর্শিদাবাদ জেলার কেদার চাঁদপুর গ্রামের নামের ইতিহাস ঃ

মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত এই গ্রামটির নাম কিন্তু আগে চাঁদপুরই ছিল। পরে কেদারবাবুর নামানুসারেই এই গ্রামটির নাম চাঁদপুর থেকে কেদার চাঁদপুর হয়েছে। এই জেলাতেই আরও দুটো চাঁদপুর রয়েছে। তাই চিঠিপত্রের আদান প্রদান করা খুব অসুবিধা হয়ে পড়ত। তখন এ এলাকাটি ছিল এই মুর্শিদাবাদ জেলারই হরিহর পাড়া থানার অন্তর্গত চুয়ার জমিদারের। তাঁরই অনুমতি পেয়ে এই জেলারই পাটিকা বাড়ীর কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই চাঁদপুর এলাকাটি দেখাশুনার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এবং প্রায়ই তাকে কাজের হিসাব চিঠির মাধ্যমে পাঠাতে হত জমিদারের কাছে। কিন্তু চিঠিগুলি হয়ত ঠিক মতন যেত না বা আসত না। কেননা এই গ্রামটি ছাড়াও এই জেলাতেই আরও দুটো চাঁদপুর থাকায় অনেক সময় চিঠি এই গ্রামে না এসে হয়ত অন্য চাঁদপুরে চলে যেতো। ফলে অনেক সময় লেগে যেত একটি চিঠি আসতে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কেদারবাবু ও জমিদারের ইচ্ছায় কেদারবাবুরই নামে নামকরণ করা হয়, 'কেদার চাঁদপুর'।

এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা, অবাস্তবতা কিংবা জল্পনার লেশমাত্র নেই এটিতে।

(৮) বিষ্ণুপুরের কালী ঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অন্তর্গত একটি অঞ্চল হল বিষ্ণুপুর। কালীমাতার বিখ্যাত মন্দির এখানে। বহুদূর দেশ থেকে লোকে এখানে পুজো দিতে আসে। বহরমপুর স্টেশন থেকে খুব বেশী দূরত্ব হবে না। অনেকে আবার বিষ্ণুপুর না বলে বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ীও বলে থাকে।

এই কালী আজকের নয়, প্রায় ৪০০ বছরের পুরানো। মোঘল রাজত্বের পতনের সময় থেকে বলা যায়। 'কৃষ্ণানন্দ হোতা' নামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণই ছিলেন এই কালীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। এখন বর্তমানে গঙ্গার প্রবাহ যে দিক দিয়ে আছে, তখন কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ আজকের মত ছিল না। তখন গঙ্গা বর্তমানে যেখানে কালীবাড়ী স্থাপিত, তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এবং এই জল পথে অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। ইংরেজ পর্তুগীজ ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশীরা এই বাংলার সঙ্গে জলপথে বাণিজ্য চালাত। মোটামুটি ১৭০০ সালের শেষপাদ বা ১৮০০ সালের মাঝামাঝি সময় বলা যায়। সেই সময় সরফরাজকে পরাজিত করে আলিবর্দি খাঁ বাংলার নবাবী করছেন। তিনিই এখানে যে জলপথে বিদেশীয় বণিকগণ ব্যবসা বাণিজ্য করত, তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য এখানকার প্রধান কর্মচারী হিসাবে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করলেন। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হিসাবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। এঁরই নাম হল কৃষ্ণানন্দ হোতা। ইনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজকর্ম করতে লাগলেন এবং হিসাব-নিকাশ ঠিকমত দিতে থাকলেন। এতে তাঁর প্রতি নবাবের আস্থা আরও বেড়ে গেল। এঁর বাড়ী ছিল গঙ্গার ওপারে (বর্তমানে এপারে) সয়দাবাদ নামক স্থানে। সেখান থেকে তিনি প্রত্যেকদিন আসতেন এপারে ফেরী ঘাটে নৌকো পার হয়ে। কেননা তার অফিসটি এপারেই ছিল। প্রত্যেকদিন অফিসের কাজ সেরে বর্তমানে কালীবাড়ীর পাশেই যে পাকা ঘাটটি আছে সেখানে এসে অনেকক্ষণ ধরে বসে বিশ্রাম নিতেন এবং সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ফেরী ধরে আবার বাড়ী ফিরে যেতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কালী-বাড়ীর পাশে যে ঘাটটি বর্তমানে রয়েছে সেটি পূর্বে কিন্তু শ্মশানঘাট ছিল। এখানে মড়া পোড়ানো হত। এখানেই কৃষ্ণানন্দ হোতা অনেকক্ষণ ধরে বিশ্রাম নিতেন। এইভাবে যখন তাঁর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তখন হঠাৎ তাঁর জীবনে একটি ঘটনা ঘটে গেল। তখন তাঁর প্রায় ষাশির কাছাকাছি বয়স হবে তখনও পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। মনে তাঁর বড়ই

দুঃখ ছিল। তিনি স্থির করলেন এবং গিন্নীকেও বললেন, "দেখ গিন্নী এই আমাদের কোন সন্তানাদি হল না, আমাদের ধনসম্পত্তি কে ভোগ করবে? তাই যা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে সব বেচে দিয়ে, দান-ধ্যান করে তীর্থে গিয়ে কাটাব। এই কথায় গিন্নীও সায় দিলেন। এইরকম যখন তাঁদের মনের অবস্থা, সেই সময়ই ঘটল তাঁর জীবনের সেই ঘটনাটি। প্রত্যেকদিন যেমন তিনি অফিসে যান, সেদিনও স্নানাহ্নিক সেরে অফিসে গেলেন। অফিসে গিয়ে তারপর যেমন ফেরবার আগে অনেকক্ষণ শ্মশানঘাটে গিয়ে কাটান সেদিনও তিনি অফিস থেকে ফেরার পথে বিশ্রাম নিতে শ্মশানঘাটে গিয়ে বসেছেন। শ্মশানঘাটের পাশে একটি বিশাল বটবৃক্ষ অবস্থান করত। সেই বটগাছের নীচে বসে তিনি বিশ্রাম উপভোগ করছেন, গাছে হেলান দিয়ে।

ঘুম ঠিক আসেনি, তাঁর তখন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব বলা যায়। এই অবস্থায় তিনি দেখলেন যে কে যেন তাঁকে বলল যে তাঁর ঘরে মা আসবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চোখ খুললেন কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। কিছু তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটল না। এবং তিনি ভাবলেন যে হয়ত তিনি কিছু কুড়িয়ে পাবেন পাথরের মূর্তি বা এই ধরনের একটা কিছু। তিনি খোঁজাখুঁজিও করলেন অনেকক্ষণ ধরে; কিন্তু পেলেন না কিছুই। এইভাবে একটা বছর প্রায় কেটে গেল, অবশেষে একদিন তিনি পিতা হলেন। এই বয়সেও তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্ম নিল। তাঁর আনন্দ আর ধরে না। তিনি যে ঘর-বাড়ী ধনসম্পত্তি বিক্রী করে তীর্থে চলে যাবেন বলেছিলেন; আর কিন্তু যেতে ইচ্ছেই করল না। এখানেই মেয়ের টানে থেকে যাওয়া মনস্থ করলেন। মেয়ের তিনি নাম রাখলেন দয়াময়ী। যেহেতু মার দয়াতেই তাঁর এই সন্তানলাভ এই ভেবেই ঐরূপ নামকরণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর জীবন কন্যাকে নিয়ে বেশ সুখেই কেটে যায়। দেখতে দেখতে কন্যাও বেশ বড় হয়ে ওঠে। সেইযুগে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো। তাই এক্ষেত্রেও কৃষ্ণানন্দের মেয়ে দয়াময়ীর বয়স যখন প্রায় ৮-৯ বৎসর, তখন তিনি মেয়েকে পাত্রস্থ করার কথা ভাবলেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তিনি এবং তাঁর গিন্নী তীর্থে চলে যাবেন ভাবলেন। আর কাজে তাঁর কিছুতেই মন বসছিল না।

দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, আর ভাল লাগছে না কাজ করতে। তিনি এবার ছুটি চান। এ ব্যাপারটি জানালেন নবাবকে। নবাব শুনে বলেন, ঠিক আছে, আমি একদিন যাচ্ছি ওখানে, আলোচনা করার পর দেখা যাবে। নবাব একটি নির্দিষ্ট তারিখও দিলেন, এই তারিখে আমি আপনার ওখানে যাচ্ছি। যথারীতি তাঁর অফিসে আসার দিন এসে গেল নবাবের। অন্যান্য

দিনের তুলনায় কৃষ্ণানন্দ একটু আগে-ভাগেই তাঁর স্নানাহ্নিক সেরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। বাবাকে আজকে একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে দেখে মেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা! আজকে তুমি কোথায় যাবে"। তিনি বললেন, আজকে নবাব আসবেন; আজকে একটু তাড়াতাড়ি অফিস যেতে হবে। এদিকে হল কি-না, বাবার মুখে নবাব আসার কথা শুনে সে নবাবকে দেখবে বলে বায়না ধরল। বাবা তখন তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে অনেকটা রাস্তা, সে যেতে পারবেনা হেঁটে। আর এই বয়সে এতখানি রাস্তা তিনি তাকে কোলে করে নিয়ে যেতেও পারবেন না। তাই তাকে বিভিন্ন রকম কথা বলে ভোলানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হল। সে নাছোড়বান্দা, নবাব দেখতে যাবেই। অগত্যা কৃষ্ণানন্দ কি আর করেন! শেষপর্যন্ত মেয়েকে নিয়ে যেতেই হল। তাঁর একটামাত্র মেয়ে, সুতরাং তার আবদারতো তাঁকে রাখতেই হবে। তাকে নিয়ে যথারীতি তিনি ফেরীও পার হলেন। তখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে আর এক সমস্যা দেখা গেল।

তারা পেঁাচেছেন চাররাস্তা মিশেছে যেখানে সেইরকম স্থানে। একটি গিয়েছে খাগড়া-র দিকে, একটি কালিকাপুর, একটি কাশিমবাজার ও আর একটি এসেছে এই বিষ্ণুপুরে। চৌমাথায় এসে মেয়ের পায়ে কাঁটা ফুটে গেল। কাঁটাতো যাহোক করে তোলা গেল। তখন কিন্তু আর সমস্যা দেখা দিল। এতক্ষণ মেয়ে বেশ হেঁটে আসছিল। কিন্তু যেই কাঁটা ফুটল তখন থেকে সে বলল যে সে আর হাঁটতে পারবে না তার পা ব্যথা করছে। কৃষ্ণানন্দ পড়ে গেলেন মহা বিপদে। এখন তাকে নিয়ে তিনি কি যে করবেন। এই বয়সে তাকে কোলে কি করে নিয়ে যাবেন। এখনো অনেক রাস্তা বাকী। তাছাড়া অনেকটা রাস্তা চলেও এসেছেন। এখন আর তাকে নিয়ে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়; তাহলে এদিকে দেরী হয়ে যাবে। তিনি পড়ে গেলেন মহা বিপদে। তখন তিনি তাকে বকতে লাগলেন, তখনই তোকে বলেছিলাম যে তুই আসিসনে, হাঁটতে পারবি না। কিন্তু আমার কথা শুনলি না। এখন আমি কি করি তোকে নিয়ে? এই রকম সময়ে তিনি এক শাঁখারীকে দেখতে পেলেন ঐ রাস্তায়, যার বাড়ী তাঁর বাড়ীর পাশেই। তাকে দেখেই তিনি তাঁর বিপদের কথা বললেন; যে তিনি মেয়েকে নিয়ে ভারি সমস্যায় পড়েছেন। মেয়ে তাঁর নবাব দেখার বায়না ধরে তাঁর সঙ্গে এসেছিল, কিন্তু পথিমধ্যে তার পায়ে কাঁটা ফোটায় আর সে হাঁটতে পারবে না বলছে। এদিকে নবাবের আসার সময় হয়ে গেছে। তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় মেয়েকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে আবার আসা। তাই সে যদি তার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বাড়ী পেঁৗছে দেয় তাহলে খুব ভাল হয়। এইকথা

শুনে শাঁখারী বলে যে সে নিশ্চয় নিয়ে যাবে। তাঁর কোন চিন্তার কারণ নেই, সে ঠিকমত তার মেয়েকে বাড়ীতে পেঁছে দেবে। তার বাড়ীতো কৃষ্ণানন্দের বাড়ীর কাছেই। সুতরাং তিনি নিশ্চিত মনে চলে যান। এই কথা শুনে কৃষ্ণানন্দ খুশী হয়ে মেয়েকে ঠিকমত বাড়ী পেঁছে দেওয়ার কথা বলে রওনা দিলেন। এদিকে বাবা চলে গেলে মেয়ে বলল, আমি পরে যাব, আমি এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যাব না। তুমি যাও। তার এইসব কথা শুনে তো শাঁখারী মহাবিপদে পড়ল। সে তখন তাকে অনেক কিছু বলে বোঝাতে লাগল,—দেখ আমি তোমার বাবাকে কথা দিয়েছি যে ভালভাবে আমি তোমাকে বাড়ী পেঁছে দেব, তুমি যদি এমন কর, তাহলে কি করে হয়। তাছাড়া আমি অনেক খাটা-খাটুনি করে আসছি। যাই হোক অনেক করে বোঝানোর পর সে যেতে রাজি হল এবং যে মেয়ে একটু আগে হাঁটতে পারছিনা বলেছিল সে মেয়ে দিব্বি সুন্দর এমন জোরে তার আগে হেঁটে যাচ্ছিল যে সেই-ই তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে এসে গেল সেই খেয়াঘাট। খেয়াঘাটে এসে যথারীতি খেয়াপার হয়ে সে আবার বায়না ধরল যে,—এত তাড়াতাড়ি সে বাড়ী ফিরবে না। তখন শাঁখারী তাকে অনেক কথা বলে বোঝাতে লাগল।

অবশেষে সে যেতে রাজি হলেও বায়না ধরল যে সে গঙ্গার তীরে তীরে যাবে। অগত্যা তার কথাতেই তাকে রাজি হতে হল। গঙ্গার তীর ধরেই তার সঙ্গে চলতে লাগল। সে এমন লম্বা লম্বা পা ফেলে তার আগে যেতে থাকল যে, শাঁখারী তাল মিলিয়ে তার সঙ্গে চলতে পারল না। ফলে সে একটু পিছিয়ে পড়ল যেতে যেতে সে হঠাৎ-ই দেখল যে, মেয়েটি ক্রমশঃ জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। নামতে নামতে সে দেখল যে, এক কোমর জলে গিয়ে সে যেন কিছুতে বসে পড়ল। শাঁখারী তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে বলল যে সে জলে কেন নামছে। 'জল থেকে উঠে এস, আমাকে আর কষ্ট দিওনা। তাড়াতাড়ি বাড়ী চলো'। এবারে কিন্তু দয়াময়ীর দৃঢ় সংকল্প, সে আর কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাবে না, যতই সে বোঝাক না কেন এখানেই সে থাকবে। এবং সে শাঁখারীকে বলল, তুমি আমায় চারটে শাঁখা দুটো-দুটো করে দু-হাতে পরিয়ে দাও। আমি শাঁখা পরব। তখন সে ভাবল শাঁখা পরলে যদি জল থেকে উঠে আসে, এই আশায় দু হাতে দু-টো করে মোট চারটে শাঁখা পরিয়ে দিল। কিন্তু দয়াময়ী জল থেকে কিছুতেই ওপরে উঠতে চাইল না। সে শাঁখারীকে ওপরে উঠে যেতে বলল এবং বলল, তুমি বাড়ী গিয়ে মা-বাবাকে বলবে যে তার মেয়ে চারটে শাঁখা পরেছে তার জন্য টাকা দিতে। তাদের বলবে যে ঘরে তাক আছে, সেই তাকের ওপর একটি সিঁদুর টুপি আছে। সেই টুপিতে দশটি টাকা আছে। সেই টাকা থেকে দিতে বলবে। তখন আর

শাঁখারী কি করবে বিফল মনোরথ হয়ে যখন তাকে শাঁখা পরিয়ে ডাঙ্গায় উঠে এল, তখন সে আর এক দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। সে দেখল দয়াময়ী ক্রমশঃ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে উঠে আরও বেশী জলের দিকে যেতে শুরু করে দিয়েছে। হাত দুটি ওপরে তুলে। এবং দেখল যে যখন সে মাঝখানে তখন তার শাঁখা পরা হাত দুটিও ডুবে গেল জলে। আর কিছুই দেখতে পেল না। সে একটু পরেই দেখল যে ঐ ওপরের দিকে হাত রেখে উঠছে। অর্থাৎ এপার থেকে আবার ওপারের দিকে যেতে থাকছে। এবং হঠাৎ সে দেখল যে দুটো হাতের পাশে আরও দুটো হাত গজিয়ে গেল। দেখল যে চার হাতে চারটি শাঁখা পরানো। এই দৃশ্য দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার কিছু করার বা বলার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে সে আর তাকে দেখতে পেলনা। এই দৃশ্য দেখে সে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ীর দিকে রওনা হল। সে এই ভেবে আরও অস্থির হল যে সে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরকে কি বলবে। সে তাকে কথা দিয়েছিল যে, সে দয়াময়ীকে বাড়ী পেঁছে দেবে, কিন্তু সে পারল না। তাদের কাছে যদি এই বৃত্তান্ত খুলে বলি তাহলে তারাতো মোটেই বিশ্বাস করবে না। যাই হোক কপালে যা থাকে তবু সে একথা তাদের জানাবে বলে স্থির করল। প্রথমে সে নিজের বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে যখন এই ঘটনা বলার জন্য কৃষ্ণানন্দের বাড়ীর দিকে রওনা হল, তখনই দূর থেকে দেখতে পেল কৃষ্ণানন্দ হন্তদন্ত হয়ে ফিরছেন এবং তাঁর বাড়ীর কাছে এসে শাঁখারীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে সে ঠিকমত তার মেয়েকে বাড়ী পেঁছে দিয়েছে কিনা ? তার উত্তরে সে নিরুত্তর থাকায় তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাহলে কি তাঁর মেয়ের কোন বিপদ-আপদ হল ? শাঁখারী তখন আদ্য পান্ত যা-যা ঘটেছে তা সব বর্ণনা করল কৃষ্ণানন্দকে। তিনি এই কথা শুনে তো বিশ্বাসই করলেন না বরং রাগান্বিত হয়ে তাকে বকতে লাগলেন। কৃষ্ণানন্দ ও তাঁর স্ত্রী কেউই একথা বিশ্বাস করলেন না। তাছাড়া ও যে কথা বলেছে যে তাকের ওপর সিঁদুর টুপিতে টাকা আছে, একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা, তাকটি ছিল নোংরা এবং বিভিন্ন রকম জিনিসে ভর্তি এবং সিঁদুর টুপিও তাদের কোন কালে ছিল না বা নেই। যাইহোক তবু একবার কৃষ্ণানন্দ তাকটি দেখতে গেলেন। গিয়ে তো অবাক। দেখলেন তাকটিতে ধুলো-ময়লাতো কিছু নেই-ই, বরং বেশ পরিষ্কারই রয়েছে এবং এই দেখে আরও বিস্মিত হলেন যে সেখানে একজায়গায় এ টি সিঁদুর টুপি রয়েছে এবং সিঁদুর টুপি খুলে দেখলেন তাতে দশটি টাকাও রয়েছে। এই দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তখন তাঁর যে অবিশ্বাস হয়েছিল, যে শাঁখারী বানিয়ে বলছে এসব কথা তা কিন্তু দূর হয়ে গেল। তখন তিনি শাঁখারীকে টাকা দিতে গেলে

শাঁখারী নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, যে শাঁখা পরিয়েছি তার জন্য আমি মায়ের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব না। তবু কৃষ্ণানন্দ জোর করে টাকা ধরিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, যে জায়গায় এই ঘটনাটি ঘটেছে সে জায়গাটি তাঁকে দেখাতে। তখন শাঁখারী তাঁকে সেই জায়গায় নিয়ে এল। তিনি অনেক ডাকাডাকি করলেন, মা আমাকে দেখা দে। তখন হঠাৎ দেখলেন যে জলের মাঝখান থেকে দুটি শাঁখা পরা হাত উঠে আবার ডুবে গেল। এই দৃশ্য দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে গেলেন। মনে খালি এই চিন্তা হতে থাকল যে মা তাঁদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।

যাইহোক এইভাবে দিন কাটতে লাগল. কিন্তু কৃষ্ণানন্দর মনে শান্তি নেই। তিনি একদিন ভারাক্রান্ত মনে শ্মশানঘাটে বসে আছেন, সেই সময় তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, মায়ের একটি ছোট পাথরের মূর্তি গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, মা তুই এখানে এসে আছিস। তাহলে এখানেই আমি তোর থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই কথা শুনে মা বললেন, না না তার দরকার নেই, তোমার টাকা পয়সা তুমি সৎ কাজে ব্যয় কর। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব। তিনি তাঁকে আরও বললেন যে ঐ ফেরী ঘাটে লোকেদের বড় কষ্ট হয় তুমি ওখানে একটা সাঁকো করার ব্যবস্থা করে দাও এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে দাও। এরপর মায়ের কথা মত তিনি যে ফেরীঘাটে তিনি প্রত্যেকদিন পার হয়ে আসতেন সেখানে টাকা খরচ করে পাকা সাঁকো বানিয়ে দিলেন। সেই সাঁকো এখনো পর্যন্ত তাঁর নাম অনুসারে হোতা সাঁকো নামেই পরিচয় লাভ করে আসছে। এছাড়াও তিনি আরও অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে ছিলেন। তিনি তখনকার দিনে ১২০০০ টাকা দিয়ে জমিদারী কিনে সেখানে দয়াময়ীর মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং দৈনিক তার পুজো করতে থাকেন। যেহেতু তাঁর কন্যা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, সেহেতু তাকে কাছে রাখার জন্য তার মূর্তিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁরই বাড়ীর কাছে. অর্থাৎ বর্তমানে বহরমপুরের সয়দাবাদ নামক জায়গায়। এদিকে শ্মশানঘাটের কাছে বটগাছের ফাঁকে যে মায়ের মূর্তি দেখা গেল সেখানেও তিনি পুজোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এখানে একটি অসুবিধা দেখা গেল। অসুবিধাটা হচ্ছে যদিও মা বটগাছের কোটরে অবস্থান করছিলেন তবু গাছের গা বেয়ে বেয়ে মায়ের গায়ে জল পড়তে লাগল। তাই দেখে সেইখানেই কৃষ্ণানন্দ তাকে ঘিরে একটি ছোট্ট মন্দির তৈরী করে দিলেন। এরপর দেখতে দেখতে প্রায় ১০০ বছরের কাছাকাছি বয়সে কৃষ্ণানন্দ মারা গেলেন। তিনি মারা গেলেও পুজো কিন্তু ঠিকই চলতে লাগল। একদিন বহরমপুরের স্বর্ণময়ী অঞ্চলের মহারানীর স্বামী কৃষ্ণকান্ত নন্দী শিকার করতে এসে এখানে বিশ্রাম করতে থাকেন। সেইসময় বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন

তিনি দেখলেন যে বটগাছের নীচে মায়ের যে মূর্তি রয়েছে তাতে মন্দির থাকা সত্ত্বেও জল পড়ছে। তখন তিনি ঠিক করলেন যে মন্দিরটি আবার ঠিক করে তৈরী করে দেবেন। পরের দিন তিনি মিস্ত্রী দিয়ে মন্দিরটিকে ভাল করে তৈরী করে দিলেন।

এর পর অবশ্য ১৩২৩ সালে লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় এখানে ভালরকম ভাবে মায়ের মন্দির করে দেন। এই মন্দির তৈরী করার সময় একটি অসুবিধা দেখা দেয় সেটি হল যেহেতু বটগাছটি রয়েছে সেইহেতু মন্দিরের চূড়া করা খুব মুশকিল এই নিয়ে দুটি দলের সৃষ্টি হল। একদল বলল চূড়া করতে হবে আর একদল বলল যে না মন্দিরের চূড়া হবে না। এ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে একটি অলৌকিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। সেটি হল যখন দু-টো দলের মধ্যে চূড়া হওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব লাগে তখন নাকি একসময় মার মূর্তি ছাড়া আর গাছের বাকী অংশ একেবারে মুচড়িয়ে ভেঙে গিয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। কিন্তু মা যেখানে ছিলেন, সেইখানেই অবস্থান করলেন কোথাও একটুও নড়েননি। এই ঘটনা দেখে একদল যারা মন্দিরে চূড়া হবে না বলে দাবি জানাচ্ছিল তারা বলল চূড়া হবে না বলেই মা এইরূপ ঘটনা ঘটালেন। আর একদল বলল চূড়া করার জন্যই মা এইরূপ ঘটনা ঘটালেন। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিন্তু মন্দিরের চূড়া করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত সেই মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে মানতের পুজোই বেশী হয়। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রোগ যা ডাক্তার জবাব দিয়েছেন তা মায়ের কৃপায় নাকি ভাল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে বহু ঘটনা আছে। কোন এক মুসলিম মহিলা তার বাড়ী হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতন বাজারে। এঁর ছেলের অসুখ যখন কোন ডাক্তারই ভাল করতে পারছেন না, তখন সে ভারাক্রান্ত মনে চোখ বুজে ভাবতে থাকে যে তার ছেলে তো আর বাঁচবে না। কোন ডাক্তারই ভাল করতে পারলেন না। এই ভাবতে ভাবতে সে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে যেন শুনতে পেল যে মা বলছেন, ছেলেকে পোড়া বাতি খাওয়া, তাহলে তোর ছেলে ভাল হয়ে যাবে। তখন সে ছুটতে ছুটতে এসে কালীবাড়ীতে যে সেবাইত ছিলেন আশুতোষ পাণ্ডে তাঁকে এসে ঘটনাটি বললে তিনি তাই খাওয়াতে বলেন। এবং বাড়ী এসে সে তার ছেলেকে পোড়া বাতি খাইয়ে দেখে যে তার ছেলে ভাল হয়ে গেছে। এই রকমের বহু ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে এই মাকে ঘিরে। মা নাকি বলেন যে এখানে ১০৮ জন সিদ্ধি লাভ করবেন, তার মধ্যে কৃষ্ণানন্দ হোতা এবং উদয়গিরির নাম পাওয়া যায়। আরও কয়েকজন যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরা হলেন আর কে প্রহ্লাদানন্দ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এখানে পুজো বেশ ভাল ভাবেই চলে আসছে। এবং বছরে একমাস ধরে এখানে মেলা ও পুজো চলে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকে ছুটে আসে এখানে পুজো দেবার জন্য। যদিও এটি হিন্দুর মন্দির, তবুও কিন্তু কোন মুসলমানের পুজো আগে এলে তার পুজো আগে করা হয়। তারপর হিন্দুদের পুজো হয়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথাও শোনা যায়, ঘটনা হল মুর্শিদাবাদ জেলার পাহাড়পুর গ্রাম নিবাসী এক মুসলমান ভদ্রলোকের এক গ্লাস দুধকে কেন্দ্র করে। ঐ ভদ্রলোকের একটি গাই গরু ছিল। ঐ ভদ্রলোক নাকি একদিন স্বপ্ন দেখল যে এখানকার কালীমা বলছেন, যে তার গাভী যখন প্রথম প্রসব করবে, তখন প্রথম যে দুধ হবে, সেই দুধের একগ্লাস আমাকে দিবি। এই স্বপ্ন পেয়ে সে গাই প্রসব করলে যে প্রথম দুধ হয়, সেই দুধের একগ্লাস এই মা কালীকে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসল, কিন্তু সে যেহেতু মুসলমান, তার পুজো নেওয়া হবে না বলে তখন যিনি সেবাইত ছিলেন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তার দুধ নেওয়া হল না দেখে মনের দুঃখে সে দূর থেকে মাকে বলল, 'মা তুই যে বলেছিলি যে আমার গাইয়ের প্রথম দুধ তোকে দিতে। কিন্তু সেবাইত আমি মুসলমান বলে দুধ নিতে অস্বীকার করল। আমার দুধ যখন সেবাইত নিতে অস্বীকার করল তখন এই দুধ আর আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। এ দুধ আমি এই বটগাছের নীচে ফেলে দিলাম'। তারপর সেবাইত পুজো করতে গিয়ে দেখে যে মার মুখের ওপর যেন কি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন যে তা জল নয়, দুধ মার ঠিক মাথার ওপর যে একটি বটগাছের 'ব' নেমেছে সেই 'ব' বেয়ে মার মুখে সেই দুধ পড়ছে। ওখানে দুধ কিভাবে এল এটি লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখলেন যে প্রধান যে বটগাছ যে গাছের গোড়ায় মুসলিম ভদ্রলোক দুধ ফেলেছিল, সেখান থেকে সরু সুতোর মত হয়ে গাছের ডালবেয়ে 'ব' দিয়ে বেয়ে যেখানে 'মা' রয়েছেন সেখানে টোপ টোপ হয়ে মুখে পড়ছে। এই ঘটনা দেখেতো সেবাইত হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তখন তিনি বুঝলেন যে সে মুসলমান বলে তাকে অস্বীকার করা তার উচিত হয়নি, মা মুসলমানদেরও পুজো চান। তখন সেবাইত সেই মুসলমান ভদ্রলোককে ডেকে তার দুধ গ্রহণ করে মাকে নিবেদন করেন। এবং তখন থেকে এখানে আগে মুসলমানদেরই দুধ বা ফল-মূল গ্রহণ করা হয়, তারপর হিন্দুদের পুজো।

শাঁখারীর কাছ থেকে শাঁখা পরে জলের মধ্যে শাঁখা পরা হাত বাড়িয়ে তা দেখানো এবং শাঁখারীর শাঁখার দাম দেওয়ার জন্য পিতাকে বলার কথা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী চলে আসছে, এখানেও সেইরূপ একটি কিংবদন্তী উল্লিখিত হয়েছে।

ক-১ ব্রহ্মাপুজোর উৎপত্তির ইতিহাস :

আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে চাঁদাবাদ গ্রামের ভক্ত মানুষেরা পুণ্য-তোয়া ভাগীরথীর তীরে কলুষনাশিনী জাহ্নবীর পুজোয় নিমগ্ন ছিলেন। এই সময় তখন তাদের বাড়ী-ঘরগুলো খড়ের ছিল। সেইসময় লঙ্কেশ্বর মণ্ডলের খড়ের চালের ছাউনিতে যে কোন কারণেই আগুন ধরে গেল। বাড়ীগুলো ছিল লাগালাগি, তাই একটি বাড়ী থেকে দ্রুত আগুন অন্যান্য বাড়ীতে ছড়িয়ে গেল। ফলে সমস্ত বাড়ীই আগুন লেগে পুড়ে গেল। সমস্ত গ্রাম এইভাবে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। তখন ছিল না কোন পাকা দালানবাড়ী তাই রেহাই পেল না কোন ঘর। পরিধানের বস্ত্র ছাড়া কিছুই ছিল না। বিষাদের ছায়া গ্রাস করে ফেলল সমস্ত গ্রামকে। সবাই প্রার্থনা জানিয়েছিল সেদিন তাদের পরিত্রাণের জন্য। বোধকরি করুন আর্তনাদ পেঁছেছিল ভগবানের কাছে। তাই উৎসব মণ্ডপ নামে গ্রামের এক ব্যক্তি স্বপ্ন পেলেন যে 'সৃষ্টিকর্তা' ব্রহ্মা ও তাঁর ভার্যা মহাশক্তি স্বাহাদেবী বিষ্ণু ও মহেশ্বর দুজনের সঙ্গে আলাপনে রত'—এই আদলে পুজোর নির্দেশ পেলেন। এই পুজো করলে গ্রামে শান্তি ফিরে আসবে। আগুন থেকে রেহাই পাবে গ্রামের লোক। এই স্বপ্ন পেয়ে সে গ্রামের অন্যান্য লোককে জানাল তার স্বপ্নের কথা। তারা সবাই সম্মত হল এই পুজো করার জন্য। গ্রামে বয়ে গেল আনন্দের জোয়ার সেই থেকে প্রতিষ্ঠিত হলেন জাহ্নবীদেবীর পরিবর্তে লোকপিতা শ্রীশ্রীব্রহ্মা। বর্তমানে প্রতিবছর মূর্তি গড়িয়ে পুজো হয়। এবং তিন-চারদিন এই উপলক্ষ্যে গানও হয়। বর্তমানে গ্রামের মধ্যে একটিই মণ্ডপ। এই মণ্ডপেই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিশেষ কোন দেবতার পুজোর সূচনা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী রচিত হয়, এটি তারই একটি নিদর্শন।

অধ্যায়/পাঁচ

মুসলমান সমাজের বিয়ের গান : সঙ্গীতের সুরে মাতে বিবাহ-উৎসব

মুসলিম সমাজে পাত্র এবং পাত্রী বিয়ের উপযুক্ত হলে ঘটক এখানে মধ্যস্থতার ভূমিকা অবলম্বন করেন। এর পর ঘটক ছেলে পক্ষকে গোপনে মেয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। অথবা মেয়ে পক্ষকে গোপনে ছেলে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। পাত্রী এবং উভয় পক্ষের লোকজন বিয়ে দেওয়ার জন্য মনস্থ করলে সদরে দিন ধার্য করে। ঘটক ছেলের পক্ষের লোক যেমন দুলাভাই, নানা, দাদা, ছোটভাই ইত্যাদি নিয়ে মেয়ের বাড়ীতে যায়। এবার ছেলের পক্ষের লোকজনকে হাত, পা, ধোবার জন্য জল, গামছা ইত্যাদি দেওয়া হয়। এর পরই সরবৎ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরই নাস্তা দেওয়া হয়। ঘটক বলেন, তোমাদের মেয়েকে দেখাও। উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে মেয়ে ঘোমটা পরা অবস্থায় ছেলের লোকজনদের সামনে হাজির হয় এবং আসন গ্রহণ করে। এর পর ঘটক ছেলের পক্ষের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। এর পর নানা দাদা, দুলাভাই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার নাম কি? তুমি কোন ক্লাসে পড়? তোমার আব্বার নাম কি? তোমার দাদার নাম কি? তোমার নানার নাম কি? তুমি হাতের কাজ জান কি? রান্না করতে জান? আবার কোন বই থেকে কিছু হয়ত লিখতে দেওয়া হয়। অনেক সময় আবার পড়তেও বলা হয়। নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখতে বলা হয়। কৌতূহলোদ্দীপক কিছু প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয়। রান্না-বান্না সম্পর্কিত বা শাস্ত্র-সম্মত কিছু প্রশ্নও করা হয়। মেয়ের হাতে ছেলের পক্ষ থেকে কিছু উপহার দেওয়া হয়। যেমন টাকা, গয়না, ঘড়ি, আঙটি, হার, হাতের বালা ইত্যাদি। তারপর মেয়ের গুণাগুণ বিচার করে ছেলের পক্ষের লোক মেয়েকে পছন্দ করলে ছেলের বাড়ী যাবার জন্য দিন ধার্য করে দেয়। এর পরই ভূরিভোজে আপ্যায়ন।

এইবার ছেলে দেখার পালা। যথাসময়ে ঘটক মেয়ে পক্ষের লোকজন

যেমন—মেয়ের দোলাভাই, নানা, দাদা, ছোটভাই ইত্যাদি নিয়ে ছেলের বাড়ীতে যায়। এইবার মেয়ের পক্ষের লোকজনকে হাত পা ধোয়ার জন্য জল, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি দেওয়া হয়। তার পর নাস্তা নেওয়া হয়। ঘটক বলেন, তোমাদের ছেলেকে দেখাও। উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে ছেলে সালাম জানিয়ে মেয়ের লোকজনদের সামনে উপস্থিত হয়। ঘটকের নির্দেশে মেয়ে পক্ষের লোকজনরা ছেলেকে নানা প্রশ্ন—যেমন নাম, ধাম, লেখাপড়া, গোত্র, কর্মজীবন, রাজনীতি ধর্মনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করে। তার আদর্শ, নৈতিকতা, জীবনপথ ইত্যাদিও যাচাই করে নেওয়া হয়। এর পর মেয়ের পক্ষ থেকে ছেলেকে উপহার যেমন—হার, আঙটি, ঘড়ি, বই, কলম ইত্যাদি দেওয়া হয়। ছেলে পছন্দ হলে ঘটা করে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এর পর ছেলে তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেয়ের বাড়ী যায় ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে উভয়ে দেখার জন্য। এই দিন বিয়ের দিন ধার্য হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেটি হল পণ প্রথা। প্রবাদে আছে—দেখাদেখি চাষ, পাশাপাশি বাস। হিন্দুধর্মের পণ-প্রথার প্রভাব মুসলমান সমাজেও পড়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেরা মেয়ের বাপের কাছে নগদটাকা, আসবাবপত্র, গহনা সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি দাবী করছে। মেয়ের বাপ দিতে অপারগ হলে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। বিয়ে হলেও পণ ও যৌতুক ইত্যাদি দিতে না পারলে মেয়ের উপরে অনাচার, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি করা হচ্ছে।

বিয়ের দিন ধার্য হবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আসবাবপত্র, ভোজনের জিনিষপত্র ইত্যাদি সংগ্রহে উভয়পক্ষ মেতে ওঠে। মেয়ে পক্ষ ও ছেলে পক্ষের লোকেবাও বাদ যায় না, তারাও এক একটা উপহার সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। মেয়ে পক্ষের এবং ছেলে পক্ষের আত্মীয়-স্বজনেরা উভয়ের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করে। দূরের আত্মীয়রা ৭—১০ দিন আগে থেকেই উভয়ের বাড়ীতে জড়ো হয়। তিন দিন অথবা ৫ দিনের লগ্ন বিয়ে হওয়ার আগেই নির্দিষ্ট করা হয়। লগ্নের প্রথম দিন ভোরে ছেলের পক্ষ এবং মেয়ের পক্ষ সকাল থেকেই কতকগুলো আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালন করে থাকে এবং বিকালের অনুষ্ঠান খুব জোরালো হয়। মেয়েদের অংশগ্রহণটা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। সব বয়সের মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। এখানে এয়ো হয় ছেলে বা মেয়ের পক্ষের দাদি, ভাবী, নানি ইত্যাদি সম্পর্কের সধবা মেয়েরা। এয়োরা বিকালের দিকে আতপ চালের ক্ষীর তৈরী করে। এয়োরা বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়। এয়োরা মাথায় তেল, পায়ে আলতা, মাথার সিঁথিতে আফসান (সোনালী রঙের গুঁড়ো) দেয়। এর পর এয়োরা

ছেলেকে ঘর থেকে কোলে করে উঠানের মাঝে চৌকিতে বসায়। ছেলেকে সুগন্ধি সাবান দিয়ে স্নান করানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বরণ ডালা সাজিয়ে ভিজে গায়ে বরণ করা হয়। এই সময় বিধবারাও বাদ যায় না। তারাও যেমন খুশি তেমন সেজে নাচ-গান কৌতুক অভিনয় করতে থাকে। এর পর মেয়েকে ভিজে কাপড়ে বা ভিজে গায়ে একটা টুলের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয় মেয়ে ছেলে উভয়কে তাদের নিজস্ব পিত্রালয়ে। মেয়ে অথবা ছেলের মাথার উপর হাত রেখে বিভিন্ন জল, আলোচাল, খেঁজুর, গুড়. মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি উৎসব মুখী মহিলাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই খাবার নিয়ে কাড়াকাড়িও হয় — ছোট ছোট বাচ্চারা মাথার উপর হাতে থালা বসায় উদ্দেশ্য চাল, গুড় মিষ্টান্ন দ্রব্য খাওয়া।আবার অনেক সময় দেখা যায় কাটাই করে আলোচাল, মিষ্টি, গুড় নিয়ে আসা হল। এই গুলো হাতে দেবার আগেই কিন্তু হুড়োহুড়ি করে ফেলে দেবার চেষ্টা করা হয়। এইবার মেয়ে অথবা ছেলেকে এয়োরা বরণ করে বিভিন্ন ছড়াছন্দের মাধ্যমে। এইবার ছেলেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর শুকনো কাপড় সে নিজেই পরে নেয়। মেয়ের বাড়ীতে ঠিক একই রকম অনুষ্ঠান হয়। মেয়েকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর নতুন কাপড় পরানো হয়। এর পর ছেলেকে অথবা মেয়েকে ক্ষীর, মিষ্টি মুখে দেয়! সঙ্গে সঙ্গে নানা হাসি মস্করা চলতে থাকে। কোন কোন অঞ্চলে তিন দিন খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। লগনের দুদিন আর বিয়ের দিন অথবা বিয়ের পরেরদিন। আত্মীয়স্বজনেরা টাকা পয়সা গহনা ইত্যাদি দিতে থাকে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে অল্প পরিমাণে মিষ্টান্ন দিয়েই জনসাধারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে সন্তুষ্ট করা হয়। পান, সুপারিও দেওয়া হয়। এই তিনদিন লগ্ন ধরার সময় দশবারো বছরের বালক এবং বয়স্ক লোকেরাও থেমে থাকে না। এয়োদের রান্না করা ক্ষীর এরা চুরি করার জন্য ফাঁক ফোকর খোঁজে। অনেক সময় এয়োরা থালা গামলা অথবা হাঁড়ীতে করে ক্ষীর বাড়ে। এই বাড়া ক্ষীরগুলো পিছনের দিকে রেখে দিচ্ছে এই সময় দশ-বারো বছরের ছেলে অথবা বয়স্ক পুরুষ লোকেরা এই ক্ষীর তুলো নিয়ে দৌড়ে পালায়। তখন এয়োরা এই কাণ্ড দেখে অনেক সময় গালি-গালাজ করে আবার করেও না। তবে কি এই সময় লোকজনের ভিড়ে বাড়ী ঠাসা থাকে। একটা থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় বয়স্ক মহিলারা বলে 'ঢেমনাদের ক্ষীর খেয়ে আর হয়না, মরগে যা ক্ষীর খেয়ে, তোর বাপ কোনদিন খায়নি বেশি করে খেগে যা' ইত্যাদি। শেষ লগ্নের দিন উৎসব খুব জোরালো হয়। পিঁড়িতে যাওয়ার আগে ছেলে অথবা মেয়ের হাতে, মাজায়, জোরা দেওয়া হয়। কার দিয়ে মেয়ের মাথায় বেউনী গাঁথা হয়। কোনো কোনে দেশে গন্ধ ছোঁয়ানো বলা হয়। দ্বিতীয় দিনের লগ্নের উৎসব

সব কিছুর মায়া ছাড়িয়ে যায়। সব বয়সের মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা রঙ খেলা করে এমনকি কাদা, কালি ইত্যাদি মাখামাখি হয়। কাদা মাখা মাখিকে কাদাক্ষীর বলা হয়ে থাকে। ছেলের পক্ষ থেকে ছেলের দুলাভাই অথবা ঐ ধরনের সম্পর্কের কোন লোক মেয়ের বাড়ীতে কতকগুলি জিনিসপত্র নিয়ে যায় যেমন মাছ (শোলমাছ), মিষ্টি, কাপড়, ডেংরা, আফসান নথ, হলুদে ছেলের গায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর সঙ্গে সাবান, লাল সুতোও থাকে। মেয়ের পক্ষের লোকেরাও আদর আপ্যায়নের সঙ্গে বরের বোনাইকে গ্রহণ করে। এটা এক ধরনের বিয়ের রাই পেঁছে দেবার পূর্ব প্রস্তুতি।

রাত পোহালেই বিয়ের দিন। সকাল থেকে তোড়জোড় চলে উভয় পক্ষের বাড়ীতে। ছেলে এই দিন সকালে চুল, দাড়ি, কাটিয়ে আসে নাপিত বাড়ী থেকে। ছেলের পক্ষের এয়োরা ছেলেকে, মেয়ের পক্ষের এয়োরা মেয়েকে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে। ছেলে বরযাত্রী সমেত মেয়ের বাড়ী অর্থাৎ কনের বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। ছেলের বাড়ীতেও বরযাত্রীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে নিয়ে কনের বাড়ীতে যাত্রা করা হয়। আগের দিনে পালকি, গরুরগাড়ী, ঘোড়াগাড়ী ইত্যাদি চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ার রীতিছিল। এখন বাস, ট্যাক্সি, লরী, ট্রেন ইত্যাদিতে চড়ে বিয়ে করতে যাওয়া হয়। এইবার বরযাত্রীসহ মেয়ের বাড়ী প্রবেশ করার মুহূর্তেই মেয়ের বাড়ীর লোকজনেরা গেটে এসে জটলা করে এবং বরসহ বরযাত্রীদের আপ্যায়ন শুরু হয়ে যায়। মেয়ের পক্ষ থেকে বাদশার নজরানা ধরা হয়। বাদশাহ তাদের উপযুক্ত বক্‌শিস দিয়ে বরযাত্রী সমেত ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে বাদশাহ ছালাম দিয়ে আসন গ্রহণ করেন। এর পর বর এবং বরযাত্রীদের হাত, পা ধোবার জন্য জল দেওয়া হয়. মোছার জন্য গামছা বা তোয়ালে দেওয়া হয়। তার পর বর অথবা বরযাত্রীদের চা, সরবৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর পর একটু বিশ্রাম নেওয়া হয়। বিশ্রামের পর পানি খাবারের বা নাস্তার ব্যবস্থা হয়। আবার একটু বিশ্রাম। এর পর বিয়ের আয়োজন শুরু হয়ে যায়, মসজিদের ইমাম অথবা কোনো উপযুক্ত আলেম বিয়ে পড়ানোর কাজ পরিচালনা করেন। মেয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক উকিল সাজে। ইমাম সাহেবের নির্দেশে ছেলের অনুমতি নিয়ে এবং তার পক্ষ থেকে কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে মেয়ের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। যাবার সময় মেয়ে যে ঘরে থাকে সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় মেয়ের পক্ষের এয়োরা, এই সময় এয়োরা কিছু টাকা না দিলে দরজা খুলতে রাজি হয়না। ছেলের পক্ষ থেকে উপযুক্ত নজরানা এয়োদের দেওয়ার পর দরজা খুলে দেয়। এইবার মেয়ের পক্ষের উকিল এবং ছেলের পক্ষের সাক্ষীসহ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে হাজির

হয়। প্রস্তাবটি এই রকম—গাড়াপোতা নিবাসী মহম্মদ আলাউদ্দিন মণ্ডলের প্রথম পুত্র মহম্মদ আনোয়ার হোসেন মণ্ডলের পক্ষ থেকে জেওরবাদ ৫ হাজার ১ টাকা দেন মোহরের পরিবর্তে তোমাকে সাদী করতে এসেছে তুমি রাজি আছো? মেয়ে সম্মত হলে আরো দুবার ব্যাপারটাকে পুনরাবৃত্তি করা হয়। মেয়ে তিনবারই সম্মত হলে তখন মেয়ের পক্ষের প্রধান উকিল মেয়েকে বলবে, তুমি কি আমাকে তোমার বিয়ের উকিল নিযুক্ত করলে? তখন মেয়ে বলবে, হ্যাঁ। আমি তোমাকে আমার বিয়ের উকিল নিযুক্ত করলাম। এইবার মেয়ের দ্বারা নিযুক্ত উকিল বাদশার দরবারে গিয়ে বলবে, মেয়ে এই বিয়ে প্রস্তাবে সম্মত আছে এবং আমাকে তার বিয়ের উকিল নিযুক্ত করেছে। তখন ইমাম সাহেব বা মৌলানা সাহেব ছেলের পক্ষের লোকের মুখে ওই কথার সত্যতা যাচাই করে নেন। এইবার বিয়ে পড়ানোর পালা। মেয়ের পক্ষের প্রধান উকিল হাঁটু গেড়ে বাদশার সামনে বসে এবং কন্যাকে বাদশার হাতে সমর্পণ করে। বাদশা এই সমর্পণ কবুল করে নেন। তার পর কোরাণ শরীফের আয়াত খুৎবা পাঠ, মোনাজাত ইত্যাদি সহকারে ইমাম সাহেব বিয়ে পড়ানোর কাজ সম্পন্ন করেন। কোন কোন অঞ্চলে রাত্রিতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন হয়। এর পর শুরু হয় খাবারের ঘটা। তৈরী হয় নানা প্রকারের খাবার যেমন—ভাত, মাছ, মাংস, আলুরদম, ডাল, মিষ্টি, আইসক্রীম; খাবার শেষে সবাইকে পান দেওয়া হয়। এরপর চলে বিশ্রামের পালা। মেয়ের পক্ষের লোকজনদের সাথে ছেলের পক্ষের লোকজনদের চলে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা। সন্ধ্যার একটু আগেই বরকে মেয়ের বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। বরের সঙ্গে থাকে বোনাই বা ঐ সম্পর্কিত কোন লোক। এই সময় মেয়ে এবং ছেলেকে পাশাপাশি বসানো হয়। এখানে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করি সেটি হ'ল—'মেয়ের ছোট বোন, নানি, দাদি এরা বরের পাঞ্জাবীর সঙ্গে মেয়ের বা কনের শাড়ীর আঁচল বেঁধে দেয় আবার কখনো সেফটিপিন দিয়ে পাঞ্জাবীর সঙ্গে বসে থাকা কাঁথার সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দেয়। এই হাল্কা হাসি-তামাসার ফাঁকে ফাঁকে চলে বরের মিষ্টি মুখ করানোর পালা। পাড়ার সমস্ত মেয়েরা এক এক জন করে বরকে মিষ্টি মুখ করান। এই সময় যে যেমন পারে ছেলেকে উপহার দেন। বরকে এই সময় টুপি মাথায় দিয়ে বসতে হয়। এই টুপি মেয়ের পক্ষের লোকেরা থাবা মেরে তুলে নেয়। এই টুপিটি ফেরৎ নিতে হলে বরকে কিছু টাকা মেয়ের পক্ষের লোকেদের দিতে হয়। এর পর শেষ হয় বর দেখার পালা। এর পর শুরু হয় মেয়ের শ্বশুর বাড়ীর যাবার পালা। মেয়েকে সাজিয়ে দেবার পালা শেষ হয়। এইবার গাড়ীতে ওঠার পালা।

এরপর মেয়ের সবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা শুরু হয়।

প্রথমে আম্মাজানের কাছ থেকে বিদায় নেয়। এই সময় আম্মাজান মেয়েকে আশীর্বাদ করে থাকেন। তার পর আব্বাজানের কাছ থেকে বিদায় নেয়। আব্বাজানও মেয়েকে আশীর্বাদ করেন। এর পর মেয়ে নানি, দাদি, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। এর পর মেয়ের মা, আত্মীয় স্বজনেরা কান্নায় ফেটে পড়ে। মেয়েদের আত্মীয় স্বজনেরা মেয়েকে বরের গাড়ীতে উঠিয়ে দেয়। গাড়ীর ভেতরে মেয়ে এবং ছেলেকে পাশাপাশি উঠিয়ে দেয়। এই গাড়ীতে উঠে নানা রকম হাসি, তামাসা চলে। গাড়ী এসে পেঁছায় ছেলের বাড়ীতে। ছেলের বাড়ীতে বাদশাহ এবং বেগমকে নিয়ে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মেয়ে এবং ছেলেকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়। দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয় ঘরের ভেতর। এই সময় মেয়ে এবং ছেলে নামাজের পাটিতে বসে খোদা—তায়াল্লার কাছে কামনা করে-তাদের জীবন যেন সুখী হয়। মাটিতে নামাজ পড়ার মত করে কামনা করে। এর পর ছেলের বাড়ীর পাড়া প্রতিবেশীরা মেয়ের মুখ দেখার জন্য ছুটে আসে। বউ দেখা শেষ হলে চলে খাওয়া দাওয়া এবং শেষে সবাই ঘুমায়। পরদিনই বৌভাত হয়। এই বৌভাতে নিমন্ত্রণ থাকে মেয়ের বাড়ীর লোকেদের। এই বৌভাতে মেয়ের বাড়ীর লোকেদের আগমন হয়। বউকে একটি রাজ-সিংহাসনে বসানো হয়। ছেলের আত্মীয়-স্বজনেরা মেয়ের মুখ দেখে এবং টাকা-পয়সা দেয়। মেয়ের মুখ দেখে, নাম কুলপরিচয়, বাড়ী কোথায়, গ্রামের নাম কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে থাকে। তারপর সমাপ্ত হয় বৌভাতের অনুষ্ঠান।

বাংলার হিন্দুদের বিবাহে অনুসৃত বিবাহাচারগুলি বৈদিক ও লৌকিক দুটি বিভাগে বিভক্ত। লৌকিক বিবাহাচার সঙ্গীতসহ অনসৃত হয়। লৌকিক বিবাহাচার স্ত্রী আর নামেই সমধিক পরিচিত। বিশেষজ্ঞের মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়, মেয়েলী গীতই স্ত্রী-আচারের মন্ত্রস্বরূপ। বস্তুত-পক্ষে বিবাহের সূচনা থেকে একেবারে শেষপর্যন্ত স্ত্রী আচার অনুসৃত হয় আর সে সবের অনিবার্য অঙ্গস্বরূপ বিষয়ানুরূপ সঙ্গীত গীত হয়। মুসলমান সমাজেও বিবাহ গীতের চল খুবই। এরই প্রমাণ মাড়োয়ার গীত, ফোরোল ডুবার গীত, উমালী বাড়ার গীত, মেহেন্দী তোলার গীত, হাংগোর ধরার গীতগুলি। হলদি কোটা, কনে বিদায়, বর কনের কথোপকথন, শানগর বাসর সঙ্গীত, বরের ক্ষৌরকর্মের সময় গীত সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ক গান মুসলিম বিবাহের অনিবার্য অঙ্গস্বরূপ। আমরা প্রথমে কিছু বিবাহ গীতির উল্লেখ করছি পরে সাধারণ ভাবে মুসলিম বিয়ের গান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আধুনিক সভ্যতার প্রভাব অন্য ধর্মের উপর পড়লেও মুসলিম সমাজের উপরে এর প্রভাব খুব কমই পড়েছে। আধুনিকতার প্রভাব পড়াসত্ত্বেও

মুসলমান সমাজে বিবাহের রীতি তার পুরাতন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছে।

মুসলিম বিবাহের গান :

(১)

ঐ না হলুদ ছিলিরে তুই,
বেনের দোকানে।
আজকে হলুদ আলিরে কমলার বরণে।
আজকে ছিলিরে ডোর বেনের দোকানে,
আজগো আলিরে ডোরা কমলার মাজাইরে।
আজগে ছিলিরে ফিতা যুগিরও দোকানে,
আজকে এলিরে ফিতা কমলার চুলেরে।
আজগে রং ছিলিরে বেনের দোকানে,
আজকে আলিরে রং কমলার গায়েতে।
আজগে ছিলিরে চুড়ি বেনেরও দোকানে,
আজকে এলিরে চুড়ি কমলার হাতেতে।
আজগে ছিলিরে আফসান বেনেরও দোকানে,
আজকে এলিরে আফসান কমলার সিঁথেই।
আজগে ছিলিরে শাড়ী ঐ দোকানে,
আজকে শাড়ী আলিরে কমলার হাতেতে।
আজগে ছিলিরে ব্লাউজ ঐ না দোকানে,
আজকে এলিরে ব্লাউজ কমলার গায়েতে।
আজগে ছিলিরে সায়া ঐ না দোকানে,
আজকে আলিরে সায়া কমলার পরণে।
আজগে ছিলিরে সাবান ঐ না মুদির দোকানে,
আজকে এলিরে সাবান কমলার গায়েতে।
আজগে ছিলিরে চিরুনি ঐ না বেনের দোকানে,
আজকে ছিলিরে চিরুনি ঐ না কমলার গায়েতে।
আজগে ছিলিরে আলতা ঐ না বেনের দোকানে,
আজকে এলিরে আলতা কমলার পায়েতে।
আজগে ছিলিরে মেনদি ঐ না গাছের ডালেতে
আজকে মেনদি আসলি তুই কমলার হাতেতে।
আজগে ছিলিরে গহনা ঐ না স্বর্ণকারের দোকানে,

আজকে এনিয়ে গহনা কমলার গলায়, মাজায় ।
হাতে কানে, কপালে পায়েতে,
এর পর কমলাকে বিয়ে করে আফজেল বাড়ী যায় ।
বাসর ঘরে কমলাকে রেখে আফজেল কারাগারে যায় ।
কারাগার ভেঙে কমলার স্বামী কমলার কাছে আসে,
তাদের মিলনে নালচাঁদ হয় ।
ননদ তখন বলে ভাবী তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন ?
আমার পেটে তোমার ভাইপো, নালচাঁদ আছে
সেই কথা শুনে ননদ মার কাছে বলে
সেই কথা শুনে শাশুড়ী ঝাঁটা দিয়ে মারে
মেরোনা মেরোনা মা জান
আপনার ছেলে জেলভেঙে রাতের বেলায়
চুরি করে আমার ঘরেতে আসে ।

(২)

আমার পাতা চিকন চিকন
কাঁঠালের পাতার শিরকালো
বেছে বেছে বিয়ে করবো
তেড়া কাটা চুলকালো ।

(৩)

ছাইরাখাতুন সইলে বেগুন
তেঁতুল তলায় ঘর ।
ছাইরার বিয়ে দেব,
কোলকাতায় যার ঘর ।
কোলকাতার বরেরা সব ফর্সা হয় ।
গয়না দিয়ে ভরিয়ে দেবো,
ছাইরার দেহখানি ।
বকুল ফুলের মালা গেঁথে,
পরাবো তার গলে ।
বর আসবে যক্ষনি,
তুলে দিব তক্ষনি ।
সবাইকে পর করে,
যাবে সে কোলকাতায় ।

(৪)

বই হাতে করে রবিলা
হাই ইস্কুলে যায়।
পথের পানে যেতে যেতে,
অনেক কিছু দ্যাখে,
মন ভরে না কোন কিছুতে।
যৌবন জ্বালাই মরে রবিলা,
মনের কথা সে বলতে পারে না।
দাদি বলে ওলো রবিলা,
কি হয়েছে বল মোরে।
রবিলা বলে যৌবনের জ্বালা,
বলবো মুই কাহারে।
সব কিছু জানার পর,
বিয়ের আয়োজন হয়।
সখীগণে সাজাইয়ে তারে
বিয়ের আসরেতে নেই।
বিয়ের পর আম্মাজানের কাছে
দোয়া চেতে যায়
চোখের জল বাগ মানেনা,
রবিলা কেঁদে আকুল হয়ে যায়।
হৃদয় ফেটে যায় আম্মাজানের,
কথা কইতে পারে না।
আব্বাজান এসে বলে মা তোর
কোন ভয় নেই।
আগামী দিন সবাই যাবে তোর বাড়ীতে।

(৫)

ঐ আসছে মোর সোনার ভাগ্নে
গামছা গায় দিয়েরে,
পাগল করলো ভাগ্নেরে।
তোমার ত মামার গামছা
তোমার ঘাড়ে দেখিরে।
বলবেন না বলবেন না মামি

একই দোকানের গামছা
কিনেছিলাম মামা আর আমি
তোমার ও মামার জামা,
তোমার গায়ে দেখিরে
পাগল করলো ভাগ্নেরে।
একই দোকানের জামা,
কিনেছিলাম মামা আর আমি।
তোমার ও মামার লুঙি
তোমার পরনে দেখিরে,
পাগল করলো ভাগ্নেরে।
ও কথা বলবেন না বলবেন না মামি
একই দোকানের লুঙি
কিনেছিলাম মামা আর আমিতে
তোমারত হাতে তোমার,
মামার ঘড়ি দেখিরে।
পাগল করলো ভাগ্নেরে।
একই দোকানের ঘড়ি
কিনেছিলাম মামা আর আমি।
তোমার ও মামার রূপ
তোমার কেন দেখিগো
পাগল করলো ভাগ্নেরে
ও কথা বলবেন না ও কথা বলবেন না
মামি আমি প্রাণে বাঁচি না।
তুমি যদি বিয়ে না করো ভাগ্নে
বিষ খেয়ে মরবো গো
আনোয়ার তখন দিশে না পেয়ে
মামীর সঙ্গে বিয়ে করলো গো
পাগল করলো ভাগ্নেরে।

(৬)

ও পাড়াতে দেখে এলাম দুই সতীনের মিলন গো,
বিয়ে যদি না করো স্বামী তোমার ঘরে বিষ খেয়ে মরবো গো।
একটা স্বামী দুটো করিয়া তেবু সতীন আনবো গো,
মালেকা সুন্দরী কন্যাগো।

একটা ব্লাউজ দুটো করবো তেবু সতীন আনবো গো,

মালেকা সুন্দরী কন্যাগো।

একটা সাবান দুটো করবো তেবু সতীন ঘরে আনবো গো,

একা তেঁলের শিশি দুটো করবো তেবু সতীন ঘরে আনবো গো।

একটা শাড়ী দুটো করিবো তেবু সতীন ঘরে আনবো গো,

ও পাড়াতে দেখে এলাম দুই সতীনের মিলন গো।

মালেকা সুন্দরী কন্যাগো।

একটা ফিতে কেটে দুটো করবো তেবু সতীন ঘরে আনবো গো।

ও পাড়াতে দেখে এলাম দুই সতীনের মিলন গো।

মালেকা সুন্দরী কন্যাগো।

সেই কথা শুনে মালেকার স্বামী সাদি করতে গেল গো।

বিয়ে করে আনলো মোমেনা বিবিকে।

স্বামী বলে ওঠো ওঠো মালেকা বিবি তোমার সতীন এনেছি গো,

স্বামী তখন মোমেনা খাতুনের নিয়ে বাস ঘরে গেল গো।

বাসর ঘরে গিয়ে মোমেনা ঘরের দরজা দেলে গো।

মালেকা বিবি তখন বলে দরজা খোলো স্বামী আমি ঘরে যাবো গো।

স্বামী বলে দরজা খোলবোনা মোমেনা আমার পাশে গো,

দরজা খোল খোল গো আমার যদি জায়গা না হয়,

থাকবো তোমার পার পাশে গো।

মালেকা বিবি তোমার জায়গা হবে না গো

মোমেনা বিবি আছে আমার পা পোতেনে গো।

পা পোতেনের গোড়ায় যদি না হয়,

তাহলে থাকবো তোমার মাথার পাশে গো।

মালেকা বিবি বলে হাতে করে সতীন,

এনে আমার গলায় দাড়ি হলো গো।

(৭)

ও ময়না রে,

এতদিনে ছিলেরে ময়না,

মাতা পিতার ঘরে।

আজ হইতে যাবারে ময়না

পরদেশিয়ার ঘরে।

ঢাক বাজে আর ঢোলক বাজে,

বাজে বাঁশি কাঁশি।

আজ হইতে লয়ে যাবেরে ময়না,
ঐ জনক রাজার ঘরে।
কি রাজন রে,
বাড়ী ও পূর্ব পাশে,
কিসের জয় জয় শুনি।
সুন্দর ময়নারে নিবে,
আসছে রাজা রাজপথ ঘিরে।
শঙ্খ বাজা উলু দেরে,
দে জয়ের ধ্বনি,
বরণ কুলো বরণ ডালা
আনরে ফুলের মালা।
ডাক দে ময়নার মারে,
জামাই বরণ করবে।
কাঁদিসনেরে ময়না,
ঘরের কোণে বসে।
এতদিনে ছিলিরে ময়না,
ভাই ধনেরও কোলে।
আজ থেকে যাবারে ময়না,
ঐ না রাজার ঘরে।

(৮)

ওগো চিন্তামণি ওগো রজকিনী,
ঘুরিয়া ফিরিয়া কোলে আয়রে নীলমণি,
তোর পিতা তোরে না সাজায়াছে কত গয়না দিয়ে,
গয়না পরে ময়না হয়ে যাবিরে ওড়িয়া।
ওগো চিন্তামণি ওগো রজকিনী,
ঘুরিয়া ফিরিয়া কোলে আয়রে নীলমণি।
তুইতো পরেরও রমণী ছিলি ছিলি আমার ঘরে।
আজ হইতে যাবিরে চিন্তামণি,
ঐ না রঘু বংশের রাজা দশরথের ঘরে।
পেয়ে দশরথ বলে ওগো মা নীলমণি,
আমার ঘরে লক্ষ্মী জননী।
ওগো চিন্তামণি ওগো রজকিনী,
ঘুরিয়া ফিরিয়া আয়রে নীলমণি।

(৯)

কোথায় চলেছো রাম রে,
রাম রাজা চলেছে বিয়া করতে,
হাতে ফুলের মালা, মাথায় ময়ূরের মুকুট।
সঙ্গে কত বন্ধু-বান্ধব ছিল বাজনদার, বাঁশি কাঁশি।
সেই না বাঁশির বাজনায় সুন্দর রো বালি
কান্দে ঘরের কোণে বসে।
আজ হইতে মা ধনেরে
দিলি পর করে
ও কি সুন্দর রাম রে।

(১০)

রামের জোড় রাম পরে
রাধিকে যে দাঁড়াইয়া দেখে।
ও হে সুন্দর রাম রে,
রামের মাথায় ফুলের মুকুট,
কন্যার মাথায় ফুলের ঝরা,
ও হে সুন্দর রাম রে,
রামের হস্তে ময়ূরের পাখা
দুলাইয়া দুলাইয়া বাতাস করে
ও হে সুন্দর রাম রে।
সুন্দর বালি জোড় বালি পরে
রাম রাজা লো লইয়া যায় তার নিজ ঘরে।
ও হে সুন্দর রাম রে।

(১১)

কোথায় চলেছো রাজা গো,
হস্তে মোহন বাঁশি।
ও তোমার বাঁশির সুরে,
এ প্রাণ আমার রই না ঘরে।
আমার মনে বলে তোমাকে আমি দেখে আসি,
তোমারো লাগিয়া পাগলিনী সাজিয়া,
আমি বেড়ায় যে ঘুরিয়া।
ও সুন্দর রাজা গো তোমার হাতে মোহন বাঁশি

কদম ডালে থাকো তুমি,
কত হর গোপীর মন।
আমি দিলাম মন প্রাণ,
তবু পালাম না তোমার ঐ চরণ।
ও সুন্দর রাজা গো তোমার হাতে মোহন বাঁশি,
তোমার বাঁশির সুরে এ প্রাণ রইনা ঘরে,
আমার মনে বলে তোমাকে আমি দেখে আসি।

(১২)

নীল যমুনায় ভরা বাদলে,
মিলন বাঁশি বলো কে বাজালে।
হাতের বালা বন্ধক থুয়ে আমি,
শুনবো কালার বাঁশির গান।
কালা চান বাঁশি বাজায়ও না আর,
আমি যখন রানতে বসি,
কালা তখন বাজায় বাঁশি।
কালা চান বাঁশি বাজায়ও না আর।
আমার মন প্রাণো উদাসী
পথ দিয়ে কে বাজাইয়া বাঁশি,
ও তোর বাঁশির সুরে,
এ প্রাণ আমার রইনা ঘরে।
আমার মন বলে আমি দেখে আসি,
তোরা সুন্দরো বালিরি কি দিয়ে সাজাবো।
ওহে সুন্দর বালিরে।
বাদে রো দোকানের সিঁদুর,
তাই এনে সাজাবো সুন্দর বালিরে।
তাতিকারো জোড় এনে সাজাবো সুন্দর বালিরে
শাখরুরো শঙ্খ এনে সাজাবো সুন্দর বালিরে
মুদিরো দোকানো থেকে আনবো
সুতো মালা আয়না চিরুণি।
আরো আনবো, আলতা,
সুনো, পাউডার, হিমানি।
আমার সঙ্গে চলোরো বালি,
আমি সব দেব তোমারে।

(১৩)

ওযে এলো রামের চরণ,
ঘরেতে কান্দে ময়না কান্দে মা বাপ ভাই বোন।
কান্দে তার জোড়ের ভাই বোন।
আজ হইতে তোরে লইয়া যাবে লো ময়না
পর দেশিয়ার ঘরেরে।
রাজা বলে ওহে সুন্দর ময়নারে
আর কেন্দ না আর কেন্দ না
চল আমার সঙ্গে।
এত বড় হইচো তুমি,
তোমার মাজা কেন খালি,
আমার সঙ্গে চলোরে ময়না,
আমি দিব মাজার শাড়ী।
তোমার সঙ্গে গেলে রাজা গো,
আমার যাবে বাবার নামটি।
অত বড় হইছোরে কন্যা,
তোমার হস্ত কেন খালি।
আমার সঙ্গে চলোরে ময়না,
আমি দিব হস্তের শঙ্খ।
তোমার সঙ্গে গেলে রাজা গো,
আমার যাবে ভাই ধনের নামটি।
কত বড় হইছোরে ময়না,
তুমি না করেছ বিয়া।
কেমন তোমার মাতাপিতা,
কেমন তোমার ভাইধন।
কেমন তোমার হিয়া,
ঐ সব কথা রেখে তুমি
আমায় কর বিয়া।

(১৪)

এসো এসো রাতের অতিথি,
এসো আমার দ্বারে।
তোমার হারানো মণি,
আমার হৃদয়ে দোলে।

ফাল্গুনে দোল পূর্ণিমায়,
তুমি দোলালে তোমার হৃদয়ের মাঝে।
পিঞ্জিরায়ো পাখির মতনরে,
তেমনি মতো আমি বেঁধে রাখবো তোমারে
তোমারো বিরহে আমার মন যে সদায় কাঁদেরে
এসো এসো রাতের অতিথি,
এসো আমার দ্বারে।
তোমার হারানো মণি যায় কাহারে।

(১৫)

মেয়ে ঃ ঐ না আমি আলো একাবাড়ী থাকি
ও আমার মাতাপিতা চাকরি করে, মহারাজের বাড়ীরে।
আমি আলো একা বাড়ী থাকি।
ও আমার যৌবন বয়সে কত আনন্দ আসে,
ও আমার প্রাণে লাগে ভয়।
কে করিবে চিরদাসী, কার বা বাড়ী যাবো।
বিনা সুতোর মালা গেঁথে পরাবো কার গলে
ও রাজার ফুলবাগানে যায়, একটু হাঁটিয়া বেড়ায়।
ফুল বাগানে ঘুরে ফিরি গাঁথি ফুলের মালা,
সে যে বিনা সুতোর মালা গেঁথে, পরাব কার গলেরে।
আমি আলো একাবাড়ী থাকি।
জল খাইতে গিয়াছিলাম, দিন ভিখারীর বাড়ী
কে যেন জল এনে দিল, মানুষ কিংবা পরী।
মন পাগল তাহার লাইগারে।
সে যে চাঁদের আলো, তার চেয়ে ভালো
আলোর মুখের হাসি।
আলো ছেড়ে, আলাম অন্ধকারে।
ও আমার মনে বলে ভুলি ভুলি, অন্তরে না ভোলেরে।
আলাম ছেড়ে আলাম অন্ধকারে,
মন পাগল তাহার লাইগারে।

(১৬)

কেন্দে আকুল হইলামরে,
বইয়া নদীরকুলে।

পার হইতে এসেছিলাম
ঐ না বৃক্ষের ধারে।
সেই বৃক্ষ দেয় মা ছায়ারে,
আমার কপাল কর্মদোষে।
আমায় কেবা পার করে,
কালো জলে কালো কুম্ভীর
উঠল বালুচরে।
সেই কুম্ভীরে ধরে খাবেরে,
আমার কপাল কর্মদোষে।
ও আমার কেবা পার করে।

(১৭)

ডালে বইসা কালোরে কোকিল,
ডাকছে কুহু কুহু।
কি গানো শুনালিরে কোকিল,
কানেতে মুখ দিয়ারে।
বনের মাঝে সুন্দর ফুলটি (মেয়ে),
দেখতে শোভা লাগে।
তাই দেখতে হলুদেরি,
আমরো ফল আনতো গো।
ক্ষমা করো মা ভবানী
মা ভবানী গো যে ফুল দেখতে হল দেরি,
তাহার সাথে আমার হইবো বিয়া।

(১৮)

শিশুকালে কষ্টপাবি,
সাগর জলে ভেসে যাবি।
নেকানেকি তোর কপালে,
মহিষ বলি, পাঁঠাবলি,
খাও মা কালী।
আজকে হবে তোমার নরবলি,
ও মোর ঘাতকরে।
দয়া করে ভিক্ষা দেনগো আমারে
ভিক্ষা যদি নাহি দেবে।
জলে ডুবে মরা ভালো

ও মোর ঘাতক
অপমানের বিচার করবেন আপনি ।
শ্যামা রূপোর তল্লাস যে
ধেয়ে ধেয়ে যায় গো ।
তোমার বিয়ের দিন গো
সাগরের সাথে শ্যামার বিয়ে হবে ।
দিন ঠিক করেছি তাই ।

(১৯)

হাত ছাড়ো হাত ছাড়ো গো মজনু
হাতে পায় মোর ব্যথা ।
তোমার সাথে প্রেম করিবো লায়লী,
এই তো মনের আশা গো ।
এই তো মনের আশা,
লায়লী দেখা দাও আমারে
তোমার সাথে বিয়া করবো
এই তো মনের আশা গো
এই তো মনের আশা ।

(২০)

ওগুণা গুণাইবে
গুণাইরে গুণাই,
তুই তো ধর্মের বোন ।
ভাই হয়ে তোর করবো নিকা
যা করে খোদাই ।
আয় আয় আয়
ও বছির বছিররে
তুই তো ধর্মের ভাই ।
ভাই হয়ে তুই করবি নিকা,
তোর লজ্জা সরম নাই ।
ও বছির পারবে না পারবে না
বছির জ্বরে বাঁচে না
বছিরের মা বলেছে বাবা যেও না, বরিশাল ।

(২১)

ও আমার ময়না,
কেন ভালো করে কথা কয় না।
ময়নার বিয়ে দেব,
রাঙা টুকটুকে বর দেখে।
আমার ময়নায় সাজিয়ে দেব,
লাখ টানার গয়না, আর ঢাকা শাড়ীতে।
পালকি করে আসবে কত বরযাত্রী
নিয়ে যাবে মোর ময়নাকে।
—পাড়া প্রতিবেশীদের
আনন্দ সোহাগ
ভরিয়ে দেবে ময়নাকে।
শ্বশুর বাড়ী গিয়ে ময়না
পরকে করবে আপন।
আর আপনাকে করবে পর,
এই তো ময়নার সখ।

(২২)

কিসের লেখা কিসের পড়াগো,
দাইমা কিছুই ভালো লাগে না।
আমার দাইমা, দাইমা গো,
যৌবন জ্বালায় জ্বলে মরিগো
ও দাইমা, সহিতে না পারি।
দাইমা দাইমা গো।
বাড়ীর ঐ না দক্ষিণ পাশে গো,
ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো
ও মোর দাইমা দাইমা গো।
শোন শোন শোন রূপবান গো,
ও রূপবান বলি যে তোমারে, গো, শোন রূপবান রূপবান গো।
শোনেন শোনেন শোনেন দাদুগো ও দাদু,
বলি যে আপনারে শোনেন দাদু দাদুগো।
বারো দিনের শিশুর সনে গো,
ও দাদু কেমনে হবে বিয়ারে, আমার দাদু দাদুগো।
শোন শোন শোন রূপবান গো

ও রূপবান বলি যে তোমারে গো, শোন রূপবান রূপবান গো।
দাদু আইছেন ঘটক হইয়াগো,
ও রূপবান কবুল করো তুমি গো রূপবান রূপবান গো।
মেরো না মেরোনা জল্লাদ মেরোনা আমার পিতারে।
কি অপরাধ করেছেন পিতা গো
ও রাজা বলে দাও আমারে গো
বলেন রাজা রাজাগো।
হাতে ধরি পায়ে পড়িগো, ও রাজা মুক্তি দেন মোর পিতারে।
শোনেন রাজা রাজা গো
আমায় আপনি প্রাণে মারেন গো।
ও রাজা মুক্তি করেন পিতারে,
শোনেন রাজা রাজাগো।
আমায় আপনি প্রাণে মারেন গো, ও রাজা মুক্তি দেন পিতারে
শোনেন রাজা রাজাগো।
বিদায় দাও বিদায় দাও পিতা গো, ও পিতা বিদায় দাও
আমারে গো।
ও পিতা পিতা গো
বিদায় দাও বিদায় দাও মাতা গো, ও মাতা বিদায় দাও
আমারে গো।
ও মাতা মাতা গো
বারো দিনের স্বামী লয়ে গো ও পিতা, চললাম শ্বশুর বাড়ী গো,
ও আমার পিতা, পিতাগো!
বাসর ঘরে যাক পতি গো, ও পতি খেলে নানা ছলে গো।
ও আমার পতি পতি গো
কে পরাইবে তৈল কাজলরে, ও আল্লা কে খাওয়াইবে দুধরে।
ও আল্লা আল্লারে।

(২৩)

স্বর্ণ থালে ফুলের মালা,
রাম জ্বালালাম চিকই কালা,
সাজাইয়া রাম কোলে তুলে লয়।
রামের মাথায় ফুলের মুকুট,
সুন্দর বালি চায়।
আবার তার নয়ন জলে,
বুক ভেসিয়ে যায়।

সবে বলে সুন্দর রামরে কি কি আনলে তুমি ?
সুন্দর বালির পরণের শাড়ী আরও পায়ের নূপুর।
হস্তে শঙ্খ গলার মালা গলেতে দোলাবো,
কেন্দ না কেন্দ না বালি তোমায় লয়ে যাবো।
আমার বাড়ীর খাট পালঙে তোমাকে বসাবো,
রামের হস্তে নতুন মালা কন্যার গলে দোলে।
ও সুন্দর বালির আর বাকী রইল কি ?
কর্ণেতে দিল দুল সিঁথিতে সিঁদুর।
সুন্দর রামরে কি দিয়ে সাজাবো।

(২৪)

এসো এসো আমারি কাছে,
তোমার হারানো মণি যায় কাহারে ?
আমার হৃদয়ে দোলায়ে দিলাম,
তোমার ঐ ফুলের মালা।
তুমি আমার জীবন জীবন,
তুমি আমার সর্বস্ব ধন।
তোমাকে নিয়ে আমি করবো সংসার সারাজীবন,
তুমি আমার সাথের সাথী।
তুমি আমার প্রাণেশ্বরী।
তোমাকে না দেখিলে আমি
জানে প্রাণে মরি,
হায়রে জানে প্রাণে মরি।

(২৫)

রামের বিয়েতে হলদে গোড়ার দাপটে,
ধুলো ওড়ে রামের গগনে রায় আমার।
ঐ যে, এল নতুন রাজা,
সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম ধরে
ও হে সুন্দর রাজা গো।
ঐ না সুন্দর রাজার সঙ্গে,
হবে নাকি আমার শুভ মিলন,
শুভদিনে শুভক্ষণে
তোমার সনে।
ঐ সুন্দর রাজার সঙ্গে
হবে নাকি আমার শুভ মিলন।

(২৬)

এত সুন্দর শ্যাপলা বালিলো,
ও তোর মাজা কেন খালি ?
আমার সঙ্গে চল শ্যাপলা
ও তোমার দিব ঢাকাই শাড়ী
ও শ্যাপলা বালিলো তোমার হস্ত কেন খালি ?
তোমার হস্তের শঙ্খ আমি
গলার মুকুট মালা।
ও হে সুন্দর শ্যাপলা বালিলো তুমি আর কেন্দ না,
ব্যাদের দোকানের সিঁদুর পরাবো,
তোমার সিঁথের শিরে।
আপন করে লয়ে যাবো তোমায়
আপন নিজ দেশেরে।
মা বললে ও হে সুন্দর—
সুন্দর রজকিনী।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোলে আয়রে নীলমণি !
নোনদেতে ঝারি হাতে পায়ে ঢালে জল,
শ্বশুর বলে ও বৌমা ঘরে এসো দেখি,
কেমন তোমার মাতা গো পিতা
কেমন তোমার হিয়া ?
তোমায় না দেখলে আমার প্রাণ বাঁচে না।

(২৭)

টেপা মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
ঢাক ঢোল হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
কেকলে মাছ উঠে বলে
আমারও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
ঢাকের কাটি হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।

চাঁনদা মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
নাকছাবি হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
খলসে মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
নাকে পাশা হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
শোল মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
পাটের শাড়ী হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
ইলিশ মাছ উঠে বলে
আমারও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
বাস সাবান হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে
রুই মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
বাস্ক হয়েরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
কই মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
মাথার চিরুনি হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে

ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
মজগুর মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
খোঁপার কাঁটা হয়েরে।
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনার ডালকুনার বিয়েতে।
বান মাছ উঠে বলে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
চুলের ফিতে হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
পাঁকাল মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
হাতের পেটি হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে
তোড়া মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
পায়ের তোড়া হয়েরে
ডালকুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে
গুতেল মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি
সিঁথের পাটি হয়েরে
ডালকুনাকুন নাছরে
ছবিনতার ডালকুনার বিয়েতে।
পুঁটি মাছ উঠে বলে
আমার ও ভাইরে
ভায়ের বিয়েতে যাবো আমি

লাল পাটা শাড়ী হয়েরে
ডাল কুনাকুন নাহুরে
ছাবিনতার ডালকুনার বিয়েতে

(২৮)

আহা চারিদিকে গোড়কাটা ভাই
মধ্য রাজার বাড়ী
আহা রাজা গেছে
পুজো নিতি নীলকণ্ঠের বাড়ী
আহা নীলকণ্ঠের বাড়ীরে ভাই
জোড়া পুয়োর গাছ
আহা সেই গাছে বসে আছে
সোনার দুটি হাঁস
আহা কামার ভায়ার বলে আলাম
ধিনুকো বানাতে
আহা কেমোর ভায়ার বলে আলাম
বাটুলও বানাতে
আহা একটা বাটুল মারলাম যদি
ডানি বামো গেল
আহা ফিরে বাটুল মারলাম যদি
সোনার হাঁসটি পলো
আহা সেখান ছিল বরকতবিবি
খোদার কাছে গেল
খোদা বলে বরকত বিবি
কানছো কেন তুমি
হেইরেছে তোমার ইমাম হোসেন
খুঁজে দেব আমি
গান গাব আর কতই গাব
গাচ্ছি বাড়ী বাড়ী।

(২৯)

হাতের পাতের খেয়েরে বেহুলা
মানুষ করলাম তোরে।
এক গেছরের ভার হলিনে বেহুলা
তোর মাথাডি খেয়ে।

হাতের পাতের খেয়েরে জল্লাদ
মানুষ করলাম তোরে
বিনা দোষের দুষিবি জল্লাদ
দিচ্ছ বনবাসে।
ওমোর জল্লাদরে।
হাতে ধরি পায়ে ধরি মিনতি করি জল্লাদ
দিও না বনবাসে
ওমোর জল্লাদরে
পায়ে ধরি মিনতি করি জল্লাদ
ও জল্লাদ ধরি তোমার পায়
হাতে ধরি পায়ে ধরি জল্লাদ
মেরো না তুমি আমার ধর্মের ভাই।

(৩০)

অরুণ বরুণ কুলাখানি
বকুল ফুলের মালাগো,
ভাইগো পতি বরণ কর।
বামে হেলে মা জাগো।
কাল ছিলিরে দুব্বা,
ওই বনের মাঝেতে
আজকে কেন এলিরে দুব্বা
বেহুলার বরণে?
কাল ছিলিরে ধান,
ঐ গোলার মাঝেতে।
আজকে এলিরে ধান,
বেহুলার বরণে?
কাল ছিলিরে ফুল।
ঐ না মালির বাগানে,
আজ কেন এলিরে ফুল
বেহুলার বরণে?
কাল কেন ছিলিরে রঙ,
বেনের দোকানের মাঝেতে।
আজকে কেন এলিরে রঙ
বেহুলার বরণে?

কাল কেন ছিলিরে রঙ
দোকানের মাঝে
আজকে কেন এলিরে রঙ
বেহুলার বরণে ?
কাল কেন ছিলিরে সাবান,
যুগীর দোকানের মাঝেতে।
আজকে কেন এলিরে সাবান
বেহুলার বরণে ?
কাল কেন ছিলিরে ফিতে,
দোকানের মাঝে।
আজকে কেন এলিরে ফিতে
বেহুলার বরণে ?
কাল কেন ছিলিরে ডোরা,
দে কানের মাঝে।
আজকে কেন এলিরে ডোরা
বেহুলার বরণে ?
ঘোড়ায় চড়ে আসছে দামাদ,
রুপার পায় জোর পায়ে।
গায়ে সোনার ঝিলিক মারে,
দামাদের ও গায়েরে।
এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
তোমার রাণী কানছে বসে
কি নিয়ে এসেছো দামাদ
কোল পেছ বের সামে না
তোমার রাণী কানছে বসে
নাকের নথ না হলি যাবে না।
শোনো শোনো ও ভাবিজান
বলি তোমারে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে ?
এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
কি নিয়ে এসেছো দামাদ

কোল পেছরের সামেনা
তোমার রাণী কানছে বসে
কানের দুল না হলি যাবে না
শোন শোন ও ভাবিজান,
বলি যে তোমাকে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে।
এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
কি নিয়ে এসেছো দামাদ
কোন পেছরের সামেনা
তোমার রাণী কানছে বসে
নতুন কাপড় না হলি
যাবে না।
শোন শোন ও ভাবিজান
বলি যে তোমারে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে
এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
তোমার রাণী কানছে বসে
হার না হলি যাবে না
শোন শোন ও ভাবিজান
বলি যে তোমারে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে
এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
তোমার রাণী কানছে বসে
চটি না হলি যাবে না
শোনো শোনো ও ভাবিজান
বলি যে তোমারে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে

এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
তোমার রাণী কানছে বসে
পায়ের মল না হলি যাবে না
শোন শোন ও ভাবিজান
বলি যে তোমারে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে ?
এসো এসো এসো দামাদ
বসো রাণীর ডানপাশে
তোমার রাণী কানছে বসে
কোমরের তোড়া না হলি যাবে না
শোন শোন ও ভাবিজান
বলি যে তোমারে
পুরনো কাপড়ে হচ্ছে বিয়ে
বিনি কারণে ।

(৩১)

তোরা আইগো দাসী হাসি খুসি,
আমরা বরণ কুলো আনি ।
সাদের জামাল যাচ্ছে বিয়ে করতে,
ঐ না চিলফার বাদশার বাড়ী ।
ওরে অরণ বরণ কুলোরে খানি,
বকুল ফুলের মালা ।
ভাগ্যপতি কর গো বরণ,
ও বামে হেলে মাজা ।
তোরা আইগো দিদি কররে বরণ,
বালা লখিন্দর ।
ওরে এতদিনে ছিলিরে কুলো,
ডোমেরো দোকানে ।
আজি কেন এলিরে কুলো
লখাইরো বরণে ?
তোরা আজকে বরণ করলো দিদি
বালা লখিন্দর ।

(৩২)

ওরে আদা কাটিলাম চাকা চাকা বালি,
লেবু কাটিলাম ডালে।
লেবু কাটিলাম ডালে।
আরে লেবুতলায় বসেরে আলমমিয়া,
তিরলে তিরলে ঘামে।
কি চুয়াইয়া চুয়াইয়ে পড়ে,
একটুখানি দেলো বাতাস ছকিনাখাতুন
আলম খাবে বাতাস (২)
কেমন করে দেবো বাতাস বালি,
আব্বাজান রইলো সামনে।
কেমন করে দেবো বাতাস বালি,
আম্মাজান রইলো সামনে।

(৩৩)

শোনরে শোনরে ভাই,
এখনগারের বিয়ে।
আমার এই বিয়েই খান্দি গদা আছে,
খান্দিবলে ওরে গদা তোমারে দেই কয়ে।
আসমান তারা শাড়ী পরা সাধ হয়েছে মনে,
আসমান তারা শাড়ী পরে ফিরবো বাড়ী বাড়ী,
আর একটু মানাতো গদা নর্তনি নাকে দিলে,
ওই কথা শুনেরে গদা নর্তনি আনলো লয়ে.
নর্তনি আনতে দেখেরে খান্দি মনে মনে ভাবে,
নাক বিধনো হয়নি আমার।
কি রূপ দেবো নাকে,
ওই কথা শুনেরে গদা মাথায় বাঁধে া ফেটা।
বনে থেকে আনতে গেলো।
নাক বিধনো কাঁটা।
কাঁটা না পেয়েরে গদা,
গুন সুই আনলো লয়ে।
গুন সুই নিয়ে এসেরে গদা,
বসলো চুলোর পাড়ে।

চুলোর পাশে বসেরে গদা,
নাকটি ধরলো ঠেসে।
খান্দি বললো ওরে গদা,
লক্ষ্মীছাড়া কঁড়ে।
একটুখানি নাক ছিল মোর,
তাওতো দিলি ছিঁড়ে।

(৩৪)

এখনকার কলিকালের বিয়ে করে,
চেঙড়া ছেলে।
তারা সব রঙের বাহার দেই,
সাতদিন পর রঙ চলকে ওঠে।
উপর দিয়ে ভেসে যায় কতই লোকে কয়,
তাল ধরেছে খেঁজুর গাছে
কিয়া মজার ফুল ফুটেছে ভাইরে ভাই।
শাওড়ীতি বলছে বৌমা মা মা
কাজ করোনা কেন ?
কাজ করো না কাম কর না,
মুখ ফুলাইয়া বসে রও।
খাবার বেলায় খাও,
বৌমা বলে কাল সকালে ধরেছে মাথা।
তাইতি বৌমা কয়না কথা
আহ্লাদে কয় না কথা
স্বামীতে বসেছেরে পরাণ
কথা কওনা কেন ?
কি কথা কবো আমি,
কি গুণের স্বামী তুমি।
একখান গওনা দেওনা কেন,
আর বিছে বিনে মাজা খালি
ঝুমকো বিনে খালি কান
এতই অপমান।
আজকের দিনে থাকো তুমি
কাল গহনা দিবো আমি
ও আমার বেচে ডোলের ধান।

(৩৫)

ওগুণের স্বামী গো,
তুমি আমাকে লয়ে আলাদা করে খাও।
আরে শাশুড়ীর জ্বালা যেমন তেমন,
ননদের জ্বালা ভারী।
আরে ননদের মুখে দিয়ে আগুন,
যাইবো বাপের বাড়ী।
আরে থালা ধুলাম বাটিরে ধুলাম
ধুইলাম ভাতের হাঁড়ি।
ওরে সোনার হাতে লাগবে গোবর,
বেচো হালের বলদ।
আরে শ্বশুর করে ফাসুর ফুসুর,
আরে ভাসুরে করেচে গোসা।
ওরে ছোট্ট দেওর জাঁতা হাতে,
ধরলো চুলের গুচা।
ও গুণের স্বামী,
তুমি আমাকে লয়ে আলাদা করে খাও,
আরে আয়নাল, ফইনাল, জয়নাল মোল্লা,
মনোরুদ্দিন মোলা বাড়ী।
ওরে ইয়াছ মুল্লা এ বাড়ী ও বাড়ী,
করছে দৌড়াদৌড়ি।
তুমি আমাকে লয়ে আলাদা করে খাও।

(৩৬)

হৃদয়পুরের মাঠেরে ভাই
তিত বেগুনের ফুল
কামাল কানা ওড়াই গামছা,
লেবু শুকাই চুল।
লেবু জগৎ মাতারিরে
বিয়াই নিকে করে।
লেবু ছুড়ি ভাত রাঁধে,
আঁকা ওঠে ধুমো।
কামাল কানা দইড়ে গিয়ে,
দুই গালে দেই চুমা।

বোস নেই বেড়ে নেই,
দিদার দেড়ে টাক।
মিছে কথা শুনো যদি,
আওল ঢেঁকির ডাক।
লেবু জগৎ মাতালিরে বিয়াই নিকে করে।
বাড়ীর কাছে ইছা পেঙা,
সেওতো ছিল খোঁড়া।
সিকার আলি উঠে বলে,
কিনবো আমি ঘোড়া।
লেবু জগৎ মাতালি
বিয়াই নিকে করে।
রোগ নেই বাগ নেই
ইয়াজউদ্দিন কাবু
টাকা নেই পয়সা নেই
আনোয়ার মিয়া কাবু
লেবু জগৎ মাতালি
বিয়াই নিকে করে

(৩৭)

এলোরে আদরের স্বামী,
দেশে এলোরে বাদামী।
সুগন্ধ তেল ভিন্ন,
মাথায় মাখবো না।
দেশে এলো কালো জিরে
পকোট পরে আনবেন বিড়ে।
মোটা চালের ভাত আমার,
পেটে সবে না।
এলোরে আদরের স্বামী
দেশে এলোরে বাদামী।
সুগন্ধ তেল ভিন্ন
মাথায় মাখবো না।
পুঁটি মাছের কাঁটা ভারি
সে মাছ আমরা খাইতে পারি ?

ইলিশ মাছের কাঁটা আমার
গলায় বাঁধে না
এলোরে আদরের স্বামী,
দেশে এলোরে বাদামী।
সুগন্ধ তেল ভিন্ন
মাথায় মাখবো না।
আর গাড়ু ভরা জল বন্ধু
পা দুখানি ধোও
অভাগিনীর কেশ মুছে
এক বিছানায় শোও।

(৩৮)

প্রথমা—আরে শ্বশুর বাড়ী যেয়ে বড়
জ্বালায় মরি।
বাজার করি না ছেলে ধরি,
আরে শ্বশুর বাড়ী যেয়ে বড়
জ্বালায় মরি।
দ্বিতীয়া —আমি কলেজ করি না ভাতার ধরি
আরে শ্বশুর বাড়ীর জ্বালাই মরি।

(৩৯)

তবে বলছে রাণী
শুনো মোর বাণী
আমার এই বচন,
বিয়ে দিতে হবে সীতার
ধিনুক ধরা পণ
দেশ বিদেশের বাবুরা।
করিলে জাগ্রতি
এই ধিনুকের ভারা দিতে
পারিবে যে জন
তাহার সাথে কোন মতে
ভজবে সীতার মন
রাম লক্ষ্মণ সীতা তখন
ফিরলো বনে বনে

রাম-বাদে লক্ষ্মণ
ধিনুকের ভারা দিল তখনি।
আরো মেজে ঘসে
ছাপো হয়ে দাঁড়াও
বাম পাশে
এখনি পড়াবো বিয়ে
দুই পুরুষের সাথে
রাম লক্ষ্মণ সীতা তখন
চললো বনে বনে
বনে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধে
ওরা একসাথে রয়।

(৪০)

হাতের পাতের খেয়েরে বেহুলা
মানুষ করলাম তোরে।
এগেছরের ভার হলিনে বেহুলা
তোর মাথাডি খেয়ে।
হাতের পাতের খেয়েরে জল্লাদ
মানুষ করলাম তোরে।
বিনা দোষের দুষিরে জল্লাদ
দিচ্ছ বনবাসে
ও মোর জল্লাদরে।
হাতে ধরি পায়ে ধরি মিনতি করি
জল্লাদ দিও না বনবাসে
পায়ে ধরি মিনতি করি জল্লাদ
ও জল্লাদ ধরি তোমার পায়
হাতে ধরি পায়ে ধরি জল্লাদ
মেরো না তুমি আমার
ধর্মের ভাই।

(৪১)

আজকে বুবুর গায়ে হলুদ
কালকে বুবুর বিয়ে

বর আসচে পাল্কি চড়ে
বকুল তলা দিয়ে
বর আসতে দেবো না
বুবুর কথা নেবো না
ও বুবু তোর দুলাভাইয়ের
কত্ত বড় দাড়ি
তার সাথে কালকে যাবি
মোজার শ্বশুর বাড়ী
আর কি তবে ভাবনা
একটা কথা রাখনা
ও বুবু তোর লাল শাড়ীখান
আমায় দিয়ে যানা।

(৪২)

আজ পুতুলের গায়ে হলুদ,
কালকো পুতুলের বিয়ে
পুতুল যাবে শ্বশুর বাড়ী
ঘুমটা মুড়ি দিয়ে।

(৪৩)

আমতলায় ঝাপুর ঝুপুর
কলা তলায় বিয়ে।
ঐ আসছে বরের বাবা,
গামছা মুড়ি দিয়ে।
ও গামছা নেবো না,
মেয়ে বিয়ে দেবো না।
মেয়ে দেবো সেইজে,
টেকা নেবো বেইজে।
এটাটি এটাটি মটর ফুল,
ওরে জামাই কতদুর।
জামাই এলো ঘেমে,
ছাতি ধরো হেলে,

ছাতির মাথায় কলেমা।
লাটে লাটে ভেমরা,
চৌদ্দ পোয়ার কাচারি।
বরণ বরণ টেপারি,
কাচা মেয়ে দুদির সর
কেমনে করে পরের ঘর।

(২৪)

রূপোর থালায় কাজল জাঁতা,
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর।

খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে বউয়ের নাকের নত নেবো,
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর।

খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে বউয়ের কানের মাকড়ী নেবো,
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা,
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর।

খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে আমার বউ এর গলার চেন নেবো
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,

তোমার বিয়ের ক্ষীর।
খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে আমার বউয়ের হাতের বাজু নেবো;
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা,
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর

খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে আমার বউয়ের হাতের আংটি নেবো,
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা,
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর।

খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে বউয়ের কোমরের বিচে নেবো
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা,
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর।

খাবনা খাবনা আমায় বিয়ের ক্ষীর
মায়ের কাছে আমার বউয়ের পায়ের নূপুর নেবো
তবেই খাবো ক্ষীর।
রূপোর থালায় কাজল জাঁতা,
সোনার থালায় ক্ষীর।
খাও খাও ভাই জননী,
তোমার বিয়ের ক্ষীর।

খাবনা খাবনা আমার বিয়ের ক্ষীর,
মার কাছে আমার বউয়ের আঙুট নেবো
তবেই খাবো ক্ষীর।

(৪৫)

কাঠবেড়ালী কাঠবেড়ালী
কাপড় কেচে দে।
তোর বিয়েতে যাবো আমি,
পালকি সেজে দে।
পালকিতে পাকা পান,
বর এসেছে মুসলমান।
বরের মাথায় টেকা,
বোর মাথায় ঝোপা।
ও দাদা তোর গোঁফ,
দাড়িটা দেখা।
গোঁফে পলো আগুন
দুধারে দুই বাগুন।

(৪৬)

এক পটলের ভাজাভুজি,
দুই পটলের ঝোল।
নাচেরে কলার কাঁন্দি,
বাজেরে ঢোল।
ঢোল যায় গড়াগড়ি,
ফুল যায় ভেসে।
আমার ভায়ের বিয়ে দেবো,
কলকাতার বসে।
কলকাতায় মরগগুলো,
কক্ কক্ করে।
তাই দেখে মা গঙ্গা,
খিলখিইলে হাঁসে।
মায়ে দিলে তেল আফসান,
বাপে দিলে বিয়ে।
কোন শালাতে নিয়ে গেল,
ঢাকে বাড়ী দিয়ে।

(৪৭)

ঘুঘু মলোরে ঘুঘু মলোরে,
চাল পুটুলি খেয়ে।

ঘুঘুর মরণ দেখতে যাবো
পাটের শাড়ী পরে।
পাট যাইরে গড়াগড়ি,
ফুল যাইরে ভেসে।
আমার ভাইয়ের বিয়ে দেবো,
হুগলী জেলায় বসে।

(৪৮)

নয় তোন বিবি,
পিটে গইড়ে দিবি।
পিটে নিয়ে গেল চোরে,
বর এলো ভোরে।
বরের নাম জুব্বার,
ও বর তুই চুপ কর।

(৪৯)

তেঁতুলি পাতায় তেঁতুল,
বিয়ে পড়াবো পুতুল।
আলে বালে ধান দোবো,
মাথার কাপড় টান দেবো।
ছাপন্ন টাকা দোবো
বিবি তুমি কবুল।

(৫০)

মা বাপে কি ভেবে চুনা,
দালান দেখে দিইলে বিয়ে।
দালান ধুয়ে খাগা পানি ?
যা মা তোর জামাই বাড়ী,
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা,
টেকা দেখে দিইলে বিয়ে,
টেকা বুকে দিয়ে মরগা।

যা মা তোর জামাই বাড়ী,
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা,
নাকের নথ দেখে দিইলে বিয়ে.
যা মা তোর জামাই বাড়ী,
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা,
মাকড়ি দেখে দিইলে বিয়ে।
মাকড়ি ধুয়ে খাগা পানি,
যা মা তোর জামাই বাড়ী।
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা
গলার হার দেখে দিইলে বিয়ে
হার ধুয়ে খাগা পানি ?
যা মা তোর জামাই বাড়ী
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা
পেটি দেখে দিইলে বিয়ে
পেটি ধুয়ে খাগা পানি ?
যা মা তোর জামাইবাড়ী
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা,
আমলেট দেখে দিইলে বিয়ে।
আমলেট ধুয়ে খাগা পানি,
যা মা তোর জামাইবাড়ী।
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা
আংটি দেখে দিইলে বিয়ে
আংটি ধুয়ে খাগা পানি
যা মা তোর জামাইবাড়ী
আমি যাবো না।
মা বাপে কি ভেবে চুনা,
পায়ের নূপুর দেখে দিইলে বিয়ে

পায়ের নূপুর ধুয়ে খাগা পানি
যা মা তোর জামাইবাড়ী।
আমি যাবো না।

বছর অন্তর একবার আসে
খাতা কলম নিয়ে বসে
ডাকলি কথা শোনে না
যা মা তোর জামাইবাড়ী
আমি যাবো না।

১. বিবাহের গানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যিক গুণ বিবর্জিত। বিবাহে, বিশেষত কন্যার সাজ সজ্জায় যা লাগে সেগুলির দীর্ঘ তালিকায় পর্যবসিত হয়েছে।

২. পুনরাবৃত্তি বিবাহের গানগুলির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই পুনরাবৃত্তি কখনও বা পংক্তির অংশ বিশেষের, কখনও বা পংক্তি বিশেষের কখনও বা একাধিক পংক্তির ঘটে থাকে। ধুয়ার ব্যবহারও লক্ষণীয়, যেমন 'পাগল করল ভাগেরে'।

৩. বিবাহের গানে কন্যাকে অনেক সময় বিকল্প নামে অভিহিত করা হয়; যেমন 'ময়না', বর অভিহিত হয় 'রাজা' বলে।

৪। কোন কোন গানে অনূঢ়া কন্যা তার অভিভাবক স্থানীয়কে সরাসরি তার যৌবন জ্বালার কথা জানিয়ে বিবাহের জন্যে তার ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করেছে।

৫. গান বিশেষে সতীন প্রসঙ্গ এসেছে। কেননা মুসলিম সমাজে একাধিক বিবাহ সিদ্ধ।

৬. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, 'পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের মুসলমান সমাজেও বিবাহোপলক্ষ্যে অনুরূপ মেয়েলী সঙ্গীত প্রচলিত আছে। তবে ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই রাম সীতা কিংবা রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না; অতএব ইহাদের মানবিকতার আবেদন আরও প্রত্যক্ষ'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বেশ কিছু মুসলমান বিয়ের গীতে রাম-সীতা বা রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ। আসলে প্রথমাবধি এদেশের মুসলমানরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত নন, পূর্বে এঁরা হিন্দুই ছিলেন। সেই পূর্ব সংস্কার এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত মুসলমান গীতে যে রাম সীতা বা রাধা কৃষ্ণের উল্লেখ ঘটেছে, সেখানে হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র রূপে তাঁরা উল্লিখিত হননি, আসল প্রেমিক প্রেমিকা বা নায়ক নায়িকা রূপেই উপস্থাপিত হয়েছেন। আমাদের উল্লিখিত বিবাহ সঙ্গীত গুলিতে বর বা নায়ককে কখনও রামচন্দ্র বলে

অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু বিপরীতে কনেকে সীতার পরিবর্তে 'রাধিকা' বলে বলা হয়েছে আবার লয়লা মজনুর প্রসঙ্গও উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

৭. বিবাহ গীতি অনেক ক্ষেত্রেই Prosaic.

৮. কথোপকথনের ভঙ্গীটি অনেক গানেই অনুসৃত হয়েছে, এর ফলে এক ধরনের নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে লক্ষিত হয়।

৯. বিবাহ গীতির একটি বৈশিষ্ট্য হল অকপটতা, এই অকপটতা প্রকাশ পেয়েছে কখনও কন্যার বক্তব্যে কখনও বা তার অভিভাবিকা বা সঙ্গী সাথীদের অভিব্যক্তিতে।

১০. অনেক বিবাহগীতিই যেমন খুব খুব দীর্ঘাকৃতির ; তেমনি কিছু কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির বিবাহ গীতিরও সন্ধান লভ্য।

১১. বিবাহের গানে যেমন রসিকতার সন্ধান মেলে, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে অভিযোগ-অনুযোগের সুরও অনুচ্চারিত থাকে নি।

অধ্যায়/ছয়

'চোর চুন্নী'র গান : নৃত্য, সঙ্গীত, সংলাপ ও অভিনয় : চতুরঙ্গে সমুজ্জ্বল

আমাদের লোকনাট্যগুলি লোকাচার এবং লোকসংস্কার থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এরই প্রমাণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় লোকনাট্য চোর-চুরণীর গানের। এতদঞ্চলের সংস্কার অনুযায়ী মহালয়ার অমাবস্যার দিন গৃহস্থের বাড়িতে কোন কিছু জিনিস গৃহস্থের অজান্তে চুরি করে এনে যদি পুনরায় সেটি গৃহস্থের অজান্তে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ফিরিয়ে দেওয়া যায় তবে সারা বছর নিরুপদ্রবে চৌর্য বৃত্তি সম্পাদিত হতে পারবে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন সফল ভাবে চুরি করতে পারার অর্থ সারা বৎসর নিরুপদ্রবে চুরি করার সুযোগ লাভ, এই সংস্কারকে কেন্দ্র করে যে চোর চুরণী পালার উদ্ভব হয়েছে তা একান্ত ভাবেই আনুষ্ঠানিকতা মণ্ডিত, তা বলাই বাহুল্য। তবে বর্তমানে আর এই পালায় আয়োজন আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নেই।

চোর-চুরণী পালা একান্তভাবেই সমাজ-বিষয়ক। কদাপি এই পালা পৌরাণিক বিষয় নির্ভর হয় না। দ্বিতীয়তঃ এই পালা অভিনীত হয় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। পালায় চরিত্র সংখ্যা খুব বেশি হয় না—চোর এবং তস্য পত্নী চুরণী ব্যতীত মহাজন, চৌকিদার, গৃহস্থ ইত্যাদি। চোর চুরণী পালায় গদ্য সংলাপ থাকে না এমন নয়। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে এর সাঙ্গীতিক অংশের পরিমাণ অনেক বেশি। আমাদের জনপ্রিয় লোকনাট্যগুলি সঙ্গীত রূপেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। যেমন—বোলান গান, গম্ভীরা গান, আলকাপ গান, খনের গান তেমনি চোর-চুরণীর গান। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর সুবিখ্যাত 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' এই মহাগ্রন্থে সংগত কারণেই চোর-চুরণী পালাকে স্থান দিয়েছেন। লক্ষ্য করার, গান এই পালায় সংলাপের ভূমিকা পালন করেছে। চোর-চুরণী পালার গদ্য অথবা কাব্যিক সংলাপ রাজ বংশী ভাষায় রচিত। চোর-চুরণী পালায় গানের আধিক্য থাকায় স্বভাবতই লোকবাদ্যের

সহায়তা এতে গ্রহণ করা হয়। লোকবাদ্যের মধ্যে রয়েছে হারমোনিয়াম, বাঁশি এবং অনিবার্য ভাবে দোতরা। যে চরিত্রের জন্য গান তা যে কেবল নির্দিষ্ট চরিত্রের দ্বারা গীত হয় এমন নয়। যারা বাদ্যযন্ত্র বাজান তারাও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন।

লোকনাট্যের ধর্ম অনুযায়ী চোর-চুরণী পালা তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত হয়। এই তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত হবার ব্যাপারটি একটু বিস্তারিত করা প্রয়োজন। আমাদের অনেকের ধারণা বুঝি বা লোকনাট্য অভিনয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই অংশ গ্রহণকারী শিল্পীরা তাৎক্ষণিক ভাবে বিষয় ঠিক করে নিয়ে অভিনয় শুরু করে দেন। মোটামুটি কতকগুলি জনপ্রিয় এবং পূর্ব থেকে স্থির করা বিষয় অবলম্বনে চোর-চুরণী পালা তৈরী করা হয়। তবে সংলাপ চরিত্রাভিনেতারা মুখস্থ করেন না বা বলেন না। চোর-চুরণী পালায় যে গানগুলি গাওয়া হয় সেগুলির সবই ভাওয়াইয়া। পালার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ করে ভাওয়াইয়া গান প্রয়োগ করা হয়। কখনই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গানগুলি তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করে গাওয়া হয় না। অন্যান্য লোকনাট্যের মত চোর-চুরণী পালায় পুরুষ নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘকালব্যাপি পুরুষ অভিনেতাই চোরের স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এসেছেন। কিন্তু ইদানীং পুরুষরা আর নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন না। কেননা তারা এতে লজ্জা পান। নারীই চুরণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন।

চোর-চুরণী পালা দীর্ঘায়িত হয় না। মোটামুটিভাবে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পালার মেয়াদ নির্দিষ্ট।

সব লোকনাট্যের মতোই চোর-চুরণীর অভিনয়ের সূচনাতে প্রথমে আসর বন্দনা করা হয়। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি আসর বন্দনার উল্লেখ করতে পারি ঃ

ওহো ঃ এসো মা হে, মা জননী মোরে
দীন হীন কাঙালে ডাকে মা তোমারে।
আইসেক মা মোর সরস্বতী মাগো
রথে করিয়া ঘর।
জয়ী জোকারে আইসেক মা মোর,
মোর সভার ভিতর।
মোর সভা ছাড়িয়া মাগো,
যদি অন্যের সভায় জাগো,
আরো কিছু কিরা নাদোং
মা ধর্মের মাথা খাবো।

সভা করিয়া বসিয়া আছে মা গো
রঙ্গের বাপ ভাই,
আমি যদি লজ্জা পাই মা, ধরমের দোহাই।
সভা করিয়া বসিয়া আছে হিন্দু মুসলমান,
হিন্দুকে প্রণাম জানাই, মুসলমান সালাম।
ওরে আয় মা মোর সরস্বতী মা
হে মা মোরে করো দয়া
ওরে আয় মা মোর সরস্বতী মা।

এই বন্দনাংশ মূলত সরস্বতীর বন্দনা। যেহেতু তিনি সকল কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাই সঙ্গীত সম্বলিত অভিনয়ের প্রাক্কালে সঙ্গত কারণে সরস্বতী বন্দনা গাওয়া হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতির শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় চোর চুরণী পালা গান এমন রসের বিষয় ও অসাম্প্রদায়িক ও উপভোগ্য, রমণীয় যার ফলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলী এই আসরে উপস্থিত থেকে চোর-চুরণী পালার রসাস্বাদন করেন। সামাজিক বিষয় নির্ভর তথা মানবিক আবেদন প্রসূত বলেই এই আকর্ষণ শ্রোতৃমণ্ডলী অনুভব করেন। যদি একান্তভাবে পৌরাণিক বিষয় নির্ভর হতো, তাহলে বোধ করি এমনটি হতে পারতো না।

বন্দনা গানের পরে শুরু হয় জনাচারেক মেয়ের নৃত্য। নৃত্যারম্ভের পূর্বে তারা গীদাল অর্থাৎ মুখ্য গায়ক বা চরিত্রাভিনেতাকে প্রণাম করে নেয়। এরপর গীদাল গান ধরেন এবং কি পালা অভিনীত হতে চলেছে তিনি তা ঘোষণা করেন। পৃথক ভাবে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর বন্দনা গান। গীদালের গানে তাঁর বিনয় ভাবের প্রকাশ ঘটে সর্বাধিক।—

অধম সভায় উঠিয়া বন্দিলাম ভাই
দশের চরণ শিরে রাখিয়া অতি দীন হীন।
অধম গীদাল কিছুই জানি না।
তোমার নাম লইয়া দাঁড়াইলাম সভায় ঈশ্বর ভাবিয়া।
তোমরা দশজন করিবেন দয়া বালক বলিয়া।
মিনতি করিয়া বলি, চরণ দাও মোর মাথায় তুলি
মনে আমার এই বাসনা,
কৃপা করি দয়াল হরি, আমার পূরাও কামনা।
ওসব হইতে সে সব কথা
রোল বোল ভালে ভাবে
চোর চুরণীর দু চার কথা শুনিয়া নাও সকলে মিলে।

মরি হায় ওহে।
জলপাইগুড়ি জেলায় ছিল কাশীর ডাঙা গ্রাম।
হলদি সানাই সুখে ছিল করিয়ে নিজ কাম।
পদ্মফুলে যেমন ভ্রমরা বইসে করে মধু পান
যৌবনের জোয়ারে হলদি হরিল সানাই এর মন।

অর্থাৎ এখানে অভিনীত পালার নায়ক নায়িকার পরিচয় এভাবে প্রদত্ত হয়েছে। নায়িকা হলদি বা হলুদ এবং নায়ক সানাই ; এমন কি কাশীরডাঙা গ্রামে যে তাদের বসতি, সে কথাও উল্লিখিত হয়েছে। এই নায়ক নায়িকার মধ্যে যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক তা উল্লেখ করা হয়েছে একটি অনবদ্য উপমার সাহায্যে।

চোর-চুরণী পালাটির বিষয় পরিচিতি জ্ঞাপক গানে আমরা কাব্যিক সৌন্দর্যের পরিচয় পাইনা ঠিকই, কিন্তু সারল্য বা অকপটতার গুণে তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেহেতু সুর সংযোগে গীত হয় তাই ছন্দ বা মাত্রা যথাযথ ভাবে রক্ষিত হবার বাধ্য বাধকতা থেকে তা মুক্ত। এই পরিচিতি অংশে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয়। সেই সঙ্গে রচয়িতার বিনয় গুণও সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে।

আমরা এবার চোর-চুরণী পালার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। পালার সূচনায় দেখা যাচ্ছে এক চাষী কৃষিকার্যে রত। সে ক্ষুধার্ত হয়ে আহার্যের জন্য অপেক্ষমান। তার প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। স্ত্রী তার জন্য আহার্য নিয়ে আসে।

অন্তরঙ্গ দাম্পত্য জীবনের পরিচয় পালাটিতে মেলে, বিশেষত যখন সানাই হলদির কাছে তার সন্তান কামনা জানায়। সানাই এর ডাকে হলদি তাকে 'সোনা' বলে। জবাব দেওয়াতেও তাদের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় উম্ঘাটিত। এমন কি দুজনের দ্বৈত সঙ্গীতে অংশ গ্রহণও তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনকেই চিহ্নিত করে। কিন্তু তাদের কৃষি নির্ভর সহজ সরল জীবন বিঘ্নিত হয় বন্যার কারণে। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, তিনদিন ধরে তাদের কোন আহার্য জোটে না। এই সুযোগে শালুকা এবং জংলা দুই চোর সানাইকে চৌর্য বৃত্তিতে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। আমরা জানি জন্মসূত্রে কেউ চোর হয়না, আর্থ-সামাজিক অবস্থাই মানুষকে সুস্থ জীবন থেকে অন্ধকার জীবনে টেনে আনে। সমাজে চৌর্যবৃত্তি ঘৃণ্য জীবিকা। কিন্তু একথাও তো সত্য শখ করে কেউ এই বৃত্তি গ্রহণ করে না। বাধ্য হয়ে মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার কারণে চৌর্যবৃত্তিকে অবলম্বন করে। আলোচ্য চোর-চুরণী পালায় সানাই যে কৃষি জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হল সে জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা হয়েছে ঠিকই, সেই সঙ্গে ধনী মহাজনের ঘৃণ্য

ভূমিকাকেও যুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য পালায় আমরা নটেশ্বর দেওয়ানীকে পেয়েছি, যার হাল বয় সানাই। অথচ সেই নটেশ্বরের কাছে একসের চাল কর্জ করতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে হলদিকে। শুধু তাই নয়, যে কু প্রস্তাব দিয়েছে নটেশ্বর, তাতেও শ্রেণী চরিত্র যেন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে প্রস্তাব দিয়েছে হলদি হাত পা ধুয়ে চারটি ভাত চড়াক। নটেশ্বরও তার গরুগুলি গোয়ালে রেখে আসুক। সে নিজে চারটি খাক এবং নটেশ্বরকে চারটি বেড়ে দিক। এর পরই তার প্রস্তাব সেই রাতটার মতো হলদি যেন তার কাছে থেকে যায়। কিন্তু নটেশ্বরের এই মন্দ প্রস্তাবে যে ভাবে হলদি তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, তাতে বোঝা যায় তার সতীত্ব বোধ কত তীক্ষ্ণ, তার মর্যাদা বোধ কত প্রবল, সে বলেছে, এমন কথা শোনাও মহাপাপ। বলেছে, তার চাল লাগবে না। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধর্ম-ভীরু হলদি জানিয়েছে ভগবানের করুণায় তাদের দিন এক সময় ফিরবে।

সানাইকে প্রথম যখন চুরির প্রস্তাব দেয় শালুকা এবং জংলা, তখন যে ভাবে সানাই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে, তাতে বোঝা যায় শত অভাব সত্ত্বেও, তিন দিনের উপবাসের পরেও সে তার মনুষ্যত্ববোধ ও নৈতিকতা বিসর্জন দেয়নি। চৌর্যবৃত্তির প্রস্তাবে সে শিহরিত হয়েছে। এবং স্পষ্ট জানিয়েছে চুরি তার দ্বারা হবে না। এবং তার এই বৃত্তি হলদি ভালো মনে মেনে নেবে না। কিন্তু শালুকা জোর করে তার হাতে পঞ্চাশ টাকা গুঁজে দিয়েছে যাতে চাল কিনে এনে সে খাওয়া দাওয়া করে। আরো জানায় রাতের বেলা সে যথা সময়ে এসে ডেকে নিয়ে যাবে। তার চুরি করার ব্যাপারটি হলদি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে স্বীকার করে নিলেও হলদি সানাইকে নিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে যেন ভালোয় ভালোয় সে চুরি করে ফিরে আসতে পারে। যেন ধরা না পড়ে। এই লোকনাট্যে বোঝা যায় গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলি ধর্মকে তাদের জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে যুক্ত করে নিয়েছে যে সুখে দুঃখে সব সময় তারা ঈশ্বরের কথা স্মরণ না করে পারে না। এমন কি বন্দনাংশে যেমন হরিধ্বনি করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি শালুকা এবং জংলী চুরি করার জন্য যে রাতটিকে আদর্শ বলে স্থির করেছে, জানিয়েছে সেই রাতে হরি-বাড়িতে গানের আসর বসবে। এবং সেখানে পাড়ার লোকজন গান শুনতে যাবে। সেই সুযোগ তারা নেবে বলে জানিয়েছে। হরিবাড়িতে অনুষ্ঠিত গান যে হরি বিষয়ক হবে তা বলাই বাহুল্য। আবার চাল ধার করতে গিয়ে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে হলদি নটেশ্বরকে জানিয়েছে ভগবানের করুণায় তাদেরও সুদিন ফিরবে।

সাহিত্য সমসাময়িক সমাজ জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। এই পালাটি কৃষি ভিত্তিক সমাজ জীবনকে প্রতিবিম্বিত করেছে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই যা এতদঞ্চলের জীবন যাত্রার পরিচায়ক। সানাই হলদিকে জানিয়েছে বন্যায় দেশের মানুষ সর্বস্বান্ত। তাদের বাঁচার আর কোন আশা নেই। উত্তরে হলদি জানিয়েছে, এই আকাল সত্ত্বেও দেশের অন্য মানুষেরা যদি বাঁচে তবে তারাও বাঁচবে। এই প্রত্যয়ের কথা বলতে গিয়ে হলদি দৃষ্টান্ত দিয়েছে কাঠের ভিতরের পোকা যদি বাঁচে, তবে তারা ও বাঁচবে। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে অরণ্যাঞ্চল। এখানকার জীবন ও জীবিকার সঙ্গে কাঠের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই সুবাদেই এতদঞ্চলের মানুষেরা কাঠের ব্যাপার অনেক ভালো বোঝে। তাই কাঠের পোকার প্রসঙ্গ হলদির বক্তব্যে স্থান পেয়েছে।

আলোচ্য পালায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয়তা লক্ষিত হয় সচ্ছল অবস্থার স্বপ্নে বিভোর যে সানাই, তার চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ঘটনায়। মানসিক দিক দিয়ে সানাই প্রস্তুত ছিল সেবারে চাষ বাস তাদের ভালো হবে এবং দেবীর পূজায় হলদিকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দেবে। কিন্তু দেখা গেল বন্যার ফলে তাদের স্বপ্ন বিচূর্ণ এবং তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়েছে। আলোচ্য পালাটির বড় গুণ বাস্তবের প্রতি আনুগত্য। আমরা কাঠের প্রসঙ্গ আগেই বলেছি। উত্তরবঙ্গ নদী অধ্যুষিত তাই এতদঞ্চলের মানুষের বন্যার অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ঘটনা। সর্বোপরি চৌর্যবৃত্তিতে সানাই এর অংশ গ্রহণের পিছনেও বাস্তব ঘটনাকে যুক্ত করা হয়েছে।

এইবার সামগ্রিক ভাবে পালাটির বৈশিষ্ট্যগুলির মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে। পালাটির বিনোদন রস যে অনেকখানি তা স্বীকার করতে হবে। চৌকিদার যে ভাবে হলদির সঙ্গে রঙ্গ রস করেছে তা হাস্য-রসের উদ্রেক করে। বিশেষত শালুকা এবং জংলার মূকাভিনয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে। তারা স্বভাবতই রাতের নীরবতা ভঙ্গ করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, তাই মূকাভিনয় ছাড়া গত্যন্তর নেই, একবার হেঁচে ফেলেছে সানাই। এই শব্দে তিন জনেই চমকে উঠেছে। শালুকা তার গামছাখানা সানাই এর মুখে গুঁজে দিয়েছে কাশি বন্ধ করতে। শুয়ে পড়ে সিঁদ কাটার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সানাই, সিঁদ কাটতে কাটতে হঠাৎ গৃহস্থের বাড়িতে মহিলা কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তাদের শিশুটি প্রস্রাব করেছে, তার স্বামী যেন কাঁথা বদলাতে সাহায্য করে। এছাড়া বাড়ির ঘুমন্ত মানুষের নাক ডাকার শব্দ ও তাতে চোরের শিউরে ওঠা। তারপর একে একে মূল্যবান জিনিস গৃহ থেকে সন্তর্পণে সরিয়ে আনা এবং সেগুলির কারণে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ সবই মূকাভিনয়ে উপস্থাপিত। আমরা লোকনাট্যে মুখোশ ব্যবহার নিয়ে

আলোচনা করি, কিন্তু মূকাভিনয় সম্পর্কে আলোকপাত করিনা। অথচ আমাদের লোকনাট্যে মূকাভিনয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কত সীমিত পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত হয়েছে জীবন্ত ভাবে। আর বিনোদনের সব কটি উপাদান যেমন—নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই পালা বাস্তবিকই দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর অপরিমেয় আনন্দরসের খনির স্বরূপ।

পরিশেষে 'চোর-চুরণী' পালাটি উদ্ধার করে দেওয়া গেল।

চোর-চুরণী-পালা ঃ

বন্দনা ঃ ওহো এসো মা হে মা জননী মোরে
দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে মা তোমারে
আইসেক মা মোর সরস্বতী মাগো
রথে করিয়া ভর
জোই জোকারে আইসেক মা মোর
মোর সবার ভিতর
মোর সভা ছাড়িয়া মাগো যদি অন্যের সভায় যাবো
আরো কিছু কিরা নাদোং মা ধর্মের মাথা খাব
সভা করিয়া বসিয়া আছে মাগো রঙ্গের রূপ ভাই
আমি যদি লজ্জা পাই মা ধর্মের দোহাই
সভা করিয়া বসিয়া আছে হিন্দু মুসলমান
হিন্দুকে প্রণাম জানাই মুসলমান সালাম
ওরে আয়মা মোর সরস্বতী মা
হে মা মোরে কর দয়া
ওরে আয় মা মোর সরস্বতী মা।

এরপর আসরে চারজন মেয়ে নৃত্যরত হবে।

গীদালের গান ঃ অধম সভায় উঠিয়া বন্দিলাম ভাই দশের চরণ
শিরে রাখিয়া অতি দীন হীন অধম গীদাল
কিছুই জানি না
তোমার নাম লইয়া দাঁড়াইলাম সভায় ঈশ্বর ভাবিয়া
তোমরা দশজন করিবেন দয়া বালক বলিয়া
মিনতি করিয়া বলি চরণ দাও মোর মাথায় তুলি
মনে আমার এই বাসনা
কৃপা করি দয়াল হরি আমার পুরাও কামনা
এসব হৈতে যেসব কথা রোলবোল ভালে ভালে
চোর-চুরণীর দুঃচার কথা শুনিয়া নাও সকলেরে
মরি হায় হায় ওহে।

জলপাইগুড়ি জেলায় ছিল কাশীর ডাঙ্গা গ্রাম
হলদি সানাই সুখে ছিল করিয়ে নিজ কাম
পদ্মফুলে যেমন ভ্রমরা বৈসে করে মধু পান
যৌবনের জোয়ারে হলদী হরিল সানায়ের মন।
আমার আজ আনন্দের সীমা নাই
চাঁদ বদনে হরি বল ভাই।

ধুয়া ঃ হায় হায় রে এত্ত ভাবে সানাই তখন বিলম না করিল
ও হো হো লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে সানাই তখন হাল বাইতে গেল।

সানাই ঃ এক পাক দুই পাক হাল বইতে রে
সুন্দরীক দেখং
মনে কয় সুন্দরী এইঠে বইসুং
লাঙ্গল যায় মোর হিদি হুদি তবু দেখং মুই সুন্দরীর ভিতি
একে তো দুপুরির বেলা হালের গরু মোর না দেয় ধরা
এক পাক দুই পাক ··· ···
তুইও দেখাচ্ছিস মোর শিকই ঢিলা
খাইতে দিল তুই মোক চাউলের গুড়া
এক পাক দুই পাক

সানাই ঃ হাল বইতে বইতে বেলাটা ভালেটা হইলেক
এলাও কেনে হলদি মোর খাবার ধরি না আইসে
খানিক আগে দেখুং
ও ওই যে হলদী খাবার ধরি আসির ধরছে
হলদি হলদি

হলদি ঃ যাং যাং

সানাই ঃ তুই কি জানিস না হলদি কালি রাতি যে মুই কিছুই
খাং নাই

হলদি ঃ খোলা ভাজতে ফাজতে খানিক দেরী হইলেক। তোমার বুঝি
খুব ভোক ধরছে। তা ন্যাও·· বইস·· খাও—

খাওয়ার দৃশ্য ঃ হলদি তোক না মুই একটা কথা কবার চাং

হলদি ঃ কি কথা ?

সানাই ঃ আমার মধ্যোৎ যদি এক না বাচ্চা টাচ্চা থাকিলেক হয়

হলদি ঃ কি যে তোমরা কন সোগে হইলেক ভগবানের দয়া।
জলপান খেয়ে শান্ত হয়ে সানাই ডাকে হলদিকে—
ও মোর হলদি

সানাইয়ের ডাকে সাড়া দেয় হলদি—

হলদি ঃ ও মোর সোনা···

হলদির অন্তরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, হলদি মনের আনন্দে গান ধরে।

দ্বৈত ঃ নাউয়ের আগাল হলফল হলফল করে—

হলদি ঃ মায়ে শিখাইছে রান্ধন বাড়ন বাপে দিছে বিয়া
ও কি ও হো রে সগল কথা ভুলিয়া থাকং
সোয়ামীক দেখিয়া রে
নাউয়ের আগাল হলফল হলফল করে

সানাই ঃ ছাইয়া মাটির নাউরে মোর হলফল হলফল করে
ও কি ও হো রে ঐ মতো মোর হলদির যৈবন
দিনে দিনে বাড়েরে
হলদির যৈবন চাল্লাউ চাল্লাউ (চকমক চকমক) করে
নাউয়ের আগাল হলফল হলফল করে

হলদি ঃ মোর সোয়ামী মাই ছেকে গামছা মাথায় দিয়া
ও কি ও হো রে মনে কয় মুই বাছুর ধরং
বগলে বসিয়া রে
ঘটির দুধ মোর হাল্লাউ হাল্লাউ (নড়েচড়ে) করে
নাউয়ের আগাল হলফল হলফল করে।
(তিস্তার বন্যায় হলদি সর্বস্বান্ত হল)

সানাই ঃ ও ভগবান মোর কপালোৎ কি এই আছিল
ওরে সর্বনাশা তিস্তা নদী তোর এই বানাতে মোর
ঘর বাড়ী জায়গা জমি সব কুল্লে ভাঙ্গিয়া নিয়া গেল
আজি মোর কিছুই নাই। বিধাতা
ও মোর বিধাতা মনে বড় বিধি আশা ছিল
পেটে-ভাতে দিন কাটাবো
সেও আশায় বিধি পড়িলেক ছাই, ও মোর বিধাতা

হলদি ঃ তোমরা কেনে এটি এমন করে বসিয়া কান্দির ধরছেন ?

সানাই ঃ হলদি মোর মনোৎ কত আশা আছিল মাও লক্ষ্মীর দয়াতে এবার যদি ভালে ভালে আবাদ সুবাদ হলেক হয় তাহলে এবার দেবী পূজার সময় তোক এখান ভাল চায়া শাড়ী কিনিয়া দিলুং হয়। দেখ তো হলদি আমি তিন দিন হাতে কিছুই খাবার না পায়া তোর সোনার নাখান (মত) মুখখান কেমন কালা হয়া গেছে।

হলদি ঃ দেশোৎ আকাল নাগিছে। দেশের মানসি যদি খায়া বাঁচে আমরাও বাঁচমু। আইস বাড়ী যাই।

সানাই ঃ না হলদি না, আমরা কেমন করি বাঁচমু। আমার যে এলা কিছুই নাই হলদি।

হলদি ঃ খুটার (কাঠের) ভিতরা পোকাটা যদি বাঁচে আমরা ত মানসি আমরাও বাঁচমু। আইস বাড়ী যাই।

সানাই ঃ না হলদি মুই আর বাড়ী যাইম না, বাড়ী যায়া মোর কি হবে ?

হলদি ঃ তোমরা এটি বইস মুই দুলাদি ঘরের বাড়ী যাং।

সানাই ঃ কি কনো হলদি, তুই কার বাড়ী যাব, দুলাদি ঘরের বাড়ী ? ওই নটেশ্বর দেওয়ানীর (মাতব্বর) বাড়ী, না হলদি না। তোক মুই উমার বাড়ী যাবার দিমু না। উমরা ধনী মানসি, আমার গরীবের কথা উমরা বুঝিবে না।

হলদি ঃ আগোৎ বুঝে নাই। আলা বুঝিয়া কইলে হয়ত বুঝিবে। তোমরা বইস মুই যাং। একসের চাল ধার করিয়া আনুং যায়া। তোমরা বইস, মুই যাং।

সানাই ঃ না হলদি তুই যাস না।

নটেশ্বর দেওয়ানী ঃ কায় (কেরে) ওটা হলদি নাকি ? তুই এই অবেলাৎ কোটে যাস হলদি ?

হলদি ঃ মুই তোমারে বাড়ী আসচুং দেওয়ানীদা। মোক একসের চাল ধার দাও। আজি তিনদিন হাতে আমরা কিছুই খাই নাই।

দেওযানী ঃ চাল মুই তোক দিবাব পাইম না হলদি। তুই এক কাজ করেক।

হলদি ঃ কি কাজ ?

দেওয়ানী ঃ তুই হাত ঠ্যাং ধুইয়া চাইট্টা ভাত চড়াও। মুই গরু দুইটা গোয়ালিৎ থুইয়া আইসুং। তুইও চাইট্টা খা। মোক চাইট্টা দে। আর আজিকার রাতি টা না হয় তুই মোরে এইটে র।

হলদি ঃ এগিলা কথা শোনাও মহাপাপ। না নাগে তোমার চাল। ফম রাখেন। দিন একদিন ফিরিবে। ভগবান দিন একদিন দিবে।

প্রস্থান—

শালুকা ঃ জঙ্গলা বে জঙ্গলা

জঙ্গলা ঃ কেনেবে দা (দাদা)

শালুকা ঃ শুনিস নাই এবার তিস্তার বানাৎ ওই কাশীর ডাঙ্গার হলদি সানাই উমার বোলে সউগে ভাসিয়া নিয়ে গেছে কিছুই বলে নাই।

জঙ্গলা : এইটেই হইল আমার চানজ। (চান্স) এই সুযোগে সানাইক আমরা চোর বানামু। সানাইয়ের মাইরা হবে চুরণী। চল আমরা কাশীরডাঙ্গা যাই।

সানাই : কায়রে দা তোমরা?

শালুকা : আমরা তোরে এটি আসছি। তোর দুঃখের কথা অভাবের কথা শুনিয়া আমরা কি ঠিক থাকির পাই?

সানাই। শালুকদা আজি তিনদিন হাতে না আমরা কিছু খাই নাই। তোমরা মোক একটা উপায় বুদ্ধি দাও।

জঙ্গলা : ওই তোরে ওই জন্যে.ত আমরা আসছি। তোর কোন চিন্তা নাই। তুই না নটেশ্বর দেওয়ানের হাল বইস্।

সানাই : আমার গরীব মানসির অভাবের কথা কি ধনী মানসি বুঝে শালুকদা? মোকে একটা উপায় বুদ্ধি দাও।

শালুকা : বুদ্ধি ত দিবার পারি তুই এলা ধরিস না না ধরিস।

জঙ্গলা : সানাই, তুই যদি আমার বুদ্ধি ধরিস তাহলে না এক দিনে ধনী হয়া যাব।

সানাই : কি এমন বুদ্ধি দাদা, কও দেখি।

শালুকা : কবার ত পারিরে তুই আগোৎ কিরা কারেক।

সানাই : ঠিক আছে কও।

শালুকা : কারো আগোৎ কবু না ত?

সানাই : না শালুকদা, কও দেখি তোমার বুদ্ধিটা

জঙ্গলা : শোন, আজি রাতে হুঁার বাড়ীৎ গান বসিবে, পাড়ার মানসি সগায় যাবে গান শুনিবার। এই সুযোগে তুই মুই আর জংলা এই তিনজনে চোর করিবার যামু।

সানাই : না শালুকা, মুই চোর করির পারিম না। মুই চোর করির গেলে হলদি মোক বেয়া (খারাপ) করে।

শালুকা : ধ্যেৎ, হলদির কথা বাদ দেৎ, তোক আজি চোর করির যাওয়ায় নাগিবে। এই পঞ্চাশ টাকা ধরেক। চাল ডাল কিনিয়া আনিয়া খায়া দায়া ঠিক করি থাকিব। আমরা রাতি আসিয়া তোকৎ ডেকামু। তুই বিরিয়া আসিব। তালি আমরা যাই। তুইও যা।

চুরি করতে গিয়ে সানাই ধরা পড়ে। গ্রামের মাতব্বর নটেশ্বর দেওয়ানী তাকে ছেড়ে দিল এই শর্তে সে কাশীরডাঙ্গা গ্রাম থেকে সে বিতাড়িত হবে। শালুকা জঙ্গলাকে থানায় চালান দেওয়া হল।

অধ্যায়/সাত

ব্রতানুষ্ঠান : পুরুষ শাসিত সমাজে নারীদের স্বাতন্ত্র্যের সূচক

বিষয়বস্তুর বিচারে ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে একান্তভাবে রমণীদের যোগ। ব্রতানুষ্ঠান মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত হয়, অংশগ্রহণকারীরা সকলেই মহিলা, ব্রতকথাগুলিও অবিমিশ্রভাবে রমণীদের দ্বারাই রচিত। স্বভাবতঃই এর কারণানুসন্ধিৎসা আমাদের আলোড়িত করে।

আমরা নানা দৃষ্টি থেকেই ব্রতানুষ্ঠান এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রতকথাগুলির ব্যাখ্যা করতে পারি।

পুরুষ মানুষের যদি বাইরের প্রতি আকর্ষণ হয় অধিক, তবে বলা যায় নারীর আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত ঘরে, অন্তঃপুরে। পুরুষের উপার্জন এবং কর্মময়তা বাইর্জগৎকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত কিন্তু মহিলাদের কাজকর্ম অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ। তাইত তার আর এক নাম অন্তঃপুরিকা। পুরুষ যদি হয় ভাঙ্গনের প্রতীক, তবে রমণীরা হল সৃষ্টির প্রতিভূ। সন্তানের জন্মদানে পুরুষের এক জৈবিক ভূমিকা থাকেই, কিন্তু রমণী যে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ নতুবা তার জননী সত্তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। স্বামী পুত্র, কন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে রমণী সুখের সংসার গড়তে চায়। সেই সঙ্গে চায় সংসারের কর্তৃত্ব। শৈশবাবস্থা থেকেই মেয়েরা যে পুতুল খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে, এত আসলে তার পরবর্তী জীবনযাত্রার পূর্ব সঙ্কেত। সংসারের কর্ত্রী যে হতে চলেছে বয়সকালে, 'সে যেন পুতুল খেলার মাধ্যমে সেই সংসারাসক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে।' যাই হোক, রমণী মাত্রেরই কাম্য সুখী গৃহকোণ রচনা; লক্ষ্মী-পরিবার পরিজনদের নিয়ে সুখী সংসার জীবনযাপন। এই আকাঙ্ক্ষা, বাসনারই প্রতিফলন লক্ষিত হয় ব্রতানুষ্ঠানে। ব্রতিনীরা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন করে না, সমগ্র পরিবারের কল্যাণ কামনাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐহিক বাসনা কামনা চরিতার্থতার জন্যই ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন। নারী যে স্বার্থপর নয়, তারও প্রমাণ এই ব্রতানুষ্ঠানগুলি। পুরুষ শুধু নিজের সংসারের ভাল মন্দ নিয়েই মত্ত থাকে। নারীকে নিজের স্বামী, পুত্র-কন্যা এসবের মঙ্গল কামনার সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ের মঙ্গল-কামনাতেও বিভোর দেখা যায়, শুধু স্বামী পুত্র কন্যার ঐহিক কল্যাণের ব্যাপারেই তার ব্রতের আয়োজন নয়, সঙ্গে সঙ্গে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনীর ঐহিক কল্যাণ-কামনাও তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত।

রমণী তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে নিজের মত করে দুটি পরিবারের যে ঐহিকতার সন্ধান করে ফেরে, তাতে তার সংসার আসক্তির পরিচয় ও প্রমাণ সুস্পষ্ট। কোন ব্রতেই আয়োজক ব্রতিনী পারত্রিকতার জন্য উদগ্রীব হয় না। ওটা যেন এক অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ। ব্রতকথায় বড়জোর এইটুকু কথিত হয় যে নির্দিষ্ট ব্রতাচরণে মৃত্যুর পর স্বর্গ গমন সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্বর্গ গমন ব্রতানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, একান্তভাবেই গৌণ উদ্দেশ্য।

রূপ ভাবে একটু অবাস্তব কল্পনা বলে মনে হলেও আজ আমরা যে নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতার কথা বলে থাকি, আন্দোলন করি নারী স্বাধীনতার জন্য, ব্রতানুষ্ঠান কি একদিক দিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদী আন্দোলন নয়? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-বিমুক্ত যে নারীকে আমরা একান্তভাবেই পরভৃতিকা রূপে দেখতে অভ্যস্ত, যে নারী তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল, সেই নারী ব্রতানুষ্ঠানে পুরুষের অংশগ্রহণকে নিষিদ্ধ করেছে (মূলতঃ ব্রত নারীদের, ব্যতিক্রম সামান্যই)। ব্রতের আয়োজনে যে সব উপাদানের প্রয়োজন হয় তাতে কোন প্রকার বাহুল্য নেই, নেই আড়ম্বরের। কেননা সেক্ষেত্রে পরভৃতিকা রমণীকে পুরুষের সহায়তা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে হয়। তাই একান্ত সুলভ উপাদান-নির্ভর হল আমাদের ব্রতানুষ্ঠানগুলি, যাতে ব্রতিনীরা উপাদানগুলি নিজেরাই সংগ্রহ করে থাকে, করতে পারে। এমনকি পুরুষ ভূমিকা বর্জনের জন্য ব্রতানুষ্ঠানে কোন পৌরোহিত্যের ব্যবস্থা রাখা হয় না। মহিলারাই আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারী। কোনো সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ হয় না ব্রতানুষ্ঠানে, কেননা সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতে হয়। তাই মন্ত্রের স্থান নিয়েছে ছড়া আর কথা, যেগুলি একান্তভাবে মহিলাদের রচিত, তাদের দ্বারাই আবার ব্রতানুষ্ঠান উপলক্ষে উচ্চারিত হয়।

শাস্ত্রানুমোদিত পূজার্চনায় নারীর ভূমিকা গৌণ, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তা লক্ষিত হয়। পূজার আয়োজন করে দেওয়া, নৈবেদ্যের ফলমূল কাটা কিংবা ভোগ রান্নাতেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে পৌরোহিত্যে মন্ত্রোচ্চারণে, পূজার সঙ্কল্প কিংবা ঘট স্থাপনে, প্রাণ প্রতিষ্ঠায় এমনকি আরতি করার বা অঞ্জলি দেওয়ানোতেও মহিলার কোনোই ভূমিকা নেই। এ সবেতেই পুরুষ শাসিত সমাজের একচ্ছত্র অধিকার। অনুমান করা চলে, অন্তঃপুরিকাগণ এই আচরণের, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য নিজেদের মত করে লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানগুলির পরিকল্পনা করেছে। বলাবাহুল্য এসব আয়োজনে তারা পুরুষের ভূমিকা একেবারে নাকচ করে দিয়েছে। কেউ কেউ পুরুষদের পূজানুষ্ঠানের অনুচিকীর্ষার সন্ধানও পেতে পারেন আমাদের মেয়েদের আয়োজিত ব্রতানুষ্ঠানগুলিতে।

গৃহিণীর গুণেই সংসার উজ্জ্বল হয়, তা সুখের আধার হয়ে ওঠে। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। কিন্তু গৃহিণী মাত্রই সংসারকে সুখের আধারে পরিণত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? গৃহিণী হলেই হবে না, এজন্য প্রয়োজন সু-গৃহিণীর। সমস্ত সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী তিনি। পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ থেকে সর্বজ্যেষ্ঠ সদস্যের খাওয়া-দাওয়া, স্নান, বিশ্রাম গ্রহণ, শরীর স্বাস্থ্য, সব কিছুর দিকে তাকে নজর রাখতে হবে। কিন্তু, এজন্য সুগৃহিণী হবার শিক্ষা লাভ প্রয়োজন। আগেকার দিনে অনেক অল্প বয়সেই কন্যার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। গৌরীদান প্রথায় অল্প বয়স্কা কন্যাকে শ্বশুরালয়ে যেতে হত। ফলে পিত্রালয়ে মাতা বা মাতৃস্থানীয়াদের কাছে যে সুগৃহিণী হবার উপযুক্ত পরামর্শ বা শিক্ষানবিশীর সুযোগ মিলত তা নয়।

নানাবিধ ব্রতানুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সুগৃহিণী হবার শিক্ষালাভের সুযোগ মিলত। কর্তব্যবোধ, উদারতা, ভক্তি, প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা, গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি দায়িত্ব—এ সবেরই শিক্ষালাভ ঘটত, অথবা এই সব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল ব্রতানুষ্ঠানগুলি। সর্বোপরি ব্রতানুষ্ঠানে নান্দনিক চেতনার পুষ্টি ঘটত, আর সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালনে আছে বৈচিত্র্যহীনতা, যা নারীর জীবনকে ঊষর মরুর মত করে তোলে, সেক্ষেত্রে এর প্রতিষেধক রূপে ব্রতানুষ্ঠানগুলি নারীদের কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিত—সাময়িক ভাবে হলেও দৈনন্দিন সংসারের রুটিন নির্দিষ্ট জীবন যাপনে অব্যাহতি মিলত।

ব্রত ঐক্যবোধ ও সংহতি শক্তিরও প্রেরণাদায়ক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, 'একজন মানুষের কামনা এবং তার চরিতার্থতার ক্রিয়া, ব্রত অনুষ্ঠান বলে ধরা যায় না। যদিও ব্রতের মূলে কামনা এবং চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া, কিন্তু ব্রত তখন, যখন দশে মিলে এক কাজ এক উদ্দেশ্যে করছে। ব্রতের মোটামুটি আদর্শ এই হল—একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠছে। ...একজনকে দিয়ে উপাস্য দেবতার উপাসনা করলে কিন্তু ব্রত অনুষ্ঠান চলে না। ব্রত ও উপাসনা দুইই ক্রিয়া—কামনার চরিতার্থতার জন্য; কিন্তু একটি একের মধ্যে বদ্ধ এবং উপাসনাই তার চরম, আর একটি দলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত—কামনার সফলতাই তার শেষ—এই তফাৎ।'

বক্তব্যটির একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি ব্রতিনী তার শ্বশুরালয় এবং পিত্রালয়ের বিভিন্ন আপনজনের ঐহিক কল্যাণ কামনা চরিতার্থতার জন্য ব্রতের আয়োজন করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার আত্মকেন্দ্রিকতার স্থান অনুপস্থিত। একান্তভাবে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে কোনো ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না। অনেকের রক্ষণ কামনাতেই এর আয়োজন এবং চরিতার্থতা। যে গৃহে ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, সেই গৃহের সকল মহিলাই সমবেত হয় ব্রতে অংশগ্রহণের জন্য। শুধু একটি গৃহেরই বা কেন, প্রতিবেশী গৃহ থেকেও মহিলারা ব্রতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে স্বাগত। অতএব যা একান্তভাবে পারিবারিক অনুষ্ঠান হতে পারত, তা হয়ে ওঠে ব্যাপকার্থে সার্বজনীন। সচরাচর মহিলাদের সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে গৃহে তার কর্মজীবন সীমাবদ্ধ থাকে, তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনবোধও সংকীর্ণ হয়। বিশেষত নারী অন্য নারীর সৌভাগ্য সুখ ও সমৃদ্ধিকে কখনই নাকি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু ব্রতানুষ্ঠান এর মূর্তিমান প্রতিবাদস্বরূপ। ব্রতকথায় আমরা দেখি, ঘটনাচক্রে ব্রতানুষ্ঠানে উপস্থিত কন্যা বা রমণী যেমন আয়োজিত ব্রতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আমন্ত্রিত হয়েছে, তেমনি দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী রমণীকে তার দুর্ভাগ্য জয়ের জন্য অন্য রমণী তাকে নির্দিষ্ট ব্রতানুষ্ঠান করার পরামর্শ দানে এগিয়ে এসেছে। অন্যের দুর্ভাগ্যে মৌন থাকে নি।

ব্রতগুলির প্রাচীনত্ব, ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি এবং ইতিহাস সম্পর্কে এইবার আলোচনা করা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অদ্বিতীয় 'বাংলার ব্রতে' ব্রতগুলির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: 'বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত: পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিম্বা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।'

এদেশে আর্য আগমনের পূর্বে যারা বাস করত তারা পরিচিত ছিল 'অন্যব্রত' নামে। বলাবাহুল্য 'অন্যব্রত' অভিধাটি আর্যদের দ্বারাই কথিত হত, আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের পার্থক্য বোঝাতে। আর্য আগমন পূর্ব ভারতবর্ষে এইসব 'অন্যব্রত'রা নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানাদি দেবতা—অপদেবতা, কলাকৌশল কিংবা ভয় ভরসাসহ বসবাস করত। পরবর্তীকালে আর্য আগমনের পর দু'পক্ষের মধ্যে নানা বিষয়ের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে অন্যব্রতদের আচার অনুষ্ঠানাদি কিংবা দেবতা অপদেবতাগণ যেমন আর্যদের দ্বারা গৃহীত হল, তেমনি অন্যব্রতরাও আর্যদের অনেক কিছু আত্মস্থ করল। পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তি এইভাবেই উভয় পক্ষের আদানপ্রদান, কিংবা গ্রহণ বর্জনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখ্য, মেয়েলি ব্রতানুষ্ঠানে এই আদান প্রদানের কোনো ছাপ পড়েনি। অন্য ব্রতদের ব্রতগুলি রক্ষিত হয়েছে, 'একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে।'

মানুষের কামনা বাসনা চরিতার্থতায় অভিনয় কলা এবং চিত্রকলার ভূমিকা অতি প্রাচীন; একেবারে গুহা মানবের সময়কাল থেকেই এই দুটি কলাকে যাদু বিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বিশেষতঃ সাদৃশ্যমূলক যাদু প্রক্রিয়াকে মূর্ত হতে দেখি চিত্রকলায় এবং অভিনয় কলাতে। মেয়েলি ব্রতে আশ্চর্যজনক ভাবে এই দুটি শিল্পকলার ভূমিকা এবং একই উদ্দেশ্যে দু'টিরই ব্যবহার। তবে ব্রতে শুধু পার্থক্য এইটুকুই যে বিচিত্র কামনা-বাসনা সফল করার ইচ্ছার সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের কারণে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত, সেগুলিকে প্রতিরোধ করার বাসনাও এতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্য কামনায়, সৌভাগ্য কামনায়—এমনি নানা কামনা 'চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে কি আর্য কি অনব্রত সব দলেই, এইটেই 'হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।'

আমরা লক্ষ্য করি মেয়েলি ব্রতগুলি একান্তভাবে তিথি নক্ষত্র, মাস বৎসর, অমাবস্যা পূর্ণিমা এককথায় ঋতু নির্ভর। প্রতিটি ব্রত আয়োজিত হত বা হয় নির্দিষ্ট তিথিতে, তারিখে, বৎসরের নির্দিষ্ট মাসে অথবা মাসের নির্দিষ্ট দিন অথবা বারে। খেয়াল খুশী মত ব্রতিনীদের অবসর মত কখনই ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন হত না বা এখনও যেখানে সীমিত পরিসরে ব্রতানুষ্ঠান আয়োজিত হয়, সেখানেও হতে দেখা যায় না।

ব্রতানুষ্ঠানে আচরিত সাদৃশ্যমূলক যাদু প্রক্রিয়ার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাক। 'পূর্ণিপুকুর' ব্রতের উদ্দেশ্য পুকুরের জল প্রচণ্ড দাবদাহেও যেন শুকিয়ে না যায়, প্রচণ্ড উষ্ণতার কারণে যেন বৃক্ষলতাদির মৃত্যু না হয় তা নিশ্চিত করা। এই ব্রতে ব্রতিনীদের যে ক্রিয়া, তার মধ্যে রয়েছে পুকুর কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল প্রোথিত করা, জল ঢেলে পুকুর পূর্ণ করা। ব্রতিনীরা যখন এইরূপ আচার পালন করে তখন প্রত্যাশা করা হয় বাস্তবেও পুকুরের জল পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকবে শত উষ্ণতায় তা বাষ্পীভূত হবে না।

কিংবা ধরা যাক 'বসুধারা' ব্রতানুষ্ঠানের প্রসঙ্গটি। এই ব্রতের উদ্দেশ্য বৃষ্টির আগমনকে অনিবার্য করে তোলা। এই ব্রতে যে আলপনা অঙ্কনের রীতি, তাতে আটটি তারা থাকে, একটি মাটির ঘট ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হয়। বিশ্বাস, এর ফলে বাস্তবেও বৃষ্টির ধারা পতন ঘটবে এবং তাতে বৃক্ষাদি সিক্ত হবে। 'Like produces like' এই রূপ সহানুভূতিসূচক বা Sympathetic magic প্রক্রিয়ার আরও নিদর্শন মেয়েলি ব্রতানুষ্ঠান থেকে দেওয়া যায়।

লক্ষ্মীব্রতে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন অঙ্কিত করা হয় এবং সেই পদচিহ্ন বাইরের দরজা থেকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশরত লক্ষ্মীকে সূচিত করে---এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদত্ত হয় যে চঞ্চলা লক্ষ্মী যেন গৃহে প্রবেশ করে গৃহস্থ গৃহেই অবস্থান করেন, চঞ্চলা হয়ে গৃহত্যাগী যেন না হন। তাই লক্ষ্মী পূজায় প্রস্থানোদ্যত পদচিহ্ন কদাপি অঙ্কিত হয় না। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ব্যতীত অঙ্কিত হয় ধানের মরাই, ধানের শিস্, মাছ, পুকুর, নথ বালা ইত্যাদি অলঙ্কার আভরণ। বিশ্বাস করা হয় এর ফলে বাস্তবেও গৃহস্থের মরাই ভর্তি ধান হবে, তার মাঠে ফলবে ধান, গৃহকর্ত্রী অঙ্কিত আভরণাদি বাস্তবেও লাভ করবে। দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজায় অলক্ষ্মীকে বিদায় করা হয় পূজার সূচনাতেই। বিশ্বাস করা হয় এর ফলে গৃহ থেকে বাস্তবেও অলক্ষ্মী বিতাড়িত হলেন এবং লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান সুনিশ্চিত হল।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ব্রতিনীদের প্রার্থনায় এবং ব্রতানুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্যে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের ঐহিক মঙ্গল কামনা বাসনা মূর্ত হতে দেখা যায়। আমাদের সেই পূর্বকথিত বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে --

অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয় যে 'আলপনা পূজা', তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়ায় বলা হয়েছে --

ঢেঁকি পড়ন্ত, উনুন জ্বলন্ত
বাপঘর, শ্বশুর ঘর, ভরন্ত পূরন্ত।

তুষ তুঁষুলী ব্রতে বলা হয়ে: বাপ মার ধন নাড়ি চাড়ি, শ্বশুরের ধন পাক্কা করি।

আরও বলা হয়েছে: নার পাতা ঢলা-ঢলা মার কানে সোনার থলা,
নার পাতা ঢলা ঢলা ভায়ের কানে সোনার থলা

সেঁজুতি ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়াটি বা প্রার্থনাটি হল:

সাঁঝ ভোজন সেঁজুতি
ষোল ঘরের ষোল বতি
তার মধ্যে আমি এক বতি
বতি হয়ে মাগি বর
ধন পুত্রে বাড়ুক বাপ মার ঘর।
সাঁঝ ভোজন সেঁজুতি
ষোল ঘরের ষোল বতি
তার মধ্যে আমি এক বতি

বতি হযে মাগি বব
ধন পুত্রে বাড়ুক আমাব ববেব ঘর

ব্রতেব প্রার্থনায় ঐহিকতা যে পাবত্রিকতাকে অতিক্রম করে গেছে তাব নিদর্শন স্বরূপ হবিব চরণ ব্রতেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়াটিব উল্লেখ কবা যায়। এখানে ব্রতিনীব ঐহিক কামনা বাসনাব স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়—

আপনাকে সুন্দব চায, বাজ বাজেশ্ববী স্বামী চায।
গুণবতী ঝি চায, সভা উজ্জ্বল জামাই চায॥
অমব ববপুত্র চায়, গিবিবাজ বাপ চায়।
মেনকার মত মা চায, দুর্গাব মতো আদব চায়॥
বামেব মত পতি,
সীতাব মত সতী,
আলনা ভবা কাপড, মবাই ভবা ধান,
গোযাল ভবা গরু, পাল ভরা মোষ,
পায়ে আলতা মুখে পান,
পট্টবস্ত্র পবিধান॥

ইতু পূজায যে প্রার্থনা ও মনোভিলাষ ব্যক্ত হয, যে আশায এই ব্রতানুষ্ঠানেব আযোজন তা হল—

নির্ধনেব ধন হয়,
অপুত্রেব পুত্র হয,
আইবুড়োব বিযে হয,
অস্মরণের স্মবণ হয,
অন্ধেব চক্ষু হয
এবং সর্বোপবি, অন্তকালে স্বর্গে যায।

খেলাব ছড়াগুলি যেমন কবিত্ব বর্জিত, ব্রতেব ছড়াগুলিও তেমনি। তবে অকপট ইচ্ছা কামনা বাসনাব প্রকাশে ছড়াগুলি জীবন্ত রূপ লাভ কবেছে। কষ্ট কল্পনাব স্থান নিয়েছে কঠোব বাস্তব বোধ। চবিত্রে ব্রতেব ছড়াগুলি তাই গদ্যেবই নিকট আত্মীয হয়ে উঠেছে। ব্রতিনীবা অন্ততঃপক্ষে ছড়াগুলিতে কোনরূপ মিথ্যা ভাষণেব আশ্রয় নেয নি।

ব্রতের সঙ্গে ছড়াগুলিব মধ্য দিযে আমরা যে কেবল নারী সমাজেব পতিকুল ও পিতৃকুলের কল্যাণ কামনাব স্ববই শুনতে পাই, কিংবা সেই সঙ্গে নাবীব একান্ত ব্যক্তিগত কামনা বাসনাকেই মূর্ত হতে দেখি তা নয, একটু সূক্ষ্ম ভাবে লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে এই পাবিবাবিক কল্যাণ কামনাই কখনো কখনো বিশ্বজনীন কল্যাণ কামনাব রূপ প্রাপ্ত হযেছে। এক্ষেত্রে নাবীব সচেতন মনেব ভূমিকা কতখানি সে সম্পর্কে নিশ্চিত কবে বলা না গেলেও স্বীকাব কবতে হবে প্রার্থিত বিষযের গুণে অন্ততঃপক্ষে তা বিশ্বজনীন হবাব মর্যাদা লাভ কবেছে। আমাদেব বক্তব্যেব

সমর্থনে অবশ্যই কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে হবে।
বসুধারা ব্রতের ছড়ায় বলা হয়েছে।

মায়ের কুলে ফুল; বাপের কুলে ফুল; শ্বশুরের কুলে তারা
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা।
পৃথিবী জলে ভাসবে; অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে।

এখানে যে বৃষ্টির কামনা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কেবল মাতৃকুল, পিতৃকুল কিংবা শ্বশুরকুলের কল্যাণ সাধন নয়, সমগ্র পৃথিবী বৃষ্টির করুণা ধারায় সিক্ত হবে, প্রাণের স্পন্দন অনিবার্য হয়ে উঠবে, দেখা দেবে চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ—এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষাও মূর্ত হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

কিংবা যখন বলা হয়—

কালবৈশাখী আগুন ঝরে!
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই।

তখন এই বিষণ্নতার চিত্র ব্যক্তিবিশেষের আশঙ্কাকে প্রকটিত করে না, দাবদাহের শিকার মানুষ মাত্রের বেদনা এবং আশঙ্কাই এখানে দ্যোতিত হয়। শস্পাতার ব্রত উদযাপিত হয় প্রচুর শস্য লাভের কামনায়। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমষ্টির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। প্রচুর শস্যের ফলন ব্যক্তি-বিশেষের সৌভাগ্য সুখের দ্যোতক নয়, তা সমষ্টির সৌভাগ্য সুখেরই দ্যোতক।

ব্রতের ছড়ার মাধ্যমে আমরা সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা বিশ্বস্ত তথ্যের সন্ধান পাই। তাই ছড়াগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

আজকের দিনে জেলার বনেদী গৃহে কখনও পাল্কী এই লোকযানটি ধূলাবলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন এই যানটি ব্যবহারের চল ছিল যেমন বহুল, তেমনি ছিল এর আভিজাত্য। একটি ব্রতের ছড়ায় ব্রতিনীর কণ্ঠে উচ্চারিত হবার জন্য বলা হয়েছে—

আমরা পূজা করি পিঠালির পালকি,
আমাগো হয় যেন সোনার পালকি।

আজকের গণতন্ত্রের যুগে রাজতন্ত্রের প্রতি আমাদের আকর্ষণের পরিবর্তে তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ অনীহাই লক্ষিত হবে। কিন্তু যখন গণতন্ত্রের তেমন বাড়-বাড়ন্ত ছিল না, তখন আমাদের সমাজ ছিল রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। ব্রতের ছড়াতেও রাজতন্ত্রের প্রতি সেকালের মানুষের আকর্ষণ ও সম্ভ্রমবোধ সোচ্চার। আলপনা পূজার ছড়ায় উল্লিখিত হয়েছে

গো গাছু কেঁকিনী গাছ, তুলে ধর মাচা
বাপ হয়েছে দিল্লীশ্বর ভাই হয়েছে রাজা।

সেঁজুতি ব্রতের ছড়ায় ব্রতিনীর এই বাসনা তীব্র আবেগে উচ্চারিত হয়েছে—

কোঁড়ার মাথায় দিয়ে ঘি
আমি হই রাজার ঝি।
কোঁড়ার মাথায় দিয়ে মৌ
আমি হই রাজার বৌ।
কোঁড়ার মাথায় দিয়ে ফাগ
আমি হই রাজার মাগ

পৃথিবী ব্রতেও একই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে—

এস পৃথিবী বস পথে,
শঙ্খচক্র ধরি হস্তে।
খাওয়ার ক্ষীর মাখন ননী,
আমি যেন হই রাজার রাণী॥

জন বিস্ফোরণ ঘটায় এখন পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন মৎস্য, শস্য ইত্যাদির মত সন্তান প্রাচুর্যকেও সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে বিবেচনা করা হত। ব্রতের আলপনায় শুধু 'হাতে পো কাঁখে পো' একটি সাধারণ মটিফ তাই নয়, ব্রতের ছড়াতেও নানা ভাবে সন্তান লাভের এবং তা অধিক সংখ্যায় লাভের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। আলপনা পূজার ছড়ায় বলা হয়েছে—

হাতে পো কাঁখে পো পৃথিবীতে না পড়ে চক্ষের লো।

কিংবা, বাসনা প্রকাশ করে বলা হয়েছে—কুন্তীর মত পুত্রবতী হবো। কুন্তী ছিলেন শত পুত্রের জননী। তুঁষ তুঁষুলি ব্রতেও একই আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ—

গইলে গরু মরাই ধান
বৎসর বৎসর পুত্র দান।

যমপুকুর ব্রতের ছড়ায় বলা হয়েছে—

লক্ষ লক্ষ দিলে বর।
ধনে পুত্রে বাড়ুক ঘর॥

আধুনিককালে সম্প্রদায় বিশেষ ব্যতিরেকে সাধারণভাবে বহু বিবাহ প্রথা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ফলে সতীন প্রসঙ্গ আজকের পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কিছুকাল আগে পর্যন্ত এই সতীন প্রথা ছিল আমাদের সমাজের এক অবাঞ্ছিত এবং কলঙ্কময় প্রথা। ব্রতের ছড়ায় একদিকে যেমন সতীন বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে নানা ভাবে, তেমনি সতীন মুক্ত ভাগ্যের জন্য প্রার্থনা উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। আলপনা পূজায় বলা হয়েছে—

অশথ্ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি।
বাতা, বাতা, বাতা, খা সতীনের মাথা।
বেড়ি, বেড়ি, বেড়ি, সতীন মাগী চেড়ী।
বঁটি, বঁটি, বঁটি, সতীনের শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।

আমাদের সমাজজীবনে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব কি সুদূর প্রসারী হয়েছিল, তার বহুল নিদর্শন মিলবে ব্রতের ছড়া থেকে। এই দুটি মহাকাব্যের বিভিন্ন চরিত্র আমাদের সমাজজীবনে আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল। তাই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে—আলপনা পূজায়—

সীতার মত সতী হব।
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হবো।

* * *

দশরথ হেন শ্বশুর হোক।
লক্ষ্মণ হেন দেওর হোক।
রামের মতো স্বামী হোক

হরির চরণ ব্রতে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে—

রামের মতো পতি,
সীতার মতো সতী

দশপুত্তল ব্রতে আবার দ্রৌপদীর মত রন্ধন পটিয়সী হবার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে—

কুন্তীর মতো ধীরা হব॥
দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব...।

এছাড়াও সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, দশরথ চরিত্রগুলিকে আদর্শ করে বলা হয়েছে—

সীতার মত সতী হব, রামের মত পতি পাব॥
লক্ষ্মণের মত দেবর পাব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।
দশরথের মত শ্বশুর পাব, দুর্গার মত মা পাব॥

পূর্বে জলপথের ব্যবহার ছিল যেমন অধিক, তেমনি নৌবাণিজ্যেরও ঘটেছিল বিশেষ প্রসার। তাই ব্রতের ছড়ায় প্রায়শই ভাই, পিতা কিংবা স্বামীর নৌ-বাণিজ্য যাত্রা কিংবা নিরাপদে বাণিজ্য যাত্রা থেকে প্রত্যাবর্তন, নৌকাবরণের মত প্রসঙ্গগুলি স্থান পেয়েছে—

ভাই গেছেন বাণিজ্যে,
বাপ গেছেন বাণিজ্যে,
সোয়ামি গেছেন বাণিজ্যে।

ভাদুলি অনুষ্ঠানে বাবুই পাখীর কণ্ঠ নিঃসৃত গানের অংশ—

পুঁটি! পুঁটি! উঠে চা।
ভাদুলি মায়ে বর দিল।
ঘাটে এল সপ্ত না।

* * *

বাবুই—বাসা দল দল।
নৌকা বরতে ঘাটে চল্, ঘাটে চল্।

মেয়েদের নৌকাবরণের প্রসঙ্গ—

এ-গলুয়ে ও গলুয়ে চন্দন দিলাম,
বাপ পেলাম, বাপের নন্দন পেলাম।
এ-গলুয়ে ও-গলুয়ে সিন্দূর দিলাম,
বাপ ভায়ের দর্শন পেলাম॥

যাত্রী ও নাবিকদের গান:

একুল ওকুল উজান ভাটি,
নামলাম এসে আপন মাটি।
এক নৌকা চড়ায় লাগালাম,
এক নৌকা ছাড়লাম।
ব্রজে যাই, বাণিজ্যে যাই, সকল নৌকা পেলাম।

ব্রতের উৎপত্তি, ব্রতের ইতিহাস, ব্রতের তাৎপর্য এমনকি ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছড়াগুলির আলোচনার পর আমরা এবার সরাসরি ব্রতকথার প্রসঙ্গে আসতে পারি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য যে প্রতিটি ব্রতের ব্রতকথা নেই। বেশ কিছু ব্রতের ব্রতাচার পালনের পর ব্রতিনীরা এক সঙ্গে বসে একজন ব্রতিনী বা বয়স্কা রমণীর মুখ থেকে সেই ব্রতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রতকথাটি ভক্তি সহকারে শোনে। এই ব্রতকথা শোনার পরই ব্রতাচার সম্পূর্ণতা পায়। কিন্তু যে ব্রতগুলি ব্রতকথা বিমুক্ত, সেক্ষেত্রে ব্রতাচারেই দায়িত্ব নিঃশেষিত হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে আগে ব্রতের উদ্ভব না ব্রতকথার? আমরা বলব ব্রতাচারেই এর উত্তর রয়ে গেছে। ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ritual বা কৃত্যাদি পালনের পর সবশেষে ব্রতকথা শোনার পালা। অনুরূপভাবে পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে ব্রতের, ব্রতাচারের, তৎপরে যুক্ত হয়েছে ব্রতকথা। ব্রতকথা যে ব্রতাচারের অনিবার্য অঙ্গ নয়, তার প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রথমত এমন অনেক ব্রত রয়েছে যেগুলির সম্পূরক ব্রতকথার সৃষ্টি হয়নি। দ্বিতীয়ত, ব্রতকথার সঙ্গে 'কামনার যোগাযোগ এবং অনুষ্ঠানেরও যোগাযোগ ততটা নেই। ... এটা কতকটা ক্রিয়াকর্ম শেষ করে গল্পগুজব করা—গ্রামের পাঁচজন মিলে'।

কিন্তু তাই বলে ব্রতকথাগুলিকে এককথায় উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। নানা কারণেই ব্রতকথাগুলির গুরুত্ব। ব্রতাচারের দিক থেকে ব্রতকথার গুরুত্ব এইখানেই যে এর থেকে আমরা নির্দিষ্ট ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাসটুকু জানতে পারি। অবশ্য এ সত্যও অনস্বীকার্য যে অনেক সময়েই সেই ইতিহাসকে কথায় বিকৃত বা পরিবর্তিত করে উপস্থাপন করা হয়।

আমাদের লোককথাগুলির অন্যতম হল এই ব্রতকথা; রূপকথা, পশুকথা এবং ব্রতকথা এই তিন সদস্য নিয়েই মূলতঃ আমাদের লোককথার সংসার; অবশ্য সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ব্রতকথাগুলির উৎস অনেক ক্ষেত্রেই রূপকথা এবং পশুকথা। একটা তথাকথিত ধর্মীয় মোড়কে ব্রতকথাগুলি আবৃত থাকে, তাই হঠাৎ করে এগুলিকে লোককথার মর্যাদা দিতে সংশয় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মটিফের বিচারে দেখা যাবে রূপকথা বা পশুকথার সঙ্গে ব্রতকথার সাযুজ্য কত গভীর।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির উৎসরূপে ব্রতকথাগুলি অভিহিত হবার দাবী রাখে। সংক্ষেপে ব্রতকথাগুলিতে বিশেষ বিশেষ লৌকিক দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। যে কোনো ব্রতকথার মূল প্রতিপাদ্য হল বিশেষ লৌকিক দেবতা বা দেবীকে অগ্রাহ্য করায় অগ্রাহ্যকারীর চরম বিড়ম্বনা ভোগ এবং শেষপর্যন্ত সেই দেবতা বা দেবীর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নেওয়ায় দুর্গতির মোচন, ঐহিক কল্যাণ সাধন। মঙ্গল কাব্যেও এই বিষয়টিই বিস্তৃত পরিসরে অভিব্যক্ত। বললে অত্যুক্তি হবে না যে মঙ্গলকাব্যগুলির প্রেরণা হল ব্রতকথা, মঙ্গলকাব্যগুলির ভূমিকা স্বরূপ ব্রতকথাগুলির তাৎপর্য। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রের পরিকল্পনা ব্রতকথারই দেব চরিত্র পরিকল্পনার প্রভাব জাত। '...মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক সময় ব্রতকথার টীকা বা ভাষ্যের কাজ করিয়াছে। ব্রতকথার মধ্যে সূত্রাকারে যে সকল বিষয় অবস্থান করিয়াছে মঙ্গলকাব্যে তাহাই বিস্তৃততর বর্ণনা লাভ করিয়াছে।' মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভেদ বিলীন হতে দেখা গেছে। স্বর্গের দেবতা মর্ত্যলোকে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে। অনেক সময়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেবতা রক্ত-মাংসের মানুষের সহায়তা করেছেন, প্রার্থনা জানিয়েছেন মানুষের সহায়তা লাভে আপন মাহাত্ম্য প্রচারে। ব্রতকথাগুলি থেকেই ভাবনা বা দর্শন গৃহীত হয়েছে মঙ্গলকাব্যগুলিতে বলা চলে।

সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য কিংবা বিনোদনের ব্যাপারটি বাদ দিলেও যে গুরুত্বের কারণে সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা সাহিত্যকে বিশেষ সমীহের চোখে দেখে থাকেন, তা হল সমসাময়িক সমাজজীবনের দর্পণ হল সাহিত্য। ব্রতকথাগুলি থেকে আমরা জানতে পারি এক সময়ে এতদঞ্চলে নৌবাণিজ্যের প্রসারের কথা। যে বাঙ্গালীকে ব্যবসা বিমুখ বলে অভিহিত করা হয়, ব্রতকথাগুলি তার বিপরীত ধারণার পরিপোষকতা করে। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সওদাগরদের প্রসঙ্গ পাই, বিস্তারিত বর্ণনা পাই বাণিজ্য যাত্রার। এতদ্ব্যতীত বহুবিবাহ প্রথা, তৎসূত্রে সতীন প্রথায় পরিবার জীবন কলুষিত হওয়ার প্রসঙ্গ, বাঙ্গালীর মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাত্রার পরিচয় মেলে বহুপুত্র কামনার মাধ্যমে। 'অতএব ব্রতকথাগুলির সমাজ চিত্রের একটি ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না।' শুধু ঐতিহাসিক মূল্যই বা কেন, 'প্রাগৈতিহাসিক কিংবা আদিম সমাজের বহু উপকরণ ইহাদের মধ্য দিয়া আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে নরবলি ও ঐন্দ্রজালিক শক্তি (Magical power)-তে বিশ্বাস অন্যতম'। আদিমকালে মানুষের যে কতখানি বৃক্ষ নির্ভরতা ছিল, তারও হদিস দেয় ব্রতকথাগুলি। কাব্য ও ভাষাতত্ত্বের নিরিখেও আমাদের ব্রতকথাগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়। আমাদের গদ্য কবিতার আদিম ছাঁদ যেমন ব্রতকথাগুলিতে মেলে, তেমনি একান্তভাবে মুখের ভাষার অবিকৃত রূপেরও সন্ধান দেয় ব্রতকথাগুলি। 'যম পুকুরের কথা' থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কিছু অংশ উদ্ধার করে দেওয়া হল---

উদ্ধবেরা মাটি, পোটি, ঝিটি ঘরকন্না করেন, থাকেন, একদিন গিন্নী যাবেন গঙ্গার স্নানে, জয়াকে বললেন, এই দ্যাখ জয়া আমার এই ঢেঁকিটা, কুলোটা, ডালাটা, নাউ ডগাটা, পুঁই

ডগাটা কাউকে কিছু দিসনি, এই বলে তিনি গঙ্গাব স্নানে গেলেন। এদিকে জয়া যে যা চেয়েছে তাকে তাই দিয়ে বসে আছে। গিন্নী গঙ্গা থেকে এসে বললেন, আমি যা বাবণ কবে গেছি, তাই কবে বসে আছিস্। কাল সকালে যাব মুখ দেখবো, তাব সঙ্গে তোব বিয়ে দোবো। এদিকে কতক বাত পুইয়েছে কতক বাত পোযায নি, ধর্মবাজ নিবঞ্জন কানে শুনলেন, ছেঁড়া পুঁথি নিয়ে এসে কপাট ঠেসে পড়ে বইলেন। উদ্ধবেব মা ছড়া ঝাঁট দিতে এসে দেখেন—না দোব গোড়ায কে শুযে। "কে গো। সবনা, নড়না, ছড়া ঝাঁট দিই, বেলা হযে গেল।" আমি সরব না; নড়ব না আগে যা সত্যি কবেছ পালন কব। কি সত্যি কবেছি কি প্রতিপালন কর্বো? কাল জযাবতীকে বলেছিলে—কাল সকালে উঠে যাব মুখ দেখবো, তাব সাথে তোব বিয়ে দোবো—আমাব মুখ দেখেছ, আমাব সাথে জযাব বিয়ে দাও। বাপ্‌বে বাপ্, বাগে দুঃখে ঝি বউকে কে কিনা বলে? তা বলে কি তাই পালন কবতে হয়? তিনি বললেন হাঁ তাই কবতে হবে (মেয়েলী ব্রতকথা, সুহাসিনী দেবী)। বাক্‌বীতিব বিশেষ বীতিটি এখানে প্রাণবন্ত। মৌখিক উচ্চাবণটুকুও অবিকৃত থেকেছে, ফলে ভাষা হযে উঠেছে জীবন্ত, বলিষ্ঠ।

ব্রতকথাব গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনাব পব আমবা ব্রতকথাব কযেকটি সাধাবণ বৈশিষ্ট্যেব সম্পর্কে উল্লেখ কবব। এগুলি একান্তভাবে মেযেদেব মৌখিক বচনা হলেও প্রকৃতিতে Rigid অনমনীয, কেন না এব একটা আনুষ্ঠানিকতাব দিক আছে। রূপকথা কিংবা পশুকথা যে কেউ যে কোনো সময়ে বলতে পাবে বা শুনতে পাবে। কিন্তু ব্রতকথা নির্দিষ্ট ব্রতেব আযোজনেব সঙ্গেই সম্পর্কান্বিত। নির্দিষ্ট উপলক্ষ্য ব্যতিবেকে এব আবৃত্তি হয না। আনুষ্ঠানিকতাব কাবণেই এব বক্তব্য নির্দিষ্ট। তাছাড়া অলৌকিকত্বে ব্রতকথাব জুড়ি মেলা ভাব। ব্রতকথাব সূচনা হয অত্যন্ত সাধাবণভাবে, কোনো নাটকীযতাকে প্রশ্রয দেওয়া হয না। ব্রতকথায উপস্থাপিত চবিত্রগুলি মূলতঃ নির্বিশেষ। 'আলদুর্গাব ব্রতে'ব কথায বলা হয়েছে; ঠাকুব ঠাকরুণেব পাশা খেলায কাব হাব কাব জিৎ সেই সম্পর্কে এক বামুন একজনের জিৎ বলেছে। ঠাকুবেব সাপে বামুন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এলেন। কিন্তু এই অভিশাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণটিব নাম উল্লিখিত হযনি। কুলী মঙ্গলবারের কাহিনীটি শুরু হয়েছে এইভাবে, একছিল বেনে সদাগব তার সাত ছেলে সাত বৌ ঘব সংসাব কবে থাকে...। এখানেও সওদাগরটি অনামা থেকে গেছে। সচবাচর ব্রতকথায দুর্ভাগ্যেব চিত্র নির্দেশ কবাব সময়ে অবলম্বন কবতে দেখা গেছে ব্রাহ্মণকে, অপবদিকে সৌভাগ্য সুখের আধার করে রূপাযিত কবা হয়েছে রাজা অথবা সওদাগবকে। যদি বুড়ী চরিত্রেব অবতাবণা কবা হয়, তবে তাকে দেখা যায দুর্ভাগাবতী রূপে, অপবপক্ষে ছোট বউ বা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ লোভী ও অনাচাবী হয়ে থাকে, অবশেষে দেবতাব অনুগ্রহ লাভ কবে কেবলমাত্র যে তাব চবিত্রগত এই সকল দুর্বলতা জয কবে তাই নয—সর্বাধিক সৌভাগ্যেব অধিকাবিণী হয।

আমরা এইবার কয়েকটি ব্রতকথার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখব, তাহলেই ব্রতকথার তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সহজে বোঝা যাবে। নীল ষষ্ঠীর কথায় বলা হয়েছে এক হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কথা যারা পাঁচ পাঁচটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান লাভ করেও সন্তান হারানোর বেদনার শিকার হয়েছিল তাদের অকাল মৃত্যুর কারণে। শেষে কাশীধামে গিয়ে তারা সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে আবির্ভূত ষষ্ঠীর কাছে সন্তান রক্ষাকবচ লাভ করে। নীল ষষ্ঠী করে তারা সন্তানাদি লাভ করল। মৃতবৎসা হওয়ার বেদনা দূরীভূত হল। এই ব্রতকথায় সন্তান লাভের যেমন পথ নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে, তেমনি তাদের রক্ষা করার রহস্যও ভেদ করা হয়েছে। ব্রতকথায় কিরূপে ব্রত পালন করতে হয় তারও হদিস দেওয়া থাকে। নীল ষষ্ঠীর কথায় সন্ন্যাসিনী বেশিনী ষষ্ঠীর মাধ্যমে সেই হদিস প্রদত্ত হয়েছে—সমস্ত চৈত্রমাস সন্ন্যাস করে প্রত্যহ শিবপুজো করবে। তারপর সংক্রান্তির আগের দিন সমস্ত দিনের বেলা উপবাস করে সন্ধ্যার সময় নীলাবতীর পুজো করে, নীলকণ্ঠ শিবের ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে, মা ষষ্ঠীকে প্রমাণ করে, তবে জল খাবে। ঐ দিনকে নীল ষষ্ঠীর দিন বলে। নীল ষষ্ঠী করলে মা ষষ্ঠীর দয়া হতেই হবে। একটা প্রত্যক্ষতা এই উপদেশে, আশ্বাসে উপস্থিত লক্ষ্য করা যায়।

অশোক ষষ্ঠীর দিন অশোকা যে মুগসেদ্ধ খেয়েছিল, তাতে খই পড়েছিল, সেই খাওয়ায় তার সর্বনাশ হয়। ছেলের অকাল মৃত্যু হয়। 'অশোক ষষ্ঠী'র কথায় শোক অতিক্রমণের পরামর্শ প্রদত্ত হয়েছে—চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন মা ষষ্ঠীর পূজা দিয়ে মুগ কলাইয়ের সঙ্গে অশোকফুলের কলি নিয়ে অশোকার যেভাবে বিপদ অন্তর্হিত হয়েছিল সেই কাহিনী বলার পরামর্শ দান করা হয়েছে। ব্রত কথায় যে অসম্ভবের সীমারেখা মানা হয়নি তার প্রমাণ অশোক ষষ্ঠীর কথায় হরিণী কর্তৃক কন্যা সন্তান প্রসবের কথা বলা হয়েছে যেমন, তেমনি মুনির কমণ্ডলুর জলে মৃত সন্তানাদির পুনর্জীবন লাভ ঘটেছে—তাও উল্লিখিত হয়েছে।

শীতল ষষ্ঠীর কথায় বর্ণিত হয়েছে শীতল ষষ্ঠীর দিন গরম জলে স্নান করায়, গরম ভাত খাওয়ায় ব্রাহ্মণীর পুত্র, পৌত্র, পৌত্রবধূ, কর্তা এমনকি বাড়ীর গৃহপালিত পশুগুলির পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে। শেষে মা ষষ্ঠীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণীকে পরামর্শ দান—নাত বউদের পাতা শীতল ষষ্ঠীর গায়ে যে দই হলুদ আছে, তা এনে কুকুরের কপালে ফোঁটা দিতে হবে এবং তার পর অন্য সকলের কপালে ফোঁটা দিতে হবে, তাছাড়া হলুদ ছোপানো সুতো নাতিদের হাতে তাগার মত করে বেঁধে দেবার পরামর্শও ষষ্ঠী দিলেন। ব্রাহ্মণী তদনুযায়ী আচরণ করায় সকলে পুনরায় জীবিত হল। শীতল ষষ্ঠীর কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হল। কথাতে বলা হয়েছে, 'দই পান্তা গোটাসিদ্ধ খেয়ে শীতল ষষ্ঠী করতে হয়। সেদিন গরম ভাত খেতে নেই।' এইভাবে প্রতিটি ব্রত কথাতেই নির্দিষ্ট সমস্যা যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি তার সমাধানও বাতলে দেওয়া হয়েছে। ব্রতকথাগুলি তাই শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি।

	ব্রতকথার নাম	কোন মাসে ব্রতটি অনুষ্ঠিত হয়	উপস্থাপিত মনুষ্য চরিত্রের শ্রেণী পরিচয়
১.	ভাদ্র মাসের লক্ষ্মী পূজাব কথা (পেঁচা-পেঁচীব গল্প)	ভাদ্রমাস	বিধবা ব্রাহ্মণী, তাব পুত্র, গয়লা
২.	কার্তিক মাসেব লক্ষ্মী পূজাব কথা	কার্তিক	বাজা, বাজকন্যা, দবিদ্র ব্রাহ্মণ, কবিরাজ, মন্ত্রী
৩.	পৌষ মাসের লক্ষ্মী পূজাব কথা	পৌষ	ব্রাহ্মণী, পুত্র ও কন্যা সন্তান
৪.	চৈত্র মাসেব লক্ষ্মী পূজাব কথা	চৈত্র	ব্রাহ্মণ, পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ
৫.	কোজাগবী লক্ষ্মী পূজাব কথা	আশ্বিন	বাজা, কামাব, বাণী, বাঁধুনী
৬.	ক্ষেত্রব্রত কথা	অগ্রহায়ণ	ব্রাহ্মণ পুত্র, ব্রাহ্মণী, মামা, মাসী, জমিদার, দাসী
৭.	যমপুকুব ব্রতকথা	কার্তিক	বুড়ী, তার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ
৮.	বাবমেসে অমাবস্যাব কথা		ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ পুত্র, পুত্রবধূ, ব্রাহ্মণী

ব্রতকথার অলৌকিকত্ব	ব্রতের উদ্দেশ্য	পরিণতি	মনুষ্যেতর প্রাণীর পরিচয়
পেঁচীর পিঠে চড়ে ব্রাহ্মণ তনয়ের লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে উপস্থিত হওয়া, তিলধুবড়ি পূজা করে অতুল ঐশ্বর্য লাভ, স্বর্গ থেকে রথের আগমন।	ঐশ্বর্য লাভ	ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ, দারিদ্র্য দূরীভূত	পেঁচা-পেঁচী
ব্রাহ্মণ কন্যার গৃহে লক্ষ্মীর আগমন, লক্ষ্মীর কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য লাভ	ঐশ্বর্য লাভ	ব্রাহ্মণ কন্যা গরীব ঘরে পড়েও ধনী হল, রাজা সম্পদ হারিয়ে শেষে পুনরায় লক্ষ্মীর কৃপায় সমস্ত কিছু ফিরে পেলেন।	সর্প, পেঁচা
কেউটে কেটে হাঁড়িতে চড়িয়ে জ্বাল দেওয়ায় সোনার ফেনা উঠল।	ঐশ্বর্য লাভ	দরিদ্র ব্রাহ্মণীর পরিবারের দুঃখ দূর লক্ষ্মীর কৃপায়।	কেউটে
গঙ্গায় পাঁচকড়া কড়ি নিক্ষিপ্ত হলে লক্ষ্মীর তা গ্রহণ, ডালিম গাছের তলায় পোঁতা ভাত তরকারীর সোনায় রূপান্তরিত হওয়া	ঐশ্বর্য লাভ	দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের দুঃখ দূর, মেজবউ-এর মৃত্যুবরণ।	কেউটে
পিঁপড়েদের কথোপকথন, রাজার কীট পতঙ্গের কথা শোনার ক্ষমতা।	ভাগ্য লক্ষ্মী, যশঃ লক্ষ্মী, কুল লক্ষ্মীর কৃপা লাভ	রাজার অলক্ষ্মী কিনে ভাগ্য বিপর্যয়, রাণীর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজায় পুনরায় রাজলক্ষ্মীর কৃপা লাভ।	পিঁপড়ে, ছাগল
একদিনেই ধানের গাছ হওয়া, সোনার ধান ফলা।	ঐশ্বর্য লাভ	বিস্তর ঐশ্বর্য লাভ, মামা-মামীর ভাগ্য বিপর্যয় এবং পুনরায় সৌভাগ্য লাভ।	গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া।
নরককুণ্ডে মানুষের শাস্তিভোগ, বধূর ব্রতের কারণে নরক থেকে শাশুড়ীর মুক্তি লাভ।	যমের তাড়না থেকে মুক্তিলাভ	যে বুড়ী পুত্রবধূকে যমপুকুর ব্রত করায় বাধা দিয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, পুত্রবধূ শাশুড়ীর সঙ্গে ব্রত করায় তার মুক্তিলাভ	কাক, বক, চিল
স্বর্গ থেকে পুষ্প রথের আগমন, মুক্ত থেকে মুক্ত গাছের আত্মপ্রকাশ, সূর্যের ব্রাহ্মণপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ।	সূর্যের করুণা লাভ	ব্রাহ্মণপত্নী ও তার পুত্রবধূর সূর্যলোক যাত্রা	

৯.	জিতাষ্টমীর ব্রতকথা	আশ্বিন মাস	রাজা, রাণী, রাজপুত্র, রাজকন্যা
১০.	বালদুর্গার ব্রতকথা	অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন	ব্রাহ্মণ, রাজকন্যা, রাজবৃন্দ, কোটাল
১১.	ইতুর কথা	অগ্রহায়ণ মাস	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকন্যা, রাজা, পাত্র, হাড়িনী
১২.	নাটাই ষষ্ঠীর কথা	পৌষ মাস	ব্রাহ্মণী, পুত্রবধূ ধোপানী
১৩.	শীতল ষষ্ঠীর কথা	মাঘ মাস	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র, পুত্রবধূ
১৪.	অশোক ষষ্ঠীর কথা	চৈত্র মাস	মুনি, রাজপুত্র, রাজপুত্রের পুত্র-কন্যা, কামার
১৫.	নীল ষষ্ঠীর কথা	চৈত্র মাস	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী
১৬.	সুয়োদুয়োর	পৌষ মাস	সওদাগর সন্তানাদি ডাকাত, পুত্রবধূ, সওদাগর ভগ্নী, ডাকাত জননী, ডাকাত পত্নী

পুত্ররূপে শালিবান ও সুশীলার জন্মগ্রহণ	সন্তান লাভ	জীমূতবাহনের স্ত্রী ব্রতকরায় সন্তানাদি লাভ করল	
নারায়ণের অভিশাপে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠরোগীতে পরিণত হওয়া, ব্রাহ্মণের কঙ্কাল মূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া, সশরীরে সকলের স্বর্গলাভ।	ইচ্ছাপূরণ	রাজকন্যার সুখে ঘরসংসার করা সম্ভব হল, স্বামী নিরাময় হল, ঐশ্বর্য হল, সন্তান লাভ হল	
বৃক্ষের বিদীর্ণ হয়ে আশ্রয়দান, পুকুরের জলের আকস্মিকভাবে শুকিয়ে যাওয়া, দূর্বার আংটির কারণে পুকুরে জল হওয়া, ভাঁড়ের অফুরন্ত জলদানের ক্ষমতা, নিজের থেকে ব্রাহ্মণের ঘরে ফিরে আসা, উমনোর গমন পথে মড়া পড়া, আগুন লাগা, সোনার পিঁড়ির লোহায় পরিণত হওয়া, ইতুকে অপমান করায় ব্রাহ্মণের সর্বস্ব হারানো, হাড়িনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ।	সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য লাভ, ঐশ্বর্য লাভ, সন্তান লাভ	রাজা, ব্রাহ্মণ পুত্র এবং হাড়িনীর সকলের স্বর্গ গমন	বাঘ, ভাল্লুক কুকুর
	মৃত বৎসার সন্তান জীবিত থাকে	ব্রাহ্মণীর পুত্রবধূর সন্তানাদি লাভ	-
লাউয়ের মত থলে প্রসব করে বধূ, তাতে ষাটটি পুত্র সন্তান; ষষ্ঠীর গায়ের দই হলুদ নিয়ে ছেলে পুলেদের কপালে ফোঁটা দিতেই তাদের জীবন লাভ .	সন্তান লাভ, তাদের দীর্ঘ জীবন লাভ	ব্রাহ্মণের পুত্র ও পুত্রবধূর ষাটটি পুত্র সন্তান লাভ	বেড়াল, কুকুর, গরু
হরিণীর মানব কন্যা সন্তান প্রসব, মুনির কমণ্ডলুর জলে মৃত পুত্র স্ত্রী পৌত্রাদির জীবন লাভ	শোকমুক্ত হওয়া	অশোকার রাজাকে পতি রূপে লাভ এবং সুখে ঘর সংসার করা	হরিণী
-	সন্তান লাভ এবং তার অকাল মৃত্যু হয় না	ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর সন্তানাদি সহ সুখে ঘর-সংসার করা	-
	বিপন্মুক্তি, পাপ ক্ষয়	ডাকাতের ভালো হওয়া, দীর্ঘ ব্যবধানের পর সওদাগর পুত্রদের সঙ্গে ভগ্নীর মিলন	

সাধারণভাবে গৃহস্থ মানুষের যেসব দুর্বলতা থাকে, থাকে যেসব সমস্যা কিংবা চাহিদা, ব্রতকথাগুলিতে সেই সব দুর্বলতার কথা, সমস্যার প্রসঙ্গ এবং সমাধানেও নির্দেশ প্রদত্ত হওয়ায় শেষপর্যন্ত এগুলির মানব রসই মুখ্য হয়ে উঠেছে, ধর্মীয় ব্যাপারটি প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। ব্রতকথাগুলিতে দেখি দেবতাদের চাহিদা যৎসামান্য—উপবাস, নির্দিষ্ট দিনে কিছু আচার পালন আর ব্রতিনীর কিছু বিশ্বাস ও ভক্তি।

কম বেশি taboo বা নিষেধাজ্ঞা ব্রতকথাগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। অবশ্য ষষ্ঠীর ব্রতকথায় অনেকগুলি নিষেধাজ্ঞা জাহির করা হয়েছে—(ক) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে ভাত খাওয়া বারণ; (খ) ছেলেদের বাম হাতে মারা নিষেধ; (গ) ছেলেদের মৃত্যু হোক—এমনতর গালাগাল দেওয়াতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে; (ঘ) বিড়ালকে লাথি মারাও নিষেধ করা হয়েছে। 'যমপুকুর ব্রতকথা'য় যমপুরীর দক্ষিণ দুয়োরের দিকে তাকাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অনেক সময় পরোক্ষেও উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে, বলা হয়েছে অন্যায় করলে তার উপযুক্ত শাস্তি লাভ ঘটবে। নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথায় দেখি সওদাগরের দ্বিতীয়া পত্নী তার সতীন সন্তানদের উপর অবিচার করেছিল। তাছাড়া স্বামীর উপার্জিত সম্পদের কিয়দংশও সে আত্মসাৎ করেছিল, পরিণামে তাকে পাতকুয়ায় পড়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

সবশেষে লোককথার মটিফ কেমন করে ব্রতকথাতেও লভ্য, তারই কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হবে। 'সঙ্কটা ব্রতকথা'য় দক্ষিণ দিকে দরজা খুলতে নিষেধ করা হয়েছে, এ হল taboo'র নিদর্শন; সবাক কঙ্কাল, কনিষ্ঠা রাণীর শঙ্খ প্রসব, রক্তের সাহায্যে পুনর্জীবন লাভের ঘটনা কিংবা ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন শঙ্খ এসবই লোককথার সহজলভ্য মটিফের নিদর্শন। যমপুকুরের কথায় উদ্ধবের মা পুত্রবধূকে যমপুকুর ব্রত করতে বিশ্রী ভাবে বাধা দেওয়ায় মৃত্যুর পর তার অবর্ণনীয় নরক যন্ত্রণা ভোগ deeds punished মটিফের নিদর্শন; সোদো ষষ্ঠীর কথায় দেখি উদ্ধব ডাকাতদের হাত থেকে বেঁচে গেছে, আসলে এ'টি হল Deeds Rewarded মটিফের নিদর্শন। ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীর কথায় পেঁচা পেঁচীকে গরীব ব্রাহ্মণীর পুত্রকে সাহায্য করার ভূমিকায় দেখা গেছে যা কৃতজ্ঞ প্রাণী বা 'grateful animals' মটিফের নিদর্শন। 'ইতুর কথা'য় দেবকন্যাদের প্রদত্ত দূর্বার আংটির কারণে জলশূন্য পুকুর জলে পূর্ণ হয়ে গেছে, যা ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার পরিচয়কে 'Manifestation of magic power' প্রকাশ করেছে। অশোক ষষ্ঠীর কথায় সন্ন্যাসী প্রদত্ত কমণ্ডলুর জলে অশোকার মৃত পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রাদির পুনর্জীবন লাভও কথারই একটি বিশিষ্ট মটিফ। শীতল ষষ্ঠীর কথায় ব্রাহ্মণীর পুত্রবধূ যে এক সঙ্গে ষাটটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, তা Mutiple Birth মটিফের নিদর্শন।

১৬৬ পাতায় ছকের সাহায্যে কয়েকটি ব্রতকথার চরিত্র উপস্থাপিত করা হল—

অধ্যায়/আট

লোকক্রীড়া: সুলভ উপাদান নির্ভর অনাড়ম্বর বিনোদন

যাকে আমরা ইংরেজীতে Folk Games বলি, তারই ইংরেজী translation loan করে আমরা বাংলায় করেছি লোকক্রীড়া। আপাতভাবে মনে হবে যান্ত্রিকভাবে তো ক্রীড়া সম্পাদন হয় না। যে কোন ক্রীড়ার জন্য প্রয়োজন লোকের বা খেলোয়াড়ের। খেলা তো নিজে নিজে হয়না। উপকরণের প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে খেলোয়াড়ের প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায়না। এতে ব্যবহৃত উপাদান তো জড়। খেলোয়াড়ের সাহায্যে সেই জড় প্রাণ লাভ করে। দর্শকদের মনোরঞ্জন করে খেলা হয়ে ওঠে জীবন্ত। আমরা জানি খেলার নানা শ্রেণী বিভাগ। যেমন ঘরের ভেতরকার খেলা যা Indoor games নামে পরিচিত, তেমনি ঘরের বাইরের খেলার পরিচিতি Outdoor games নামে। এছাড়া ছেলেদের কিছু নিজস্ব খেলা আছে। তেমনি মেয়েদেরও কিছু নিজস্ব খেলা আছে। তবে যত দিন যাচ্ছে ততই ক্রীড়ার জগতে এই সেক্সুয়াল ডিভিশন লোপ পাচ্ছে। তাই দেখি যে ফুটবল, ক্রিকেট বা হকি একান্তভাবে পুরুষ খেলোয়াড়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এখন দিব্যি এগুলি নারীদেরও খেলা হয়ে উঠেছে। আমাদের আলোচনার বিষয় কিন্তু কোন সাধারণ বিষয় নয়। বিষয় লোকক্রীড়া, যে খেলাগুলি একান্তভাবে দেশীয়। শব্দ ভাণ্ডারের দেশী শব্দের মতো যে খেলাগুলির শিকড় ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুক্ত বা সংশ্লিষ্ট নয়। অবশ্য একই রূপ খেলা ভিন্ন দেশে থাকতেই পারে। যে খেলাগুলিতে উপকরণের প্রাচুর্য খুবই কম, যে উপকরণ লাগে তা একান্তভাবে দেশীয় ও সুলভ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে খেলায় যৎসামান্য উপকরণেই কাজ চলে যায়, যে খেলা চরিত্রে খুব জটিল নয়, যে খেলায় স্বর্গীয় আনন্দলাভ করে দর্শক এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়, এমন খেলাকেই আমরা লোকক্রীড়া বলব। লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্যের মতো লোকক্রীড়াও আঞ্চলিকতা ধর্মে বিশিষ্ট। লোকক্রীড়াগুলির পরিচিতি অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ। তবে হাডুডু বা বুড়ি বসন্তের মতো কিছু খেলা আছে যেগুলি অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভের ফলে বিস্তৃততর অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেছে।

আমরা জানি ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলায় বহু নিয়ম কানুন এবং এই সব খেলার নিয়ম কানুন লিখিত ভাবে রক্ষিত হয়। এগুলি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। লোকক্রীড়ার নিয়ম আছে কিন্তু লিখিতভাবে কোথাও নেই। এই নিয়ম মুদ্রিত হয়ে আছে অঞ্চল বিশেষের মানুষের মনে। আরও বিস্তারিত ভাবে বলতে হয় খেলোয়াড়দের মনে।

লোক ক্রীড়ার উদ্ভব, পরিচিতি, অনুশীলন সব কিছুই গ্রামীণ সমাজে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে বিশেষত রাস্তা-ঘাটের মাধ্যমে রেল অথবা বাসের কারণে গ্রামের সঙ্গে শহরের ঘনিষ্ঠ যোগ সূত্র রচিত হবার ফলে গ্রামের মানুষ শহরের আদর

কায়দা, বিনোদন প্রক্রিয়া, সাজ পোষাক, আচার আচরণে অনেক বেশি আকৃষ্ট হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মনে হতে পারে আজও বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমগুলির সুদূর প্রসারী প্রভাব সত্ত্বেও উপকরণ নির্ভর খেলার জনপ্রিয়তাকে মেনে নিলেও লোকক্রীড়ার চল এখনও গ্রাম বাংলার নানা স্থানে আছে। অবশ্যই আগের মতো তার প্রসার বা জনপ্রিয়তা নেই।

মানুষ মাত্রই বৈচিত্র্যময় জীবনের স্বাদ লাভে উন্মুখ। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে মানুষ আনন্দলাভের সুযোগ পেত কদাচিৎ। বয়স্ক মানুষ যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, পাঁচালীগান, কবির লড়াই ইত্যাদি থেকে মনের রসদ সংগ্রহ করতেন যেমন, অপর দিকে অল্প বয়সীরা আনন্দের খোরাক পেত মূলতঃ লোকউৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায়, পূজাপার্বণে এবং সর্বোপরি লোকক্রীড়ায়। এই লোকক্রীড়ার মধ্যদিয়ে গ্রামীণ মানুষ শুধু মনের আনন্দ পেত তাই নয় অনেকক্ষেত্রে স্বাস্থ্য চর্চারও সুযোগ পেত। আমরা লোক ক্রীড়াগুলির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করব।

(ক) অধিকাংশ লোক ক্রীড়ায় প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ সহজবোধ্য। গ্রামে তো আর শহরের মতো স্থানাভাব নেই ফলে খোলা মেলা পরিবেশে তারা খেলার অবকাশ পায়।

(খ) ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল ইত্যাদি পাশ্চাত্যদেশাগত খেলাগুলির আমরা তেমন কোন নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাইনা। কিন্তু আমাদের দেশীয় খেলাগুলির বিশ্লেষণে ফেলে আসা অতীতের বহু স্মৃতির সাক্ষাৎ মেলে। অর্থাৎ লোকক্রীড়াগুলি বিশ্লেষণ করলে আমাদের সভ্যতার ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লাভ সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা হাডুডু খেলাটির উল্লেখ করতে পারি। হাডুডু খেলায় দুটি পক্ষ অংশগ্রহণ করে। এক একটি পক্ষ আদিমকালের এক একটি গোষ্ঠীর দ্যোতক। আমরা জানি এই খেলায় এক এক দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের সীমানাতেই নিরাপদ থাকে। অন্য দলের খেলোয়াড় যখন প্রতিপক্ষের সীমানা অতিক্রম করে প্রতিপক্ষ দলের কোটে হাজির হয় তখন তাকে ধরবার জন্য প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা সচেষ্ট হয়। এতো আসলে গোষ্ঠী সংগ্রামের ইঙ্গিতবাহী। আদিমকালে এক একটি গোষ্ঠী নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে অবাধে চলাফেরা করত। কিন্তু গোল বাধত যখন অন্যগোষ্ঠীর মানুষ তাদের সীমানা বৃদ্ধির জন্য অন্যের সীমানায় প্রবেশ করে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে সচেষ্ট হতো। তাই হাডু . খেলা আসলে ভূমির উপর অধিকার কায়েম উপলক্ষে বিরুদ্ধগোষ্ঠীর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। আমরা এও জানি একপক্ষের খেলোয়াড় যদি প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে নিজের দম অটুট রেখে প্রতিপক্ষের আক্রমণ পর্যুদস্ত করে নিজের কোটে ফিরে আসতে সক্ষম হয়, তবে যাকে স্পর্শ করে ফিরে এলো সে মোড় হয়। মোড় মানে মৃত, অর্থাৎ ঐ খেলোয়াড় বসে যায়। বিপরীত ক্রমে যে দলের খেলোয়াড় সফলভাবে মোর করে ফিরে এলো সেই দলে মোড় হওয়া একটি খেলোয়াড় পুনরুজ্জীবিত হয়। প্রাচীনকালের মানুষ বিশ্বাস করতো যে একজনের প্রাণের সাহায্যে অন্যকে জীবিত করে তোলা সম্ভব। সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন এই খেলায় লক্ষিত হয়। কিংবা ধরা যাক জনপ্রিয় ডাণ্ডাগুলি খেলার কথা। এতে উপকরণ একটি ডাণ্ডা অন্যটি গুলি। একটি নির্দিষ্ট স্থানকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে

গর্ত করে তার উপরে বসিয়ে দেওয়া হয় গুলিটি। এরপর ডাণ্ডের সাহায্যে গুলিটিকে বলপ্রয়োগ করে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। এই খেলায় প্রজনন ক্রিয়ার প্রতিফলন লক্ষিত হয়।

(গ) সাধারণত লোকক্রীড়াগুলি দীর্ঘ মেয়াদী হয়না, স্বল্পমেয়াদী। অর্থাৎ এ খেলাগুলি স্বল্প স্থায়ী।

(ঘ) লোক ক্রীড়ায় উপকরণ ব্যবহারের প্রাচুর্য তেমন চোখে পড়ে না। অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদান অবলম্বন করতে দেখা যায়। নতুবা সহজ লভ্য উপাদান নিয়ে লোক ক্রীড়ার আয়োজন হয়।

(ঙ) লোকক্রীড়ায় খেলা পরিচালনার জন্য তেমন কোন খেলা পরিচালকের প্রয়োজন হয়না। অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়রাই পরিচালনা করে। বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হলে নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে।

(চ) এমন অনেক লোকক্রীড়া আছে যেগুলিতে উপাদান স্বরূপ লাগে কিছু ছড়া বা দেহের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যেমন—ইকির মিকির চাম চিকির কিংবা আগডুম, বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে। এদুটি খেলার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় ছড়ার আবৃত্তি আর হাতের কর বা হাঁটু।

(ছ) ন্যূনতম সংখ্যক খেলোয়াড় নিয়েও লোকক্রীড়া আয়োজিত হতে পারে। যেমন—ইকির মিকির চাম চিকির। কিংবা আগডুম বাগডুম ছড়া ভিত্তিক খেলায় দুজনের অংশ গ্রহণ যথেষ্ট, অন্তত খেলা চালাবার জন্য।

(জ) আমরা বেশ কিছু লোকক্রীড়ার সন্ধান পাই যেগুলি দম ভিত্তিক যেমন—হাডুডু বা চু কিত্ কিত্।

(ঝ) বেশ কিছু লোকক্রীড়াতে আমরা একদিকে যেমন বাস্তব জীবনের প্রতিফলন লক্ষ্য করি তেমনি কল্পনার ছাপও বেশ কিছু খেলায় মেলে। যেমন—রাখাল বাঘ খেলায় রাখাল বালকেরা গৃহপালিত পশু চালনার সূত্রে বনাঞ্চলে বা চারণভূমিতে যায়। এই সুবাদে ব্যাঘ্র বা তজ্জাতীয় ভয়ঙ্কর প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। বাস্তবে এমনতর অভিজ্ঞতাও ঘটে। এই খেলায় তাই দেখা যায় একজন খেলোয়াড় বাঘের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অন্যান্যরা গাছের শাখায় উঠে বসে থাকে বাঘের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে। এখানে আমরা বাস্তব এবং কল্পনা দুয়ের সমন্বয় ঘটতে দেখি। একজন খেলোয়াড়কে বাঘ বলে কল্পনা করা এবং বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনায় বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করে আত্মরক্ষায় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ খেলা প্রসঙ্গেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

(ঞ) বহুলোকক্রীড়াই অভিনয়ধর্মী। অভিনয় মানেই তো অনুকরণ বা imitation যার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পণ্ডিতেরা তাই সঙ্গত ভাবেই লোকনাট্যের উদ্ভবে নানাবিধ কারণের মধ্যে লোকক্রীড়াকে অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

(ট) লোকক্রীড়ার চরিত্র নির্ধারণে ক্রীড়ার প্রয়োজনে পরিকল্পনায় পরিবেশ প্রভাবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যে বিশেষ বিশেষ লোকক্রীড়ার উদ্ভব ও প্রচলন তা

আমাদেব পূর্ব বক্তব্যেই প্রমাণিত। যেমন ধবা যাক জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ খেলাটি। কোন পার্বত্য অঞ্চলে বা মরুভূমি অঞ্চলে এইরূপ খেলা সম্ভব নয়। কেননা কুমীর ও বাঘের অস্তিত্ব যে অঞ্চলে নেই সে অঞ্চলেব মানুষ বাঘ ও কুমীবকে চবিত্র কবে কোন খেলাব কথা ভাবতে পাবে না। আমাদেব সুন্দব বনেব বাঘ বা তৎসন্নিহিত নদীগুলিতে কুমীরেব প্রাচুর্য এই রূপ খেলাব প্রেবণা জুগিয়েছে।

(ঠ) পবিশীলিত খেলাগুলি মূলতঃ ব্যয বহুল। তাই ইচ্ছা কবলে সকলেব পক্ষে পবিশীলিত খেলায অংশ গ্রহণ সম্ভব হযনা। যেমন—পোলো খেলা। এটি মূলতঃ বাজা রাজড়াদেব খেলা, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পবিবারেব কেউ একপ খেলায অংশ গ্রহণেব কথা ভাবতে পাবে না। কিন্তু সে তুলনায় লোকক্রীড়া মোটেই ব্যয়বহুল নয। এই খেলায় প্রায় মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পবিবাবেব অথবা ধনী পবিবাবেব সকল সন্তানাদিব অবাধ সুযোগ।

(ড) পবিশীলিত খেলাব একটি অপবিহার্য অঙ্গ হল প্রশিক্ষণ। ফুটবল হোক, ক্রিকেট হোক বা ভলি হোক অথবা হকি কিংবা বাগবী এসব খেলায খেলোযাড়দেব উপযুক্ত প্রশিক্ষণেব প্রযোজন। এসব খেলাব সঙ্গে প্রশিক্ষকেব প্রায ঘনিষ্ঠ যোগ। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য যেমন সংহত সমাজেব মানুষ দেখে শুনে শেখে, বিশেষ কোন প্রশিক্ষকেব ধাব ধাবেনা, তেমনি লোক ক্রীড়া সংহত সমাজের মানুষ শিশুকাল থেকে দেখেই শেখে। কোন প্রশিক্ষকেব কাছে কোন তালিম নেওযাব প্রয়োজন হযনা। ইদানীং কোন কোন লোকক্রীড়াব বহু প্রসাব ঘটাব ফলে তীব্র-প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক হযে ওঠার কাবণে ক্ষেত্র বিশেষে প্রশিক্ষণ প্রদত্ত হচ্ছে মাত্র। তাও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে।

শী বুড়ি

এই খেলা ছোট ছোট ছেলেমেযেদেব জন্য। এই খেলাতে অনেকেই অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীবা দুটি দলে ভাগ হয়ে যায।

পযসা দিয়ে লটাবীব মাধ্যমে (বেশীরভাগ দেখা যায় আঙুলে মাটি লাগিয়ে উল্টো দিক দিয়ে ধবে নির্ধাবণ করা হয়) নির্ধাবণ কবা হয় কাবা আগে খেলবে। মাঠেব মধ্যে দাগ কেটে একটা বড ঘব করা হয়, তাব থেকে প্রায ৩০ হাত দূবে (অনুমানে) আব একটি ছোট ঘব কবা হয। প্রথমে যাবা খেলবে তাবা নিজেদেব দলেব মধ্য থেকে একজনকে শী বুড়ি করে ঐ ছোট ঘরে রাখে। আব বাকিবা ঐ বড়ঘবে থাকে। এই খেলাতে উদ্দেশ্য হল যাবা প্রথমে খেলছে তাবা তাদেব শী বুডিকে ছোট ঘব থেকে বড ঘবে নিযে আসবে, সেই আনাব সময় পথকে নিবাপদ কবাব জন্য তাবা কুত্‌কুত্‌ শব্দ কবে বিপরীত পক্ষেব খেলোযাডকে মোব করবে।

নির্দিষ্ট সংখ্যক কুত্‌কুত্‌ শব্দ কবে (যেমন ১২ বাব) তাবমধ্যে তাদেব শী বুডিকে ঘবে আনে। আব যদি এই ১২ বাব চেষ্টা কবেও শী বুডিকে না আনতে পাবে, তাহলে তাকে ঘব ছেড়ে বেবোতে হয এবং তখন বিপরীত পক্ষেব খেলোয়াডবা মোব দেয়। আব যদি

শী বুড়িকে মোর দিতে না পারে (যখন শী বুড়ি তার বড় ঘরে দৌড়ে আসে) তাহলে বিপরীত পক্ষের খেলোয়াড়দের এক পাট্টি দেওয়া হয়। মোর দিলে বিপরীত পক্ষের খেলোয়াড়রা খেলার সুযোগ পায়। আর না পারলে যারা খেলছিল তারা আবার খেলবে।

এখানে শী বুড়িকে—সীতা বুড়িও বলা যেতে পারে বলে মনে হয়। কারণ রাবণদের হাত থেকে সীতা বুড়িকে রক্ষা করার চিত্র এই খেলাতে ফুটে ওঠে। এই খেলাকে আমরা সীতা হরণ খেলাও বলতে পারি।

সাতকড়ি খেলা

এই খেলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। এই খেলাতে সাতটি কড়ি লাগে (পাতলা গুটি)। একজন চোর হয়, তাকেই ঘিরতে হয়। এই চোর নির্ণয় হয় আঙুল ফুটিয়ে বা পাতাতে গিঁট দিয়ে। কোন ছড়ার মাধ্যমে হয় না। এবার অন্যরা একটা বল নিয়ে কিছু দূরত্বে একটি লাইন বা দাগ থেকে বলটাকে ছুঁড়তে থাকে কড়িগুলিকে লক্ষ্য করে। কড়িগুলি একে অপরের উপরে সাজান থাকে। বলছোঁড়ার মাধ্যমে কড়িগুলিকে এলোমেলো করে দেওয়ার পর চোর ছাড়া সবাই দৌড়ে পালায়। এবার চোর সেই বলটা ছুঁড়ে যে কোন একজনকে মোর করার চেষ্টা করে। যে খেলোয়াড়ের গায়ে বল লাগবে পরবর্তীকালে সেই চোর হবে। আর বল ছুঁড়ে ছোঁয়ার আগে অন্য খেলোয়াড়রা যদি কড়িগুলি সাজিয়ে দেয় তাহলে এক পাট্টি হয়। চোরের বল ছোঁড়ার সময় হাঁটাচলা চলবে না। অর্থাৎ বল হাতে থাকলে সেইখানে দাঁড়িয়েই বল ছুঁড়তে হয় যেকোন খেলোয়াড়কে উদ্দেশ করে।

বুড়িয়ানা খেলা

এই খেলাও মূলত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। এই খেলায় খেলোয়াড়রা ২টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। খেলাতে একটা পাথর লাগে। সেটাই হল বুড়ি আর মাটিতে একটা নৌকাকৃতির ঘর তৈরী করা হয়। একদল সেই ঘরের মধ্যে থাকে। আর একদল বাইরে থাকে। এই ঘরের বাইরে থাকে পাথর, সেটাই বুড়ি। এই বুড়িকে ঘরে আনার জন্য খেলা শুরু হয়। ঘরের প্রত্যেকে একবার করে সুযোগ পায় ঐ বুড়িকে আনার জন্য। আর বুড়িকে যখন নিতে যাবে তখন ঐ দাগের ভিতর থেকেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে হবে, [তখন ঐ খেলোয়াড়ের এক পা তোলা থাকবে] দাগের ভিতর থেকে যখন ঐ বুড়ি পাথরকে নিতে যাবে তখন বাইরের খেলোয়াড়েরা দাগের বাইরে থেকে ভেতরের খেলোয়াড়কে হাত বাড়িয়ে মোর দেওয়ার চেষ্টা করে। একজনকে মোর দিলেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। তখন বাইরের দল ভিতরে এসে খেলার সুযোগ পায়। আর ভিতরের দল যদি মোর না হয়ে পাথরটিকে তুলে আনতে পারে তাহলে তারা বাইরের দলকে এক পাট্টি দেয়।

দাড়িয়া বান্দা

এই খেলাতে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে। যতজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে তারা মোট দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক দলের যতজন খেলোয়াড় থাকে ততগুলি ঘর নিয়ে খেলা হয়। একদল প্রথমে ঘিরবে। তারা দাঁড়াবে পরপর পাঁচটি লাইনে। এবার বাকি দলটি Starting Point থেকে খেলা শুরু করবে। মোট পাঁচজন খেলোয়াড় এক এক করে পাঁচটি লাইন পেরিয়ে শেষ ঘরে গিয়ে পৌঁছায়। তারপর আবার একে একে পাঁচটি ঘর পেরিয়ে নিচে নেমে আসে। এইভাবে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের কাছে মোর না হয়ে সবাই ফিরে আসতে পারলে এক পাকা হয় (গেম)।

বিপক্ষ খেলোয়াড়েরা ৫টি লাইনে দৌড়াতে দৌড়াতে হাত বাড়িয়ে অপর দলের খেলোয়াড়কে মোর দেয়। মোর দিলে তারা খেলার সুযোগ পায়। খেলা আরেক প্রকারে নষ্ট হয়, যখন খেলোয়াড়েরা খেলতে খেলতে কেউ যদি ৫টি ঘরের একপাশ ঘুরে আবার অপর দিক দিয়ে ফিরে আসতে থাকে তখন যদি ঐ একই ঘর দিয়ে কোন খেলোয়াড় উপরে উঠতে থাকে তাহলে (up and down) তখন খেলা নষ্ট হয়ে যায়।

চোক্য চল

এই খেলা খুব বুদ্ধিদীপ্ত। ছোট থেকে বড় যেকোন বয়সের ছেলেমেয়েরা এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা মাত্র দুই জন। এই খেলা মাটিতে একটা ছক কেটে ছোট ছোট পাথরের মোট ১৮টি নুড়ি নিয়ে হয়। দুইজনে ৯টি করে নুড়ি নেয়।

ছকের দুদিকে দুজন খেলোয়াড় বসে। ধরলাম 'ক' এবং 'খ' দুজন ব্যক্তি খেলছে তারা ২টি নুড়ি একসঙ্গে ছকে না বসিয়ে পালা বদল করে ক একবার আর খ একবার নুড়ি বা গুটি বসাবে, এমনভাবে পরপর নুড়ি বা গুটি বসাবে যাতে বিপরীত গুটি বা নুড়িগুলি একে অপরকে খেতে না পারে, খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে ক কিংবা খ আগে বিপরীত গুটিগুলিকে অর্থাৎ ৯টি গুটি খেয়ে ফেললে, গুটি খাওয়ার নিয়ম হল যে ছকের রেখা বরাবর যে গুটিটি খাবে তা যেন সেই গুটির সামনের point বা বিন্দুতে থাকে। এবং পরবর্তী point গুটি শূন্য থাকে। অর্থাৎ Jumping পদ্ধতিতে, এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে যতগুটি থাকে সব খাওয়া যায়। যখন গুটি বিপদের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ বিপরীত পক্ষ খেয়ে ফেলতে পারে তখন তা সেই ছকের বাইরে বেরিয়ে অন্য ছকের আশ্রয় নেয়। এই খেলা মাঝখানে গুটি বসিয়ে খেলা যায় না।

কিড়িং কিড়িং খেলা

এই খেলায় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। এই খেলায় সাধারণত একাধিক সংখ্যক ছেলে ও মেয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। খেলার উপকরণ হিসাবে একটি বল ব্যবহৃত হয়। এই খেলার শুরুটা কোন ছড়া দিয়ে হয় না তার পরিবর্তে একটি নিয়ম দেখা যায়।

সেটি এই রকম---খেলায় অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তাদের মধ্যে একজন গোলের মধ্যে বলটা ফেলে দেয়। সেই বলটা ড্রপ দিতে দিতে যার পায়ে গিয়ে লাগে সেই চোর হয়। এইবার যে চোর হয় সে অপর খেলোয়াড়দের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে মারে, চোর কখনই ছুটে গিয়ে বল মারতে পারবে না। যদি কোন খেলোয়াড়ের গায়ে বল লাগে তবে সেও চোর হয়। এইরকম করতে করতে সমস্ত খেলোয়াড়কেই চোর করা হয়, কেবল একজন খেলোয়াড় বাদে। এবং এই শেষ খেলোয়াড়টিই রাজা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার যখন খেলা শুরু হয় তখন এই রাজাই গোল হয়ে দাঁড়ানোর মাঝে বল ফেলার অধিকারী হয়। এইভাবেই খেলাটি চলতে থাকে।

ফুলোনা খেলা

এই খেলা মূলত মেয়েদের খেলা। এই খেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দুই-এর বেশী, তারা দুটি দলে ভাগ হয়ে খেলাটি শুরু করে। এই খেলার উপকরণ রূপে পাথরের ৫টি নুড়ি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেকোন একটি দল এই খেলা শুরু করে। যে দল এ খেলা শুরু করে তাদের মধ্যে একজন ৫টি গুটি মাটিতে ফেলে দেয়। প্রথমে পাঁচটি গুটির একটি ডান হাতে তুলে নিয়ে তারপর সেই গুটিটি উপর দিকে ছুঁড়ে, মাটিতে পড়ে থাকা গুটিগুটির মধ্যে যেকোন একটি গুটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে, দেওয়াগুটি মাটিতে পড়ে যাবার আগেই ধরে নেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আবার হাতের গুটির একটি উপরে ছুঁড়ে দিয়ে নিচ থেকে আরেকটি গুটি সংগ্রহ করা হয়। এইভাবে চারটি গুটি তুলে নেওয়ার পর শেষ গুটিটি অবশিষ্ট থাকাকালীন তুলে নেওয়া গুটিগুলি আবার মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় এবং পড়ে থাকাগুটিটি তুলে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ একই রকম ভাবে গুটিটিকে উপরে ছুঁড়ে, পড়ে থাকা গুটির মধ্যে ২টি গুটি হাতে তুলে নিতে হয়। দ্বিতীয়বার একটি গুটি ছুঁড়ে মাটি থেকে একটি গুটি তুলে নেওয়া হয়। তখন মাটিতে একটি গুটি পড়ে থাকে, তৃতীয় পর্যায়ে প্রথমেই হাতে থাকা গুটিগুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে পড়ে থাকা গুটিটি তুলে নেওয়া হয়। তারপর সেই গুটিটি আগের মত উপরে ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গুটিগুলির থেকে একসঙ্গে ৩টি তুলে নেওয়া হয়। চতুর্থ পর্যায়ে খেলা শুরু হয় মাটিতে পড়ে থাকা একটি গুটি তুলে নিয়ে। তারপর সেই গুটিটিই উপরে ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটি গুটি তুলে নেওয়া হয় তারপর সেই দুটি গুটিই একসঙ্গে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা একটি গুটি তুলে নেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে উপরের গুটিগুলিও লুফে নেওয়া হয়। এইভাবে যখন মাটিতে একটি গুটি পড়ে থাকে তখন হাতে জমে থাকা গুটিগুলি আবার মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা গুটি তুলে নেওয়া হয়। এইবার ঐ গুটিটি দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গুটির মধ্যে যে কোন দুটি গুটি তুলে নেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে উপরের গুটিগুলিও লুফে নেওয়া হয়। এইভাবে যখন মাটিতে একটি গুটি পড়ে থাকে তখন হাতে জমে থাকা গুটিগুলি আবার মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর

মাটিতে পড়ে থাকা গুটিগুলি তুলে নেওয়া হয়। এইবার ঐ গুটিটি দিয়ে মাটিতে পড়ে থাকাগুলির মধ্যে যে কোন ২টি তুলে নেওয়া হয়। তারপর হাতে জমে থাকা গুটির মধ্যে একটি উপরে ছুঁড়ে দিয়ে বাকি ২টি মাটিতে একসঙ্গে রাখতে হয়। এরপর হাতের গুটিটি ছুঁড়ে দিয়ে যেগুটি ২টি মাটিতে পড়ে ছিল তাদের আবার তুলে নেওয়া হয়। এরপর ঐ পূর্ব পদ্ধতির মত একটি ছুঁড়ে দিয়ে বাকি দুটি আবার মাটিতে রাখা হয়। এর পরবর্তী স্তরে প্রথমবারে রাখা দুটি গুটি তুলে নিয়ে সেই স্থানে পুনরায় রাখা হয়। সেই সঙ্গে আগের মতই একটি গুটি ছুঁড়ে লুফে নিতে হয়। তারপর আবার দ্বিতীয়বারে রাখা গুটি দুটিও আগের মত তুলে নিয়ে পূর্বে রাখা গুটি দুটির সঙ্গে রাখা হয়। পঞ্চম পর্যায়ে হাতে থাকা গুটিটিই লুফে নিয়ে বাকি চারটি গুটি একসঙ্গে তুলে নেওয়া হয়। শেষ পর্যায়ে ৫টি গুটিই একসঙ্গে ছুঁড়ে দিয়ে হাত উল্টে নিয়ে কমপক্ষে চারটি গুটিই রাখতে হয়। এইবার সেই উল্টো হাত দিয়ে গুটিগুলি ছুঁড়ে দিয়ে হাত সোজা করে ছুঁড়ে দেওয়া গুটিগুলির মধ্যে কমপক্ষে চারটি গুটি ধরতে হয়। তবেই এক পাট্টি হয়। চারটি গুটির কম ধরলে কোন পাট্টি হয় না। তখন বিপরীত দল খেলা শুরু করে। এই খেলার সময় একটি ছড়া বলে খেলাটি খেলা হয়। সেটি হল—

ফুলনো ফুলনো ফুলনাটি
এ কেতে দোলোনো টি
তেলে না টি
বামনো বামনো বামনোটি
আটি আটি আটি টি
লঙ্কন লঙ্কন লঙ্কন টি
একটি পয়সা তেলের দাম
মন রঞ্জন ব্রাহ্মণ
অদ্য ব্রাহ্মণ পদ্মবাসী
হে সূর্য তোমার সাক্ষী
সাবের গলায় পাঁচ পাট্টি
লাগ ঝাট্টি॥

পিটু খেলা

এই খেলা ছেলে ও মেয়ে উভয়েই খেলে। খেলায় কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক অংশগ্রহণকারী নেই। তবে খেলার উপকরণরূপে ৭টি গুটি ও একটি বলের দরকার হয়। প্রথমেই খেলায় অংশগ্রহণকারীরা সমান ২ ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তারপর নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে একদল খেলা শুরু করে। এই খেলার পদ্ধতি হল এরূপ—প্রথমে একটি বড় গোলের মধ্যে ৭টি গুটি পরপর সাজানো হয়। গোলের ঠিক কিছুটা আগে একটা দাগ কাটা থাকে। সেই

দাগের ঠিক আগে দাঁড়িয়ে গুটিগুলিকে টিপ করে বল মারা হয়। অপর দল গোলের বাইরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই অবস্থায় প্রথম দল গুটি লক্ষ্য করে বল ছুঁড়তে থাকে। যদি কারোর বলেই গোলের মাঝখানের গুটিগুলি পড়ে না যায় তাহলে বিপরীত দল প্রথম দলের মতই বল নিয়ে গুটি লক্ষ্য করে বলটি ছোঁড়ে। যে কোন দলের বলেতেই গুটি ভাঙুক না কেন সেই দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বিপরীত দলের সদস্যদের মারে, যখন সেই দল ছড়িয়ে থাকা গুটিগুলি সাজাবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় যদি দলের কোন সদস্যদের গায়ে বল লাগে তবে সব দল মোর হয়ে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই খেলার নাম পিঁটু হলেও আমরা seven touch নামক একটি খেলার নাম জানি যার সঙ্গে এই খেলার মিল আছে। আর আমরা যে seven touch খেলার সঙ্গে পরিচিত সেইখেলা কেবলমাত্র ছেলেরাই খেলে থাকে। কিন্তু এখানে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে উভয়েই এই খেলা খেলে থাকে।

দদি কাঁদো

এই খেলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই খেলা কেবলমাত্র জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যেই হয়ে থাকে। এবং এই খেলা কেবলমাত্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। এই দদি কাঁদো খেলায় কেবলমাত্র পুরুষরা অংশগ্রহণ করে থাকে। এবং অংশগ্রহণকারী সংখ্যা দুই অথবা ততোধিক হতে পারে। এই খেলা সাধারণত দুরকম হতে পারে। এই খেলার পরিবেশ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলা যায় যে, একটা বড় মাঠে জল ঢেলে মাটিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয় যে তা কাদায় পরিণত হয়। এই কাদা প্রত্যেক খেলোয়াড় শরীরে মেখে খেলা শুরু করে।

প্রথম পর্যায়ের খেলাতে দুজন পুরুষ, কাঁধে কাঁধে হাত লাগিয়ে একে অপরকে পিছনের দিকে ঠেলতে থাকে। এইভাবে ঠেলতে ঠেলতে কোন এক ব্যক্তি যদি তার বিপরীত ব্যক্তিকে কাদার সীমানা পার করে জমিতে নিয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তিটি জিতে যাবে। এক্ষেত্রে খেলাটি ক্ষেত্রস্থলের মধ্যস্থান থেকে শুরু হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই চেষ্টা করে তার বিপরীত ব্যক্তিটিকে পিছনে ঠেলে কাদার সীমানা পার করে দিতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলায় অংশগ্রহণকারী পুরুষের সংখ্যা দুই অথবা দু'য়ের অধিক। এই খেলার উপকরণ হল যেকোন একটি শক্ত বড় ফল। তবে সাধারণত নারকেলই এই খেলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই খেলার পদ্ধতি হল—একজন ফলটিকে দুই বাহু দিয়ে চেপে শক্ত করে বুকের মধ্যে ধরে থাকে। অপর খেলোয়াড় বা খেলোয়াড়রা সবাই মিলে সেই ফলটিকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। প্রথমে যে কেড়ে নেবে সেই ব্যক্তিই আবার ফলটিকে চেপে ধরে থাকে। তখন অন্য খেলোয়াড়রা আবার তা চেপে ধরার চেষ্টা করে। এইভাবে খেলাটি চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না খেলোয়াড়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই খেলাতেই পূর্বের মত সারা গায়ে খেলোয়াড়েরা কাদা মেখে নেয় এবং এই কাদা স্থলেই খেলা হয়। তবে কাদা মাখার কারণ এই যে, সারা গা পিচ্ছিল হয়ে থাকে যাতে কেউ

না তা ধবতে পাবে। এই খেলাটি জন্মাষ্টমীব মূল অনুষ্ঠানেব পর শুরু হয এবং খেলাব মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ কবাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাবপর স্নান সেবে তাবা যে ফল নিয়ে খেলছিল সেই ফল এবং অন্যান্য ফল খেযে থাকে।

এই খেলাব নামকবণ সম্বন্ধে জানতে পাবি যে কাদাটি যেহেতু দধিব আকার ধাবণ কবে তাই গ্রামবাসীবা এই খেলার নাম দিয়েছে দদি কাঁদো।

ওকাবোকা খেলা

এই খেলা মূলত অল্প বয়সী ছেলেদেব। মেয়েবা সাধাবণত এ খেলা খেলে না। খেলাতে দুজন থেকে শুরু কবে ১০/১২ জন পর্যন্ত খেলতে পারে। সবাই হাত মুঠো কবে গোল হযে মাটিতে বাখে এবাব যেকোন একজন প্রত্যেকেব হাতে চিমটি কাটতে কাটতে বলে, 'ওকা বোকা চেমটি পোকা পোচকাও' এই পোচকাও কথাটি যে মুঠো হাতেব উপব শেষ হয় সেই হাত তুলে নিতে হয। এইভাবে বৃত্তাকাবে খেলা চলতে থাকে শেষ মুঠোটি থাকা পর্যন্ত। এইবাব এই শেষ মুঠোটি যাব তাকে সবাই মিলে শাস্তি দেবে একেব পব এক এইভাবে—তাব হাতেব আঙুলগুলি মাটিব উপব এবং বাঁদিক থেকে ডানদিকে মাবতে থাকে। আব সে মাবছে যে যদি একবাবেব সুযোগে মাবতে না পাবে তখন তাকেও ঐ পূর্বেব মত কবে হাত বাখতে হয। এইভাবে খেলা চলতে থাকে।

আইসক্রীম খেলা

এই খেলা মূলত ছেলেদেব। অনেকেই এই খেলাতে অংশগ্রহণ করে। এই খেলাব পদ্ধতি হল—একজন ছেলে প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়ায। তাবপব দুটো হাত নীচু করে মাটিতে ছুঁইয়ে রাখে। কিছুটা উল্টানো U-এব মত। এরপর বাকি ছেলেবা একেব পর এক দূর থেকে ছুটে এসে তার পিঠেব পব দুই হাত বেখে লাফিযে তাব সামনে পড়ে এবং এই প্রথমবাব লাফিয়ে যাওযাব সময সবাই আইসক্রীম শব্দ বলে লাফায। এই লাফানোব সময় ২টো হাত ছাড়া আব শবীবেব কোন অংশ তার গায়ে (U আকৃতি অবস্থায) লাগবে না। এই পদ্ধতিতে দ্বিতীযবাব সবাই একের পব এক লাফানোব সময় বলে আইসক্রীম ক্লাস থ্রী। তৃতীয়বাব লাফানোব সময় দুই হাতে তালি দেওযাব পব তারা 'ডাবল ডাবল দোতাবা' বলে। চতুর্থবাব লাফানোব সমযটা একটু ভিন্ন ধরনেব—এক পা তুলে পিঠে দু-হাত দিয়ে লাফিয়ে যাওয়ার সময় তাবা বলে 'এক তালার ভাই বল্টু'। এবাব পঞ্চমবাব তারা 'কামবাস্তা ফুল কানেব দুল' বলে দুহাত পিঠেব উপর বেখে লাফায। [এই কামবাস্তা ফুল কানেব দুল বাক্যটি পবপব ৩ বাব বলবে ও ৩ বাব লাফাবে]। এই লাফানো হবে প্রথমে পিছন থেকে সামনে, সামনে থেকে পিছনে এবং পিছন থেকে সামনে। এইভাবে খেলা শেষ হলে এক পাট্টি দেওযা হয অর্থাৎ এক গেম দেওয়া হয। তবে এই লাফানোব সময হাত বাদ দিযে শবীবেব কোন অংশ যদি মাটিতে হাত ছুঁযে বাখা ছেলেটিব গাযে স্পর্শ করে, তবে সেইখান থেকে নতুন কবে খেলা শুরু হয, যাব দেহ স্পর্শ হয়েছিল তাকে নিচু কবিযে, তবে শ্লোক নতুন করে আবম্ভ হয না, যেখানে শেষ হয়েছিল তার পব থেকে শুরু করা হয।

কাচ্চারে মাচ্ছা

এই খেলাতেও মূলত ছেলেরা অংশগ্রহণ করে। এটি ছড়ার ছন্দে খেলা হয়ে থাকে। দুই বা ততোধিক ছেলে এতে অংশগ্রহণ করবে। প্রথমে একজন চোর হয়, আর বাকিরা একসঙ্গে হয়। তাদের মধ্যে যে কেউ একজন খেলার একটি উপকরণ লাঠি বা বাঁশের কঞ্চিকে দূরের দিকে ছুঁড়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা পাশাপাশি গাছে উঠে যায়। আর ঐ একই মুহূর্তে যে চোর হয়েছে সে দৌড়ে যায় ঐ কঞ্চিটি আনার জন্য, আনার পর যদি দেখে সবাই গাছে উঠে গেছে তখন চোর বলে "কাচ্চারে মাচ্ছা গাছে কেন উঠলি", তখন উপর থেকে সমস্বরে ছেলেরা বলে "বাঘের ভয়ে", নিচ থেকে চোর বলে, বাঘ কে? উপর থেকে ছেলেরা বলে, "ঐ যে" [চোরকে দেখিয়ে]। এবার ওপর থেকে সবাই একে একে চোরকে ফেলা পাতা ধরতে বলবে। প্রথমে একজন একটি পাতা নিচের দিকে ফেলবে, মাটিতে পড়ার আগেই তা ধরতে হবে। তিনটি পাতার মধ্যে যেকোন একটি ধরতে পারলে যে চোর ছিল সে মুক্তি পাবে, আর যার ফেলা পাতা ধরবে সে এবার চোর হবে।

প্রথমে চোর নির্ধারণ করা হয় আঙুল ধরে—[অর্থাৎ আঙুলের উল্টো পিঠে মাটি বা চকের দাগ লাগিয়ে] বা, মাটিতে দাগ কেটে [অর্থাৎ Numbering করে; একটি দাগে Numbering করা থাকে সেটা যে ধরে, সেই প্রথমে চোর হবে]।

পাতা আনা/সাত আনা

এই খেলা ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই খেলে থাকে। খেলায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা একাধিক হতে পারে। এই খেলায় একজন চোর হয়, বাকি সবাই খেলে। এই চোর হওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন লুকিয়ে আঙুল ফুটিয়ে বাকি খেলোয়াড়দের আঙুল ধরতে বলে। যে খেলোয়াড় ঐ ফোটানো আঙুল ধরে, সে চোর হয়। পরবর্তী পর্যায়ে চোর বাকি খেলোয়াড়দের যে কোন পাতা আনতে বলে। তখন খেলোয়াড়রা এক পা তুলে সেই পাতা নিয়ে আসে। সেই পাতা একটি গোলের মধ্যে রাখা হয়। এইভাবে মোট সাতবার বিভিন্ন পাতা সংগ্রহ করে ঐ গোলের মধ্যে রাখা হয়। পরে সেই জমানো পাতা থেকে যে কোন একটি পাতা তুলে খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন অন্য জায়গায় মাটিতে গর্ত করে সেই পাতা গর্তে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দেয়। সেই জায়গায় আরো অনেকগুলি গর্ত চাপা দেওয়া থাকে মাটি দিয়ে। এই যে পাতা মাটি চাপা দেওয়া হয় তা সবই চোরের আড়ালে করা হয়। এইবার খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন চোরকে কোন গর্তে সেই পাতা আছে তা বলতে বলে, এই বলার জন্য সে মোট ৭ বার সুযোগ পাবে। ৭ বারের মধ্যে যদি সে ঠিক বলে তাহলে সে চোর থেকে মুক্তি পায়। নতুন করে আবার খেলা শুরু হয়। যদি চোর ৭ বারেও না বলতে পারে তখন পুনরায় আবার সে চোর হয়।

গুলি/গুটি খেলা

এই খেলা মূলত ছেলেদের খেলা। ২ অথবা ততোধিক খেলোয়াড এতে অংশগ্রহণ কবে থাকে। এটি ছড়ার খেলার অন্তর্গত, এই খেলার আরেকটি নাম হল one-two খেলা।

খেলার নিয়মাবলী হল—মাটিতে একটি গর্ত খুঁড়ে তার থেকে ৭-৮ হাত দূরে একটি দাগ দেওয়া হয়। সেই দাগ থেকে গুটি ছুঁড়ে খেলা শুরু হয়। খেলার উপকবণ হল পাথরের গোল গুটি।

প্রথমে দাগ থেকে একে একে সবাই পিকের মধ্যে (গর্তে) গুটিটি ফেলাব চেষ্টা করে। তবে সবার গুটি গর্তে না ফেললেও কাছাকাছি ফেললে চলবে। গর্ত থেকে দূরত্ব যে গুটির বেশী হবে, সেই ছেলেকে চোর হতে হবে বা ঘিরতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকি ছেলেরা একে একে গর্তের সামনে সেই গুটিটিকে (চোরেব গুটি) বাখে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী গর্তের মুখে লাগিয়ে অপর অঙ্গুলীতে নিজের গুটি নিয়ে টান দিয়ে ছাড়ে, সেই টানে নিজের গুটিটি তীব্র বেগে বেরিয়ে যায় এবং তা চোবেব গুটিতে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার পব চোরের গুটি গর্তের মুখ থেকে অনেক দূরে চলে যায়। এবপব চোর তার গুটিটি সেই খান থেকে আঙুলে টান দিয়ে গর্তেব দিকে মাবে। তাব লক্ষ্য হবে গুটিটিকে গর্তের মধ্যে ফেলা, যদি না ফেলতে পারে তবে পুনরায় সেই প্রথম ব্যক্তি চোরের গুটি নিয়ে গর্ত থেকে আগের মত একই পদ্ধতিতে গুটি ছোঁড়ে। চোরও আবার সেই পদ্ধতিতে গর্তেব দিকে গুটি ছোঁড়ে গর্তে ফেলার জন্য। এই ভাবে চোব যতক্ষণ না নিজের গুটি গর্তে ফেলতে পারছে, ততক্ষণ দূর থেকে গুটি ছুঁড়ে চলে।

অন্য ছেলেবা তখনই চোরের গুটিকে মাবার সুযোগ পায় যখন প্রথম ব্যক্তি বা যে চোবের গুটি সেই মুহূর্তে মেবেছিল—সে যদি চোবের গুটিতে না লাগাতে পারে।

চোর যদি তাব গুটি গর্তের মধ্যে ফেলতে পারে তবেই খেলা শেষ হয়। অথবা তখনই শেষ হয় যখন চোব গুটিকে গর্তেব মধ্যে ফেলতে পারছেনা, অথচ ছড়ার মাধ্যমে কুড়ি (বিশ) গোনা হয়ে যায়। এই ছড়া গোনা হয় চোবেব গুটিকে লক্ষ্য করে মাবাব সময। খেলাব ছড়াটি হল—

একেতে ইঁদুব, দুযেতে দাঁত, তিন-এ তেলি, চা'ব এ চোর, পাঁচে পেঁচা, ছয়ে ছুঁচা, সাত-এ শালিক, আট-এ ক্যাম্পেব গু চাটে, নয-এ ন্যাড়া নাপিত, দশ-এ দাসী, এগারো-য় অধিবাসী, বারো-এ বিয়া, তেবো-এ তেল সিঁদুর, চৌদ্দ-এ চাদর, পনেরো-এ পানের খিলি, ষোলো-এ সুড়সুড়ি, সতেবো-এ ঘব, উনিশ-এ মেয়ে, বিশ-এ বুড়ি।

রুমাল খেলা

গ্রামীণ এই লোক খেলা ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই খেলে থাকে। এই খেলায় অংশগ্রহণকাবীর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এই খেলার পদ্ধতি হল—খেলোয়াড়েবা গোল হয়ে বসে পড়ে, তাবপব নিজেদেব মধ্যে একজনকে চোব ঠিক কবে নেওয়া হয়। তারপব সেই চোব হাতে রুমাল নিয়ে গোলেব চারদিকে ঘোরে। এই সময় গোল হযে বসে থাকা খেলোয়াড়েবা চোখ বন্ধ করে থাকে। চোর গোলের বাইরে ঘুবতে ঘুবতে যে কোন একজন খেলোয়াড়ের

পিছনে দিয়ে যায়। যদি বসে থাকা খেলোয়াড় সেই রুমাল নিতে পারে তাহলে সেই খেলোয়াড়ই রুমালটা তুলে নিয়ে গোলের চারিদিকে ঘুরতে থাকে এবং চোর উঠে যাওয়া খেলোয়াড়ের জায়গায় বসে। আর যদি খেলোয়াড় রুমাল নিতে না পারে তাহলে চোর যে খেলোয়াড়ের পিছনে রুমাল নিয়ে বসেছিল তার পিঠে এক কিল মেরে আবার গোলের বাইরে ঘুরতে থাকে। এইভাবেই খেলা চলতে থাকে।

মাংস চোর খেলা

এই খেলা ছেলে ও মেয়ে উভয়েই খেলতে পারে। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা মোট ৫ জন। তার মধ্যে একজন চোর হয়। সেই চোর চারটে মাংস (ইঁটের টুকরো)কে নিজের আয়ত্বে রাখার চেষ্টা করে। A এবং B লাইনে দৌড়া-দৌড়ি করে। বাকি ৪ জন চারটি ঘর থেকে ঐ চারটি মাংস নেওয়ার চেষ্টা করে। যদি চারজন মিলে চারটি মাংস ওখান থেকে নিয়ে এক ঘরে জমা করতে পারে তবে খেলা শেষ হয়। অর্থাৎ এক পাট্টি হয়। আর যদি মাংস চোর ঐ লাইনে থেকে হাত বাড়িয়ে কাউকে ছুঁতে পারে তাহলে সে চোর হওয়া থেকে ছাড়া পায়। তার পরিবর্তে যাকে ছোঁয়া হল সেই চোরের স্থানে আসে।

ওপেন টু বাস্কো/নাইনটিন টিস্কো

এই খেলাতে ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে। দুই দলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দলে সমান সংখ্যক ছেলে বা মেয়ে থাকে। দুই দলে দুজন রাজা থাকে। তারা খেলা পরিচালনা করে। দুই দলের রাজা তাদের নিজেদের খেলোয়াড়কে একটা করে নাম দেয়। এবার একদলের রাজা অপর একদলের যেকোন একজনের চোখ বন্ধ করে তাদের দলের নাম দেওয়া একজনকে ডাকে। যেমন বলে, "আয়রে আমার আম", তখন 'আম' নামক ছেলেটি অথবা মেয়েটি এসে চোখ বাঁধা ছেলে বা মেয়েটির কপালে এসে তিনবার আঙুলের টোকা দিয়ে নিজের জায়গায় চলে যায়। এরপর তাদের দলের সবাই বলতে থাকে 'ঝিঙ্গা মাটি কটকট'। এই কথাটি মোট ৩ বার বলা হয়। এবার রাজা চোখ খুলে দিলে সেই ছেলেছি বা মেয়েটি যদি আমের সঠিক নাম বলতে পারে তবে বিপরীত পক্ষের রাজা তাদের দাগ দেওয়া সীমানা থেকে একটা লাফ দেয়। সেই লাফানো অংশে তাদের টগরকে বসায়। আর যদি টগর আমের সঠিক নাম বলতে না পারে তবে আম-এর রাজা তার নিজ সীমানা থেকে এক লাফ দিয়ে সেই আমকে বসায়। এইভাবে দুই পক্ষের রাজা পালা করে বিপরীত পক্ষের চোখ বন্ধ করে নাম ডাকাডাকি করে এবং তাদের লক্ষ্য হল নিজের দলের যে কেউ একজন যেন বিপরীত পক্ষের সীমানায় পৌঁছায়। এইভাবে যেকোন একটি দলের যে কেউই বিপরীত পক্ষের সীমানায় ঢুকতে পারলেই সেই বিপরীত দলের এক পাট্টি হয়। অর্থাৎ এক গেম হয়। এখানে কোন রাজা আগে সুযোগ নেবে তার জন্য খেলা শুরু হবার সময় দু'দলের রাজা one two three বলে তিনবার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড়ায়। যে রাজা আগে পৌঁছাবে সেই আগে খেলা শুরু করবে।

এই খেলার নামকরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে জানা যায়নি। তবে মনে করা হয় open to basco বলতে চোখ খোলাকে বোঝাচ্ছে। এবং nineteen tisco ৯/১০ জন করে খেলাতে অংশ নেয় তা বোঝাচ্ছে।

১. প্রবাদ

(ব্রাকেটের মধ্যেকার সংখ্যা প্রবাদের নির্দেশক)

কুসুম বর্মন, গৃহবধূ, বয়স ৩৫; সংগ্রহস্থল বায়চেঙ্গা (৫৮, ৫৯, ৬০)
বসন্ত বর্মন, গৃহস্বামী, বয়স ৪০; সংগ্রহস্থল রায়চেঙ্গা (৬১, ৬২, ৬৩)
জগদীশ আসোয়াব, শিক্ষক, বয়স ৩৭; সংগ্রহস্থল ভূতনীর ঘাট (৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০)
কৃষ্ণা অধিকাবী, ছাত্রী, বয়স ১৩; সংগ্রহস্থল পশ্চিম ফালাকাটা (৭১-৮৩)
ববি রায়, কৃষিজীবী, বয়স ৩৫; সংগ্রহস্থল আলিনগব (৮৪ ৯০)
সুশীল রায়, বয়স ৩৫, আলিনগর (৯১)
যতন রায়, বযস ২৫, আলিনগব (৯২, ৯৩, ৯৪)
জনদিশা, মাসিক বুলেটিন (৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩)
মীনা রায; বয়স ৩০; গৃহবধূ; সংগ্রহস্থল পশ্চিম ফালাকাটা (১০৪)
বুলবুলউদ্দীন আহমেদ, বয়স ২৩; ছাত্র, কালীনগব, নদীয়া (১-২০, ২২, ২৩-৫৭, ১০৫-১২৭)

২. ধাঁধা

(ব্রাকেটের মধ্যেকার সংখ্যা ধাঁধার নির্দেশক)

অন্নদা দাস, বয়স ৮২, গৃহবধূ, পশ্চিম ফালাকাটা (১, ২৪, ১৪১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০)
মহাদেব মণ্ডল, বয়স ৪০, জীবিকা; কৃষিজীবী, পশ্চিম ফালাকাটা
জাতি নমঃশূদ্র (২, ৩, ৪, ৫)
মীনা বায়, বয়স, ৩০, গৃহবধূ, পশ্চিম ফালাকাটা
জাতি, রাজবংশী (৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩)
অভিজিৎ দাস, বয়স ৯, ছাত্র, পশ্চিম ফালাকাটা (১৪)
ভারতী দাস, বয়স ৩২, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পশ্চিম ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী (১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ৭০, ৭১)
রাণীবালা দাস, বয়স ৬০, গৃহবধূ, পশ্চিম ফালাকাটা (১৭, ৫৯, ৬৮, ৬৯, ৭২)
জ্ঞানবালা দাস, বয়স ৩৫, গৃহবধূ, পশ্চিম ফালাকাটা (২০, ২১)
তমা দাস, বয়স ১১, ছাত্রী (৪র্থ শ্রেণী), পশ্চিম ফালাকাটা (২২, ২৩)
ধর্ম দাস, বয়স ৪৭, পেশা কৃষি, বাযচেঙ্গা (২৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯)
খগেন্দ্র বর্মন, বযস ২৫, পেশা কৃষিজীবী, রায়চেঙ্গা (২৬, ২৭, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৮)

গণেশ দাস, বয়স ৯, ছাত্র, রায়চেঙ্গা (২৮)
তপন দাস, বয়স ১১, ছাত্র, রায়চেঙ্গা (২৯, ৩০, ৩১)
তপন রায়, বয়স ১৭, কৃষিজীবী, রায়চেঙ্গা (৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০ ৪১)
তপন বর্মন, বয়স ৩০, কৃষিজীবী, রায়চেঙ্গা (৩৫, ৩৬, ৩৭)
পরেশ বর্মন, বয়স ৩০, পেশা কৃষিজীবী, রায়চেঙ্গা, (৪২, ৪৩, ৪৪)
লতিকা বেগম, বয়স ১২, ছাত্রী, রায়চেঙ্গা, (৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৭৯, ৮০-৮৫, ১০১-১০৫, ১১৯)
সবিতা বর্মন, বয়স ১০, ছাত্রী, রায়চেঙ্গা (৫৩, ৫৪, ৫৫, ১৩৪-১৪০, ১৯১-১৯৬)
কুসুম বর্মন, বয়স ৩৫, গৃহবধূ, রায়চেঙ্গা (৫৬, ৫৭)
জয়শ্রী বর্মন, বয়স ১৬, ছাত্রী, রায়চেঙ্গা (৬০, ৬১-৬৬, ১৬১-১৬৬)
অনন্যা বণিক, বয়স ১৪, ছাত্রী, ফালাকাটা (৬৭)
পার্বতী রায়, বয়স ৫০, গৃহবধূ, ফালাকাটা (৭৩, ৭৪)
তপন বর্মন, বয়স ১৫, ছাত্র, ফালাকাটা (৭৫-৭৮)
প্রদীপ রায়, বয়স ২৩, ছাত্র, ফালাকাটা (৮৬)
অঞ্জনা রায়, বয়স ১২, ছাত্রী, ফালাকাটা (৮৭, ৮৮)
শর্মিষ্ঠা রায়, বয়স ১২, ছাত্রী, ফালাকাটা (৮৯)
প্রবীর রায়, বয়স ১৭, ছাত্র, ফালাকাটা (৯০, ৯১, ৯২, ৯৩)
সোপেন বর্মন, বয়স ৪৩, কৃষিজীবী, ফালাকাটা (৯৪-৯৫)
নমিতা বর্মন, বয়স ৪০, গৃহবধূ, ফালাকাটা (৯৮)
পার্বতী বর্মন, বয়স ৪০, গৃহবধূ, (৯৯)
বেগম আসমানতারা, বয়স ২০, ছাত্রী, ফালাকাটা (১০০)
কৌশিক বণিক, বয়স ১৬, ছাত্র, আশুতোষ পল্লী, ফালাকাটা (১০৬)
অঞ্জু বণিক, বয়স ৩০, গৃহবধূ, আশুতোষ পল্লী, ফালাকাটা (১০২, ১০৭-১১২)
বিমলচন্দ্র বণিক, বয়স ৩৪, ব্যবসায়ী, আশুতোষ পল্লী, ফালাকাটা (১১৩-১১৬, ১১৮, ১৩৩)
পাপিয়া বণিক, বয়স ২৫, গৃহবধূ, আশুতোষ পল্লী, ফালাকাটা (১১৭)
কৃষ্ণা রায়, বয়স ১৩, ছাত্রী, ফালাকাটা (১২০, ১২১)
আমিনা বেগম, বয়স ১৪, ছাত্রী, ফালাকাটা (১২২, ১২৩, ১২৪)
রজিনা বেগম, বয়স ১৬, ছাত্রী, ফালাকাটা (১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮)
কানন বণিক, বয়স ৩০, গৃহবধূ, ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী (১২৯, ১৩১)
রামচন্দ্র গোপ, বয়স ৫০, ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী (১৩০, ১৩২)
বাবলী অধিকারী, বয়স ১৬, ছাত্রী, আশুতোষ পল্লী (১৪২, ১৮৬-১৮৮, ২৩২, ২৩৩, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭)
অনুকূল রায়, বয়স ২৪, কৃষিজীবী, আশুতোষ পল্লী (১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬)
বাসনা দাস, বয়স ৬০, কৃষিজীবী, আশুতোষ পল্লী (১৫০-১৫২)

ঝুমা দাস, বযস ৮, নমঃশূদ্র, বাইচেঙ্গা (১৬৭-১৭০)
যতীন বায়, বযস ২৪, কৃষিজীবী, রাইচেঙ্গা (১৭২-১৭৫)
মহেশ বায, বযস ৪৫, কৃষিজীবী, বাইচেঙ্গা (১৭৬, ২১৭, ২১৮)
সঙ্গীতা অধিকাবী, বয়স ১৬, ছাত্রী, বাইচেঙ্গা (১৭৭-১৭৮)
জোপেন বর্মন, বযস ৪০, রাজবংশী, রাইচেঙ্গা (১৭৯-১৮৩, ১৮৪)
সুশান্ত দাস, বযস ২৩, কৃষিজীবী, রাইচেঙ্গা (১৮৯-১৯০, ২৪৫)
মৌসুমী অধিকাবী, বয়স ১৬, ছাত্রী, বাইচেঙ্গা (১৯৭, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২০)
শর্মিষ্ঠা অধিকারী, বয়স ১৪, ছাত্রী, রাইচেঙ্গা (১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২৪২)
পূর্ণিমা রায়, বযস ১৫, ছাত্রী, রাইচেঙ্গা (২০২, ২০৩, ২২১, ২২২)
জয়শ্রী অধিকারী, বয়স ১৮, ছাত্রী, বাইচেঙ্গা (২১০, ২১১, ২১২, ২৪৮)
সঙ্গীতা অধিকাবী, বয়স ১৪, ছাত্রী, পশ্চিম ফালাকাটা (২২৯, ২৩১, ২৩৪)
সতীশ বর্মন, বযস ৪০, কৃষিজীবী, পশ্চিম ফালাকাটা (২১৯)
কেশবচন্দ্র রায়, বযস ২৫, ছাত্র, পশ্চিম ফালাকাটা (২২৪, ২২৫, ২২৬)
দিলীপ বায, বযস ৭, ছাত্র-পশ্চিম ফালাকাটা (২২৭, ২২৮)
কণিকা সবকাব, বযস ১৪, ছাত্রী, পশ্চিম ফালাকাটা (২৩০)
কৃষ্ণা অধিকারী, বযস ১৩, ছাত্রী, পশ্চিম ফালাকাটা (২৩৫, ২৩৯, ২৪১, ২৪৬)
কণিকা অধিকাবী, বয়স ১৬, ছাত্রী, পশ্চিম ফালাকাটা (২৩৬)
পবিমল রায়, বয়স ২৩, কৃষিজীবী, পশ্চিম ফালাকাটা (২৩৭)
সুন্দববালা বর্মন, বযস ৩৫, গৃহবধূ, পশ্চিম ফালাকাটা (২৩৮)
বিষ্ণুপ্রিয়া নন্দী, খুপাড়া, আবামবাগ, হুগলী (২৫৭-৩১৩, ৩১৫-৩২৪, ৩২৬-৩৩৮)
জ্যোৎস্নাময়ী মান্না, বালিঠ্যা, বাঁকুড়া (৩১৪)
বাদল নায়ক, বালিঠ্যা, বাঁকুড়া (৩২৫)

৩. ছড়া

(ব্রাকেটের মধ্যেকার সংখ্যাগুলি ছড়ার নির্দেশক)

দিলীপ বায়, বয়স ৭ বৎসব, ছাত্র (১, ২৯, ৩০)
কেশব রায়, আলিনগব, ১৪ বৎসর, ছাত্র (২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭)
মনবালা বর্মন, ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী, গৃহবধূ, ৩০ বৎসব (২১)
শুভাশিস্ বণিক, ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী, ছাত্র, ১০ বৎসব (২০)
অমবচন্দ্র গোপ, ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী, ছাত্র, ১০ বৎসব (১৮, ১৯)
লক্ষ্মী মণ্ডল, ফালাকাটা, আশুতোষ পল্লী, গৃহবধূ, ৭৫ বৎসব (১০-১২)
ননীবালা সবকাব, বালাসুন্দরী পাড়া, গৃহবধূ, ৬৫ বৎসব (২৬, ২৭, ২৮)
সুচিত্রা মণ্ডল, ভূতনীব ঘাট, ছাত্রী, ১২ বৎসব (৯)

পার্বতী দাস, রায়চেঙ্গা, গৃহবধূ, '২১ বৎসব (২৫)
তমা দাস, রায়চেঙ্গা, ছাত্রী, ১১ বৎসর (২২, ২৩)
বাসনা দাস, বায়চেঙ্গা, গৃহবধূ, ৬০ বৎসব (২৪)
প্লাবনী বায় আসোয়াব, ভূতনীর ঘাট, ছাত্রী, ৯ বৎসব (৪)
ধনঞ্জয় বর্মন, ছাত্র, ৭ বৎসব (৩, ৫)

৪. কিংবদন্তী

দ্বিজপদ মণ্ডল, গ্রাম বাধানগব, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৭২ বৎসর, জীবিকা: শিক্ষকতা
আব্দুল মান্নান কাজীসাহা, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৪৫, জীবিকা, চাষবাস
মুহম্মদ সুফিয়ান বেজা, বেগুনবাড়ী, মুর্শিদাবাদ, বযস ৬৯, পেশা: শিক্ষকতা
নিবঞ্জন দাস বৈবাগ্য, বাজাব পাডা, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৭২ জীবিকা: মিস্ত্রী
শান্তি মণ্ডল, বাজার পাডা, মুর্শিদাবাদ, বযস ৮০, জীবিকা: সবজি বিক্রেতা
দিলীপ ভট্টাচার্য, নওদাপাড়া, মুর্শিদাবাদ, বযস-৪৩, জীবিকা: পৌবোহিত্য
লক্ষ্মীনাবাযণ চট্টোপাধ্যায, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, বযস ৪৬, পেশা: পৌবোহিত্য
নকড়ি দেওয়াসীব (পাটুনী) আন্তবণ, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৬১. পেশা
বিজয জানা, বডডোঙ্গল, হুগলী
স্বপ্না পাহাড়ী, আনুড গ্রাম, হুগলী, ছাত্রী
অমলাবঞ্জন বায, কেদাবচাঁদপুব, মুর্শিদাবাদ, বযস ৭২, জীবিকা: চাকুবি
বৈদ্যনাথ পাণ্ডে, বহবমপুব, মুর্শিদাবাদ, বযস ৮২, জীবিকা: পৌবোহিত্য
গোপাল ব্রহ্মচাবী, চাঁদাবাদ, ঘোডামাবা, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৪১, জীবিকা: কৃষি

৫. মুসলিম বিয়ের গান

(প্রথম সংখ্যাগুলি বিয়ের গানের নির্দেশক)

১. আমিনা বিবি, গ্রাম শ্যামনগব, বযস ৫৪
২. রাবিয়া বিবি, গ্রাম কমলপুর, নদীয়া, বয়স ৬০
৩. মাছুমা খাতুন, গ্রাম কয়া, নদীয়া, বয়স ২০
৪. জুলেখা খাতুন, গ্রাম বাজিতপুব, নদীয়া, বয়স ২৫
৫. নুনোহার বিবি, গ্রাম ফতেপুর, নদীযা, বয়স ৫৬
৬. কদমবানু বিবি, গ্রাম কমলপুব, নদীয়া, বয়স ৫৫
৭. ৭-১৪,২১ ২৩,২৫,২৬, শান্তিলতা বিশ্বাস, গাডাপোতা, নদীযা, বযস ৬৫
৮. ১৫-২১,২৭-২৯,৪৩,৪৫-৪৭, কদমানু বেওয়া, গ্রাম গাডাপোতা, নদীযা, বযস ৪৫

২৪. শান্তিলতা বিশ্বাস, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৫০

২৫-২৯. কদবানু বেওয়া, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স

৩০. বাবেয়া বিবি, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৫০

৩১-৪০. হারুনা রসিদ তরফদার, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৫৪

৪৪. রীণা খাতুন, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ১৫

৪৫-৪৭. কদবানু বেওয়া, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৩০

৪৮. আমজাদ মন্ডল, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৩০

৪৯. মনুবা বিবি, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৩৫

৫০. মনুয়ার বিবি, গাড়াপোতা, নদীয়া, বয়স ৪৫

৭. লোকক্রীড়া

শী বুডি:
সাতকড়ি খেলা,
বুড়িযানা খেলা,
দাডিয়া বান্ধা,
চোক্য চল

খিবাজ অধিকাবী,
কৃষ্ণা অধিকাবী ও
শর্মিষ্ঠা অধিকাবী, পশ্চিম ফালাকাটা, সকলে ছাত্রছাত্রী

কিড়িং কিড়িং খেলা,
ফুলোন খেলা,
পিটু খেলা,
দদি কাঁদো,
ওকাবোকা খেলা,
আইসক্রীম খেলা,
কাছারে মাচ্ছা

বাহুল দেবর্বন,
সুব্রত বায়,
শিউলী রায়,
চাণক্য কুমার কার্যী,
অনিমেষ কার্যী, পশ্চিম ফালাকাটা, সকলে ছাত্রছাত্রী

পাতা আনা/সাত আনা,
গুলি গুটি খেলা,
রুমাল খেলা,
মাংস চোর খেলা
ওপেন টু বাক্স/নাইন টিন টিক্সো

বিশ্বজিৎ ঘোষ ও সন্তোষ দাস, পশ্চিম ফালাকাটা, দুজনেই ছাত্র